গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

২২ মার্চ ২০২৫

সূচিপত্র

ক্রম	শিরোনাম (বিষয়)	পৃষ্ঠা
	কমিশন পরিচিতি	৫
	স্বাক্ষর	৭
	কমিশনের কার্যপরিধি ও কার্যধারা	৮
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৯
	গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামের তালিকা	১০
	সারসংক্ষেপ	১১
১.	ভূমিকা	১৫
২.	স্বাধীন বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ঐতিহাসিক পরিক্রমা	১৮
	২.১ স্বাধীন দেশে উত্তরাধিকার ও নবযাত্রা	১৮
	২.২ একদলীয় শাসন ও কণ্ঠরোধ	১৯
	২.৩ সামরিক শাসনের যুগ	২০
	২.৪ গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ও গণমাধ্যমের উদারীকরণ	২১
	২.৫ নৈরাজ্যের যুগ	২২
	২.৬ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়	২৬
৩.	গণমাধ্যমের মালিকানায় কারা	৩৩
	৩.১ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ	৩৩
	৩.২ এফএম রেডিওর মালিকানা	৩৯
৪.	গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ	৪৩
	৪.১ সংবাদপত্র	৪৩
	৪.২ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল	৫৫
	৪.২.১ আনুগত্য ও তোষণবাদিতা বনাম সম্প্রচার নীতিমালা	৫৭
	৪.২.২ সম্প্রচার কমিশন গঠনে অনীহা	৬১
	৪.২.৩ সম্প্রচার নীতিমালা এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতা	৬২
	৪.২.৪ ভৌতিক টিআরপি	৬২
	৪.২.৫ কেবল অপারেটর ও ডিটিএইচ ব্যবস্থা	৬৪
	৪.৩ অনলাইন নিউজ পোর্টাল	৬৭
	৪.৪ এফএম রেডিও	৬৯
	৪.৫ বেসরকারি সংবাদ সংস্থা	৭০
৫.	গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে আইনি কাঠামো	৭২
	৫.১ পেনাল কোড (দণ্ডবিধি), ১৮৬০ (ধারা ৪৯৯, ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ মানহানি)	৭৩
	৫.২ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮	৭৩

ক্রম	শিরোনাম (বিষয়)	পৃষ্ঠা
	৫.৩ আইসিটি আইন থেকে ডিএসএ এবং সিএসএ	৭৩
	৫.৪ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩	৭৪
	৫.৫ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৯৭৪	৭৪
	৫.৬ আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬	৭৫
	৫.৭ বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত আইনের পর্যালোচনা	৭৫
	৫.৮ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯	৭৫
	৫.৯ তথ্য-উপাত্ত ব্লক বা অপসারণ	৭৫
	৫.১০ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪-এর পর্যালোচনা	৭৬
	৫.১১ জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, ২০১৭-এর পর্যালোচনা	৭৬
	৫.১২ দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩	৭৬
	৫.১৩ সাংবাদিক সুরক্ষা আইন	৭৭
৬.	গণমাধ্যম সম্পর্কে মানুষের ধারণা ও প্রত্যাশা	৭৮
৭.	রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম	৮০
	৭.১ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)	৮০
	৭.১.১ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম থেকে প্রচারযন্ত্র	৮২
	৭.১.২ আমলাতান্ত্রিক প্রভাব	৮৪
	৭.১.৩ দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাব	৮৫
	৭.২ পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টারের ধারণা থেকে বাংলাদেশ বেতার	৮৫
	৭.২.১ বেতারের স্বায়ত্তশাসন আইন নিয়ে প্রহসন	৮৬
	৭.২.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ	৮৭
	৭.৩ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)	৮৮
	৭.৩.১ বাসসে অসাংবাদিক বেশি	৮৯
	৭.৩.২ নতুন চ্যালেঞ্জ	৯০
	৭.৩.৩ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা	৯০
৮.	গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মান, অপব্যবহার ও বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা	৯১
৯.	অদৃশ্য ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা	৯৩
১০.	গণমাধ্যমের স্বাবলম্বিতা কীভাবে সম্ভব?	৯৫
	১০.১ লাভ-ক্ষতির চিত্র	৯৫
	১০.২ রাজনৈতিক প্রভাব ও গোষ্ঠীস্বার্থ	৯৭
	১০.৩ উত্তরণের উপায় কী	৯৭
১১.	প্রস্তাবিত জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন	৯৯
	১১.১ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল	৯৯
	১১.১.১ সম্প্রচার নীতিমালা ও কর্তৃপক্ষ	১০০

ক্রম	শিরোনাম (বিষয়)	পৃষ্ঠা
	১১.১.২ গণমাধ্যমের দায় ও বিধিবিধান: বৈশ্বিক উত্তম চর্চার নমুনা	১০০
১২.	গণমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিকদের যোগ্যতা	১০৪
	১২.১ সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান	১০৪
	১২.২ সাংবাদিকদের যোগ্যতার প্রশ্ন	১০৫
	১২.৩ যুক্তিযুক্ত যোগ্যতায় সম্পাদক?	১০৬
	১২.৪ গণমাধ্যমের মালিকানার শর্ত	১০৬
১৩.	সরকারি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১০৮
	১৩.১ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)	১০৮
	১৩.২ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো)	১১০
	১৩.৩ নিমকোর কর্মপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে	১১১
	১৩.৪ নিমকোর গবেষণা কার্যক্রম	১১২
	১৩.৫ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট	১১২
১৪.	সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা ও শ্রম আইন	১১৪
১৫.	গণমাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে করণীয়	১২১
১৬.	আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি	১২৩
	১৬.১ প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী	১২৪
	১৬.২ গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি	১২৫
১৭.	অপ/ভুয়া তথ্যের ঝুঁকি	১২৭
	১৭.১ বাংলাদেশ চিত্র	১২৮
১৮.	বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতা প্রসারণে করণীয়	১৩১
১৯.	গণমাধ্যমের অপব্যবহার ও অপসাংবাদিকতা	১৩২
২০.	জবাবদিহিতা ও প্রশ্নবিদ্ধ সাংবাদিকতা	১৩৭
	২০.১ যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ সাংবাদিকতা	১৩৮
	২০.২ সংবাদ উপস্থাপনের ধরন ও পাঠক-দর্শকদের মানসিক স্বাস্থ্য	১৪২
২১.	সুপারিশমালা	১৪৩

কমিশন পরিচিতি

জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়

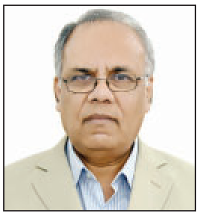

কামাল আহমেদ

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ স্বাধীনভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় তার কলাম নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস প্রজেক্টেও তিনি পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে তিনি প্রথম আলো পত্রিকার পরামর্শক সম্পাদক, বিবিসি নিউমিডিয়া ও বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে সিনিয়র প্রযোজক, বিবিসি বাংলা সার্ভিসের সম্পাদক, বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশ্লেষক এবং বিবিসির ঢাকা সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি জাতিসংঘ রেডিওর পরামর্শক ছিলেন এবং ২০১২ সালে জাতিসংঘ রেডিওর বাংলা সম্প্রচার শুরু করেন।

ড. গীতি আরা নাসরীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক এবং সাবেক চেয়ারপারসন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণ হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ইস্ট ওয়েস্ট সেন্টারের বৃত্তিতে কমিউনিকেশনে এমএ ডিগ্রি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ ও পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া, ইউনিভার্সিটি অব পাদোভা ও লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে ফেলো এবং হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে ফুলব্রাইট স্কলার ছিলেন।

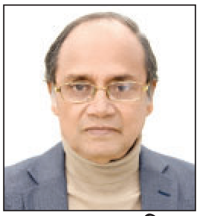

শামসুল হক জাহিদ

দেশের প্রথম ও প্রধান বিজনেস ডেইলি দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী। তিনি সম্পাদক পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনে অন্তর্ভুক্ত। জাহিদ ৫২ বছর ধরে সাংবাদিকতা পেশায় কর্মরত। তিনি অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ ও বাংলাদেশ টাইমসে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সাপ্তাহিক ঢাকা কুরিয়ারে তিনি নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন। জাহিদ সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

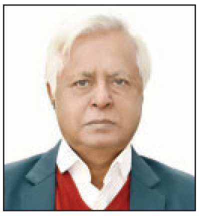

আখতার হোসেন খান

দ্য পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় ছাত্রাবস্থায় সাংবাদিকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। পরে ১৯৭৪ সালে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। কর্মজীবনে তিনি মহকুমা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক, দূতাবাসে কমার্শিয়াল কাউন্সেলর, সমাজসেবার ডিজি, বিমানের এমডি ও পরে সিভিল এভিয়েশন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগ এবং রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরোত্তরকালে তিনি ঢাকায় বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও ইউরোপীয় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ-এর খণ্ডকালীন পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আত্মজীবনী The World of Twilight-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন।

কামরুন নেসা হাসান

বাংলাদেশের টেলিভিশনে কামরুন নেসা হাসান একটি সুপরিচিত নাম। ১৯৬৭ সালে কলেজে পড়ার সময় রেডিওতে ঘোষিকা হিসেবে কর্মজীবন শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করে ১৯৮০ সালে তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রযোজক হিসেবে যোগ দেন। পরে ২০০৯ সালে উপ-মহাপরিচালক হিসেবে অবসর নেন। তিনি ১৯৮৬ সালে প্রেক্ষাপট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, ২০০৯ সালে ইনার হুইল ডিস্ট্রিক্ট এবং উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টসহ আরও অনেক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালে জাপানে এনএইচকেতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সময় তার কভার স্টোরি জাপান ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালে চীনের সেনঝেনে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ইয়োথ কালচারাল কম্পিটিশনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। লেখালেখির পাশাপাশি তার সম্পাদনায় একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অবসরের পর তিনি ব্র্যাকের শিক্ষা বিভাগে পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অঞ্জন চৌধুরী

বাংলাদেশের একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি দূরদর্শী ব্যক্তিত্বের জন্য সর্বাধিক পরিচিত এবং একজন পথিকৃৎ হিসেবে প্রতিটি সাফল্যের মূল কারণ হিসেবে গতিশীলতা ও ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের দেরাদুনে চাক্রতা সেনানিবাস থেকে মাত্র ১৩,৫০০ জনকে কমান্ডো হিসেবে নির্বাচিত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তিনি তাদের একজন। তিনি মাছরাঙা টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এভিয়েশন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এওএবি) ও অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের (অ্যাটকো) সভাপতি, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) সহসভাপতি এবং স্কয়ার গ্রুপের পরিচালক হিসাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ২০০৯ সালে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক হিসেবে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার পান। একজন চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'মনপুরা' ও 'বিশ্বসুন্দরী' চলচ্চিত্রের জন্য যথাক্রমে ২০১০ ও ২০২০ সালে শ্রেষ্ঠ প্রযোজক হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন।

সৈয়দ আবদাল আহমদ

দৈনিক আমার দেশ-এর নির্বাহী সম্পাদক। দৈনিক বাংলায় সাংবাদিকতাজীবন শুরু, ১৯৯৭ সালে বন্ধের আগ পর্যন্ত এ পত্রিকার বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় ৪০ বছরের সাংবাদিকতাজীবনে আরও কাজ করেছেন বাসস, বিচিত্রা, দিনকাল, দৈনিক জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায়। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। বাংলা একাডেমির স্থায়ী সদস্য। বই প্রকাশিত হয়েছে ২০টি। অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য সম্মানজনক ফিলিপস পুরস্কার ও এসকাপ-এফইজেবি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ফাহিম আহমেদ

আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মজীবনের শুরুটা যায়যায়দিন থেকে। তারপর দৈনিক অর্থনীতি ও যুগান্তরে। এরপর ২০০৩ সালে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির যাত্রালগ্নেই সেখানে যোগদান করেন। সেই থেকে এখনো টেলিভিশনজগতেই কাজ করছেন। এনটিভি থেকে দেশটিভি, চ্যানেল ওয়ান, চ্যানেল ২৪ হয়ে এখন যমুনা টেলিভিশনে। প্রায় ২৮ বছরের সাংবাদিকতাজীবনে শিক্ষানবিশ রিপোর্টার, ফিচার রিপোর্টার থেকে নিউজরুম এডিটর, নিউজ এডিটর, চিফ নিউজ এডিটরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে যমুনা টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহীর পদে আছেন। এছাড়া সম্প্রচার সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার-বিজেসিতে ট্রাস্টি হিসেবে যুক্ত আছেন।

জিমি আমির

দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকা দিয়ে সাংবাদিকতায় পদার্পণ। ২০০৮ সালে চ্যানেল ওয়ানে টেলিভিশন সাংবাদিকতা শুরু। এরপর বাংলাভিশন, ইনডিপেনডেন্ট, চ্যানেল টুয়েন্টিফোর, বাংলাটিভিতে যথাক্রমে স্টাফ রিপোর্টার, সিনিয়র রিপোর্টার ও জয়েন্ট নিউজ এডিটর হিসেবে কাজের পাশাপাশি নিউজ ও প্রোগ্রাম প্রেজেন্টার হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। সারাবাংলা ডটনেট নিউজ পোর্টালে ২০১৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত কাজ করেছেন জয়েন্ট নিউজ এডিটর হিসেবে। ২০২২ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত তিনি চ্যানেল নাইনে হেড অব বিজনেস নিউজ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০২৩ থেকে তিনি জার্মানির ডয়েচে ভেলে একাডেমিতে প্রজেক্ট অফিসার হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। একই সঙ্গে মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্ক (এমএসএন) নামে সাংবাদিকদের অধিকার বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করছেন ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে।

মোস্তফা সবুজ

সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক শেষ করে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে পড়তে যান ভারতের নয়াদিল্লির সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে (সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি)। সেখানে দুই বছরের স্নাতকোত্তর শেষ করে ২০১৭ সালে জাতীয় ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকার বগুড়া প্রতিনিধি হিসেবে তার পেশাজীবন শুরু। ছোটবেলা থেকেই তিনি দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করতেন। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের জীবন আলেখ্য তার লেখার মূল বিষয়। সংবাদ লেখার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষির সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে নিয়মিত কলাম লেখেন দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায়।

টিটু দত্ত গুপ্ত

পেশায় সাংবাদিক। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। এরপর ১৯৯১ সাল থেকে নিয়মিতভাবে কাজ করে আসছেন সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রে। সাধারণ রিপোর্টার হিসাবেই কর্মজীবনের শুরু, পরে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ে এসে ক্রমে নিউজরুমে বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে বাণিজ্যবিষয়ক ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে উপসম্পাদক হিসেবে কর্মরত। এর আগের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে নিউ এজ, কালের কণ্ঠ, নিউ নেশন, ইনডিপেনডেন্ট ও বার্তা সংস্থা ইউএনবি।

মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য। কমিশনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের স্নাতকোত্তরে (মাস্টার্স) অধ্যয়নরত। ২০২০ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরপরই সাংবাদিকতায় যুক্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি ডিবিসি টেলিভিশনের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রথম আলোর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে তিনি পুলিশের আক্রমণের শিকার হন।

জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়:

মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন
শিক্ষার্থী প্রতিনিধি
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

টিটু দত্ত গুপ্ত
ডেপুটি এডিটর, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

মোস্তফা সবুজ
বগুড়া জেলা প্রতিনিধি, দ্য ডেইলি স্টার
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

জিমি আমির
সাংবাদিক ও আহ্বায়ক, মিডিয়া সাপোর্ট নেটওয়ার্ক
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

ফাহিম আহমেদ
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যমুনা টেলিভিশন ও ট্রাস্টি, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

সৈয়দ আবদাল আহমদ
সাবেক সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেস ক্লাব
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

কামরুন নেসা হাসান
অবসরপ্রাপ্ত উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), বাংলাদেশ টেলিভিশন
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

অঞ্জন চৌধুরী
সভাপতি, অ্যাটকো
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

আখতার হোসেন খান
প্রতিনিধি, নোয়াব
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

শামসুল হক জাহিদ
সম্পাদক, দ্য ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস ও প্রতিনিধি সম্পাদক পরিষদ
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

ড. গীতি আরা নাসরীন
অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সদস্য, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

কামাল আহমেদ
সাংবাদিক
এবং
কমিশন প্রধান
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন।

কমিশনের কার্যপরিধি ও কার্যধারা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার লক্ষ্যে যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করেছে, সেই কমিশন তার প্রথম সভায় নিম্নোক্ত কার্যপরিধি ও কার্যধারা নির্ধারণ করেছে:

কার্যপরিধি:

০১. কমিশন গণমাধ্যমের সব মাধ্যমে, যথা: সংবাদপত্র, সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন ও বেতার, সংবাদ সংস্থা এবং সংবাদনির্ভর অনলাইন পোর্টালের বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে।

০২. এ পর্যালোচনার লক্ষ্য হবে স্বাধীন, সাংবাদিকতার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা।

০৩. সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতার ওপর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সরকারি, বেসরকারি এবং বিভিন্ন স্বার্থকেন্দ্রিক গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক চাপ কিংবা হুমকির ধরন ও ব্যপকতা নির্ণয়।

০৪. স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য বাধা ও হুমকি সৃষ্টিকারী আইনসমূহ চিহ্নিত করা ও প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান।

০৫. গণমাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি, যাতে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে বহুমত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান, খবর ও মতামত পৌঁছায়। একক বা গুটিকয় গোষ্ঠীর হাতে গণমাধ্যমের শক্তির কেন্দ্রীকরণ না ঘটে।

০৬. সাংবাদিকতার মান নৈতিকতার দিক থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য সম্পাদকীয় নীতিমালা নির্ধারণের বিষয়ে করণীয়। একই সঙ্গে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত থাকার উপায় নির্ধারণ।

০৭. সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের জবাবদিহির জন্য কার্যকর আত্মনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বা স্বাধীন নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান তৈরির সম্ভাব্য পদক্ষেপ ঠিক করা।

কার্যধারা:

০১. অংশীজনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ জনমত যাচাইয়ের জন্য জাতীয় গণমাধ্যম জরিপ।

০২. অংশীজনদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়।

০৩. ঢাকার বাইরে বিভাগীয় পর্যায়ে জেলা প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা।

০৪. সরকারি নথিপত্র পর্যালোচনার মাধ্যমে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা, তাদের লক্ষ্য ও আদর্শ, ব্যবসায়িক দিক দিয়ে কতটা টেকসই ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতা পর্যালোচনা।

০৫. সরকারি নীতিমালা ও আইনসমূহ প্রতিপালনের বিষয়ে ব্যত্যয়সমূহ চিহ্নিত করা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

স্বাধীন, বস্তুনিষ্ঠ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব তৈরির দায়িত্ব পালনের সময়ে দেশের নাগরিক সমাজ, বিভিন্ন অংশীজন, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যে সহায়তা পেয়েছে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, সেজন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ। অনলাইন এবং অফ-লাইনে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের পক্ষ থেকে যারা মতামত দিয়েছেন, তাদের মতামত এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে। গণমাধ্যম সংস্কার বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, তাদের কাছেও কমিশন ঋণী। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে কমিশনের কাজে মূল্যবান ভূমিকা রেখেছে। কেননা এই সমীক্ষা থেকে দেশে গণমাধ্যমের প্রাসঙ্গিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও গণমাধ্যম সম্পর্কে জাতীয় প্রত্যাশার কথা প্রথমবার জানা গেল। এই প্রতিবেদনের জন্য গবেষক হিসাবে সাংবাদিক-গবেষক মো. আবুল কালাম আজাদের অবদান অসামান্য। স্বেচ্ছামূলক সেবা দিয়েও বেশ কয়েকজন পেশাজীবী কমিশনের কাজে সহায়তা করে আমাদের ঋণী করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জাতিসংঘ সংস্থা ইউনেস্কো, কমিটি টু প্রজেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে) সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকেও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় কমিশনে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যেসব কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করেছেন, কমিশন তাদের কাছেও গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নামের তালিকাঃ

০১ কাজী জিয়াউল বাসেত, উপসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২ জনাব মোহাম্মদ সায়েম হোসেন, সিনিয়র তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৩ জনাব সাইফুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪ জনাব মোঃ রাশিদুল করিম, সহকারী সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫ জনাব মোঃ ওয়ালুল হক, সহকারী সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৬ জনাব মরজিনা ইয়াসমিন, সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৭ জনাব মোঃ আব্দুল মমিন, সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৮ জনাব মাহমুদা শিউলী আক্তার, সহকারী পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৯ জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০ জনাব মো. লুৎফর রহমান, সম্পাদনা সহকারী, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি), ঢাকা।

১১ জনাব জামাল উদ্দিন, স্টাফ রাইটার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১২ জনাব মো: নজরুল ইসলাম, প্রধান সহকারী, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৩ জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন হাওলাদার, সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৪ জনাব বশির আহমেদ, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫ জনাব উন্নতি বাড়ৈ, সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৬ জনাব শিপু আক্তার, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৭ জনাব মো. মিজানুর রহমান, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৮ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

১৯ জনাব মো. শামীম, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২০ জনাব মাছুদ আলম, কপি হোল্ডার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২১ জনাব রবিউল সরকার, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২২ জনাব মোফাজ্জল হোসেন, গাড়িচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৩ জনাব মোঃ আফজাল হোসেন, ডেসপাস রাইডার, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৪ জনাব শফিকুল ইসলাম, গাড়িচালক, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা।

২৫ জনাব মোঃ বকুল হোসেন, অফিস সহায়ক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬ জনাব মোঃ হাসানুর রহমান, অফিস সহায়ক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সারসংক্ষেপ

জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে গণমাধ্যমের একটি অংশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের কাছে মানুষের প্রত্যাশা জানার জন্য গণমাধ্যম কমিশন একটি জরিপ চালায়। এ বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর মাধ্যমে পরিচালিত জরিপটি ছিল গণমাধ্যমের পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম সমীক্ষা। এতে দেখা যায়, প্রতি ১০০ জনের ৬৮ জনই গণমাধ্যমকে স্বাধীন দেখতে চান। নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতহীন গণমাধ্যমের প্রত্যাশা ৬০ ভাগ মানুষের। এছাড়াও মানুষ সরকারি, রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবমুক্ত, বস্তুনিষ্ঠ, সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম, হলুদ সাংবাদিকতামুক্ত গণমাধ্যম চান। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৩৮ জন এ কথাও মনে করেন যে, দেশের গণমাধ্যম স্বাধীন নয়।

দেশের গণমাধ্যম কেন স্বাধীন নয়–এই প্রশ্নের একাধিক উত্তরের সুবাদে ৭৯ ভাগ মানুষ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন, ৭২ ভাগ সরকারি হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন এবং ৫০ ভাগ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন। সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন অনেকে।

দেশের প্রচলিত ও বিকাশমান গণমাধ্যমের কাছে মানুষের এ প্রত্যাশা অমূলক নয়। এগুলো পূরণ করাই গণমাধ্যমের কাজ। গণমাধ্যম যে সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, তারই প্রতিফলন ঘটেছে জরিপের ফলাফলে। কেন ব্যর্থ হচ্ছে, এর আভাসও পাওয়া যায় মানুষের পর্যবেক্ষণে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমজগতে কেউ কেউ উন্নতি করলেও সামগ্রিকভাবে স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেনি। অতীতের কোনো সরকারই সুস্থধারার গণমাধ্যমের বিকাশের পথ সুগম করেনি, তবে গত দেড় দশকে বিচ্যুতির মাত্রা অনেক বেড়েছে।

বাংলাদেশে স্বাধীন, বস্তুনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের বিকাশের পথে প্রধান বাধাগুলোকে তিন ভাগে দেখা যায়–আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক। এছাড়াও রয়েছে মালিকানার সংকট, সরকারি নীতি সহায়তার অভাব। গণমাধ্যমের সমস্যার উত্তরণে আইনগত, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার জরুরি। আর্থিক সাফল্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ও দায়িত্বশীল তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে হলে মালিকানার কাঠামোয়ও আনতে হবে পরিবর্তন।

তবে মানুষের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের মালিকানার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই এ বিষয়ে আলোকপাত করা যাক:

মালিকানার সংকট

গত তিন দশকে গণমাধ্যমের যে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, তা মূলত বেসরকারি খাতের মাধ্যমেই হয়েছে। তবে গণমাধ্যমে বিনিয়োগের উৎস নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। ফলস্বরূপ, গণমাধ্যমে প্রবলভাবে রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে। অনেক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেদের ব্যবসাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য গণমাধ্যমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং সরকারি দলের সমর্থনে সংবাদ পরিবেশনের জন্য সম্পাদকীয় নীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছেন। একই গোষ্ঠীর মালিকানায় একাধিক সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে গণমাধ্যমে গোষ্ঠীগত প্রভাব কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। এতে গণমাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা কমেছে এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ভিত্তিও দুর্বল হয়েছে।

গণমাধ্যমের মালিকানায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিস্যায় লাগাম টানতে হবে। একক মালিকানায় স্বেচ্ছাচারের যে অবকাশ থাকে, তা বন্ধ করতে মাঝারি ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারমুখী করা এবং উদ্যোক্তা পরিচালক ও তাদের

পরিবারের সদস্যদের শেয়ার ধারণে সীমা বেঁধে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত; যেমনটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোয় আছে। একই মালিকানায় একাধিক সংবাদমাধ্যম রেখে গণমাধ্যম কেন্দ্রীভূত করার প্রবণতা রোধ করার উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন দেশ। গণমাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি ও মানুষের নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া নিশ্চিত করতে হলে আমাদেরও 'ওয়ান হাউজ ওয়ান মিডিয়া'র পথে এগোতে হবে।

গণমাধ্যমকে ব্যবসাসফল ও টেকসই করার ক্ষেত্রে একক মালিকানার চেয়ে যৌথ মালিকানার সাফল্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এতে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় থাকে, যা সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

আইনগত সংস্কার

সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলেও তাতে কিছু অস্পষ্টতা ও অযৌক্তিক সীমাবদ্ধতা আরোপ করা আছে। এছাড়া ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রচলিত কিছু আইন বাক্‌স্বাধীনতা ও মুক্ত সংবাদমাধ্যমের পথে বাধা সৃষ্টি করে আসছে। বেশকিছু নতুন আইন প্রণীত হয়েছে, যার ফলে স্বাধীন সাংবাদিকতা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা সরকারের রোষানলের শিকার হচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাসহ প্রভাবশালী মহল এবং সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ও সরকারের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছে।

স্বাধীন সাংবাদিকতার বিকাশে পেনাল কোড (দণ্ডবিধি) ১৮৬০, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮, অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩, আদালত অবমাননা আইন ১৯২৬ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩-সহ আরও কয়েকটি আইনের সংশোধন দরকার। অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সাইবার সুরক্ষা আইনের প্রস্তাব করেছে; যার বিভিন্ন বিধান নিয়ে অধিকারকর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ রয়ে গেছে।

সাংবাদিকদের বাক্‌স্বাধীনতা ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের চর্চার মতো সুরক্ষিত অধিকারের জন্য বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও শারীরিক আক্রমণের শিকার হতে হয়। এক যুগেরও বেশি সময় সাগর-রুনি দম্পতির বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় জনধারণা তৈরি হয়েছে যে সাংবাদিকদের মারলে কিছুই হয় না। বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে বাংলাদেশেও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সুরক্ষা আইন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইনের একটি খসড়া অধ্যাদেশ আকারে এই প্রতিবেদনে সংযুক্ত করেছে এবং দ্রুতই এটি জারি করার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করছে।

গণমাধ্যমের জবাবদিহি ও স্বনিয়ন্ত্রণ

সব ধরনের গণমাধ্যমকে একই তদারকি বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনা দরকার। সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার জন্য বিদ্যমান বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এবং সম্প্রচারমাধ্যম ও অনলাইনের জন্য বিগত সরকার প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা যেতে পারে, যেটি হবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং যেটি স্ব-নিয়ন্ত্রণ ও বৈশ্বিক উত্তম চর্চার নিরিখে গণমাধ্যমের জবাবদিহি নিশ্চিত করবে। প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনতার জন্য হবে স্বনির্ভর এবং তাই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়ের সামান্য একটি অংশ দিয়েই তার ব্যয়নির্বাহ সম্ভব, যেমনটি ভারতে হয়। পাশাপাশি সরকারও অনুদান দিতে পারে, তবে তা হবে নিঃশর্ত।

গণমাধ্যম কমিশন নিশ্চিত করবে যাতে ঋণখেলাপি ও ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা গণমাধ্যমের মালিক বা সম্পাদক না হতে পারেন। প্রতিষ্ঠানটি সাংবাদিকদের আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রতিপালন নিশ্চিত করবে, সাংবাদিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করবে, সারা দেশে কর্মরত সাংবাদিকদের নিবন্ধন ও তালিকা করবে। সম্প্রচার ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমের লাইসেন্স দেওয়ার এখতিয়ারও থাকবে প্রতিষ্ঠানটির হাতে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ রিপোর্টের সঙ্গে তার খসড়া সংযোজন করছে।

গণমাধ্যমের সংখ্যাধিক্য ও দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারত্বের পটভূমিতে সাংবাদিকতা বেতন-ভাতা ক্রমেই কমছে বা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। কমিশন মনে করে, সারা দেশের সাংবাদিকদের স্থায়ী চাকরির শুরুতে একটি অভিন্ন ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যা হবে সরকারি প্রথম শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার মূল বেতনের সমান এবং যা প্রতিবছর মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় হবে। ঢাকার বাইরে কর্মরত সাংবাদিকদের বেতন ও মর্যাদার বৈষম্য দূর করা, সাংবাদিকদের বাড়ি ভাড়া, অবসর ভাতা কিংবা গ্র্যাচুইটি প্রদানের কথাও বলছে কমিশন।

প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা

বাংলাদেশে গত দুই-তিন দশকে গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব বিস্তার, প্রসার ও রূপান্তর ঘটেছে, তা অনেকটা অপরিকল্পিত। বিশ্ব বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলানোর একটি অসংগঠিত প্রয়াস, যা স্বৈরশাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দুরভিসন্ধির কারণে কলুষিত হয়েছে। দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। সাংবাদিকতার গুণগত মানের উন্নতি না ঘটে বরং ক্রমাগত অবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং গুণগত দিক থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়।

তদারকির দায়িত্বে থাকা সরকারি প্রতিষ্ঠারগুলোর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্মস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স (ডিএফপি) মুদ্রিত সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্য প্রচারসংখ্যা নিশ্চিত করতে পারেনি। ডিএফপির মিডিয়া লিস্টে থাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৫৯০টি পত্রিকার ঘোষিত প্রচারসংখ্যার যোগফল দৈনিক প্রায় পৌনে দুই কোটি। অথচ হকারদের হিসাবে ঢাকাসহ সারাদেশে পত্রিকা বিক্রি দৈনিক ১০ লাখের বেশি নয়।

দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট সময়োপযোগী না হওয়ায় গত তিন-চার দশকে ঢাকাসহ সারাদেশে অসংখ্য নামসর্বস্ব সংবাদপত্র ডিক্লারেশন পেয়েছে জেলা প্রশাসন থেকে। উদ্ভব হয়েছে নানা সমস্যার।

আর্থিক সংকট

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক স্বাবলম্বিতা বা সচ্ছলতা। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম কখনোই সম্পূর্ণরূপে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ছিল না। বিজ্ঞাপনের সীমিত বাজারে এখন প্রথাগত ও ডিজিটাল মিডিয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা। মুদ্রিত সংবাদপত্রের বিক্রি দ্রুত কমছে, দর্শক-শ্রোতা হারাচ্ছে সম্প্রচারমাধ্যম। পাল্লা দিয়ে বিজ্ঞাপনের আয়ও কমছে। অনলাইনে পত্রিকার পাঠক বাড়লেও আয় বাড়েনি। গণমাধ্যমের কর্ণধারদের অনেকে জানিয়েছেন, বর্তমানে কোনো সংবাদমাধ্যমই লাভজনক নয়। এক-দুই দশক ধরে নিজের আয়ে সাফল্যের সঙ্গে চলা এবং প্রসার লাভ করা পত্রিকাগুলোও এখন ব্যয় সংকোচন করছে। একই অবস্থা বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের।

সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করলেও প্রযোজ্য নীতি সহায়তা দেয় না সরকার। বরং করপোরেট ট্যাক্সের উচ্চহার (২৭.৫%) এ শিল্পকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অগ্রিম কর ও নিউজপ্রিন্টের আমদানি শুল্ক থেকে মুক্ত করা উচিত এ শিল্পকে।

রাষ্ট্রায়াত্ত আরও দুটি প্রতিষ্ঠান–প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (জাগই)-কে একীভূত করে একটি শক্তিশালী জাতীয় গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব দিয়েছে সংস্কার কমিশন।

সরকারি বিজ্ঞাপন পেতে হলে ডিএফপির মিডিয়া লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এজন্য ন্যূনতম প্রচারসংখ্যার শর্ত আছে। প্রচারসংখ্যা নিরীক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা অস্বচ্ছ, দুর্নীতিগ্রস্ত। পত্রিকার প্রকৃত কাটতি নিরূপণ করা উচিত বিক্রির হিসাব ধরে, বিল আদায়ের রসিদের ভিত্তিতে। আয়কর রিটার্নের কপি বাধ্যতামূলক করেও প্রকৃত প্রচারসংখ্যা নিরূপণ করা যায়, যার ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন বণ্টন ও হারে স্বচ্ছতা আনা সম্ভব।

রাষ্ট্রীয় মালিকানার টেলিভিশন ও বেতার ‘পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার’ হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, এ দুটি প্রতিষ্ঠান এক ছাদের নিচে একীভূত একটি প্রতিষ্ঠানের দুটি শাখা হিসাবে কাজ করতে পারে, যাতে যৌথ সম্পদ, দক্ষতার সর্বোত্তম ব্যবহার করে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এরকম নজির বিশ্বে রয়েছে, যেমন বিবিসি এবং ডয়েচে ভেলে। আরেক রাষ্ট্রমালিকানার প্রতিষ্ঠান বাসস রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে তার প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির বার্তাকক্ষের সক্ষমতাকে কাজে লাগানো সম্ভব। তাই বাসস হতে পারে একীভূত জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার বার্তা বিভাগ। তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে বাংলাদেশ/জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা, যেটি এখনকার মতো সরকারের অর্থায়নেই চলতে পারে। পাশাপাশি নিজের আয়ের পথও খুঁজবে। একটা পথ হতে পারে টেলিভিশনের বার্ষিক লাইসেন্স ফি পুনঃপ্রবর্তন। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অনেক দেশে সম্প্রচারমাধ্যমের আয়ের প্রধান উৎস লাইসেন্স ফি।

স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশে আরও যেসব বিষয়ে নজর দেওয়া জরুরি বলে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন মনে করে, সেগুলো এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। এসব বিষয় প্রতিবেদনে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যত সংস্কারই করা হোক না কেন, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নির্ভর করবে আর্থিক স্বাবলম্বিতার ওপর। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা ভোগ করে, ব্যবসাসফল হয়ে সব প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকতে পারে, এর নজির এদেশেই আছে। টেকসই বিকাশের জন্য সরকারি নীতিসহায়তা দরকার। প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য দরকার সুচিন্তিত ব্যবসা মডেল ও উদ্ভাবন। এছাড়া আরও কিছু পরামর্শ এসেছে, যাতে সৃজনশীল গণমাধ্যম ও নতুন মাধ্যমে ছোট-বড় সব ধরনের উদ্যোগে স্বচ্ছ বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত হয়।

ভূমিকা

দীর্ঘ প্রায় দেড় দশকের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে ছাত্র-জনতার যে বীরত্বপূর্ণ অভ্যুত্থান একটি অবরুদ্ধ জাতির অবাধে মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংস্কারের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে, সেই আন্দোলনের সব শহিদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। এই আন্দোলনে পাঁচজন সাংবাদিকের গৌরবময় আত্মদানও আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। যে হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষ জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় ভুগছেন, তাদের প্রতিও আমাদের সহমর্মিতা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার গণতন্ত্রহীন দীর্ঘ অপশাসনে গণমাধ্যম যেভাবে পথ হারিয়েছিল, সেখান থেকে বের হয়ে আসার উপায় অনুসন্ধানের জন্য গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করে কমিশনের ওপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা অত্যন্ত জটিল এবং আয়াসসাধ্য।

গণমাধ্যমকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও বস্তুনিষ্ঠ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাব করার উদ্দেশ্যে ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার এই গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গঠন করে। ১৯ নভেম্বর এই কমিশন তার প্রথম সভায় মিলিত হয়ে কমিশনের কাজের উদ্দেশ্য ও পরিধি নির্ধারণ করে।

গণমাধ্যমের সংস্কার বিষয়ে কমিশনের সামনে অতীতের দুটি নজির ছিল–একটি হচ্ছে ১৯৮৪ সালের প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্ট এবং অন্যটি ১৯৯৭ সালের বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসনবিষয়ক কমিশনের রিপোর্ট। প্রথম প্রেস কমিশনের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুম আতাউর রহমান খান এবং সেই কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দেশের প্রথিতযশা সম্পাদক ওবায়দুল হক, শামসুর রাহমান, এনায়েতুল্লাহ খান, মইনুল হোসেন, আহমেদুল কবির ও আহমেদ হুমায়ুন। তাঁরা সবাই আজ প্রয়াত। আর বিটিভি ও বেতারের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে সাবেক সচিব আসাফউদ্দৌলার নেতৃত্বে গঠিত কমিশনে দেশের শীর্ষস্থানীয় সম্পাদক, সম্প্রচার ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল।

ওই দুই কমিশনই বৎসরাধিককালের বেশি সময় পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও অংশীজনদের মতামত গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল। সম্প্রচার কমিশন যুক্তরাজ্য, ভারতসহ বেশ কয়েকটি দেশ সফর করে সেসব দেশের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। গত কয়েক দশকে দেশে গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব বিকাশ, বিস্তৃতি ও রূপান্তর ঘটেছে, মাত্র ১২০ দিন সময়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বহুবিধ সমস্যাপীড়িত গণমাধ্যমের চিত্রপটের নিবিড় পর্যালোচনা একটি দুঃসাধ্য কাজ। ১৯৮২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের সংখ্যা ছিল ডজনখানেক এবং সারা দেশে প্রকাশিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক সাময়িকী মিলিয়ে সংখ্যাটি ছিল ৬০৪। বর্তমানে সংখ্যাটি ৩,২৭০টি; যার মধ্যে ঢাকার পত্রিকার সংখ্যা ১৩৭১টি। ডিএফপিতে মোট নিবন্ধিত দৈনিকের সংখ্যা ১,৩৪০।

১৯৯৭ সালের আগে দেশে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন ও বেতার ছাড়া বেসরকারি কোনো টিভি চ্যানেল বা রেডিও ছিল না। বর্তমানে অনুমোদিত বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংখ্যা ৫৩টি, যার মধ্যে প্রায় ৪০টি সম্প্রচারে রয়েছে। এফএম রেডিওর অনুমোদন আছে ২৮টির এবং নিয়মিত সম্প্রচারে আছে প্রায় ২০টি। অনলাইন পোর্টাল কী, তখন তা সম্ভবত সংবাদকর্মীদের কল্পনারও বাইরে ছিল। এখন নিবন্ধিত পোর্টালের সংখ্যা ২২৮, আর অনিবন্ধিত তিন হাজারেরও বেশি।

পত্রিকা, টিভি, রেডিও ও অনলাইন মাধ্যমের এই যে সংখ্যাধিক্য, তা সত্ত্বেও পাঠক-দর্শক, শ্রোতা সাধারণভাবে গণমাধ্যমে নির্ভুল বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ, পক্ষপাতহীন বিশ্লেষণ ও বহুমতের যথাযথ প্রতিফলন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিল; কিন্তু তা যথেষ্ট জোরালো ছিল না। নানাভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি, ক্ষমতাসীন স্বৈরতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীরা ভিন্নমত ও সমালোচনাকে দমন আর তোষণকারীদের লালনের নিয়ম চালু করেছিল। একদিকে 'উই আর অল প্রাইম মিনিস্টার্স মেন' ঘোষণা দেওয়া অনুগত সেবকদের স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে গণমাধ্যমের দৃশ্যপটে নিয়ন্ত্রণহীন নৈরাজ্য তৈরির সুযোগ করে দিয়েছেন; অন্যদিকে গুম, খুন, গ্রেফতার ও বিচিত্র ধরনের হয়রানির মাধ্যমে সাহসী সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করেছেন, তাদের শত্রুজ্ঞান করেছেন।

যেখানে প্রায় সব ধরনের বিনিয়োগে বিনিয়োগকারীকে তার আয়ের উৎস জানাতে হয়, সেখানে গণমাধ্যমের পুঁজির উৎস ঘোষণার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে গণমাধ্যমে অঘোষিত আয় বা কালোটাকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গণমাধ্যমে রাজনীতিক-আমলা-ব্যবসায়ীদের সম্পদের হিসাব চাওয়া হয়; কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের আয়ব্যয় ও সম্পদের কোনো স্বচ্ছতা নেই। গণমাধ্যমে পোশাকশ্রমিক কিংবা অন্য পেশাজীবীদের মজুরি ও অধিকারের লড়াইয়ের খবর ছাপা হয়; কিন্তু সংবাদকর্মীদের বঞ্চনা বা অভাব-অভিযোগ নিষ্পত্তির কোনো জায়গা নেই।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমজগৎ প্রকৃত অর্থেই একটি ধাঁধা। একদিকে মূলধারার বা প্রথাগত গণমাধ্যম (মেইনস্ট্রিম বা লিগ্যাসি মিডিয়া) মানুষের কাছে ক্রমেই প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে, যার প্রতিফল হিসাবে তাদের আয় কমছে এবং আর্থিক সংকট তৈরি হচ্ছে; কিন্তু তারপরও গণমাধ্যমের প্রভাবক ক্ষমতার আকর্ষণে বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিভূরা নতুন নতুন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান শুরু করছেন। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে স্বাধীন সাংবাদিকতা যখন ক্রমেই বিপন্ন হয়ে পড়ছে, তখন তার অনুষঙ্গ হিসাবে সাংবাদিকতা পেশা আরও নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চয়তার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরতন্ত্র এবং ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল গণতন্ত্রের চক্রে বাংলাদেশের গণমাধ্যম এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না পেলে গণমাধ্যমেও সুস্থ, স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতার আবহ তৈরি হবে না, বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার উপযোগী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠবে না।

গণমাধ্যমের সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কী–এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য কমিশন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে গণমানুষের চাওয়ার বিষয়টিতে। কমিশন একটি জাতীয় গণমাধ্যম জরিপ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বছরের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো খানা জরিপের মাধ্যমে ৪৫ হাজারের বেশি মানুষের মতামত সংগ্রহ করে। এ জনমত জরিপ থেকে মানুষের তথ্য জানার অভ্যাসের পরিবর্তন, তার রূপান্তর এবং গণমাধ্যমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে যে মূল্যবান ধারণা মিলেছে, তা সংস্কারের গতিমুখ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

গণমাধ্যমের অন্যান্য অংশীজন অর্থাৎ প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিক এবং বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর সঙ্গে কমিশন ধারাবাহিক মতবিনিময় সভা করেছে। বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সাব-এডিটর্স কাউন্সিল, ফটো-জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, নারী সাংবাদিক ফোরাম, জাতীয় প্রেস ক্লাবসহ অনেক সাংবাদিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সারা দেশের বিভাগীয় শহরগুলো এবং পার্বত্য জেলাগুলোর জন্য আলাদা আয়োজনসহ ঢাকার বাইরে মোট নয়টি সভায় ১,০২৬ জন অংশ নিয়েছেন। সব মিলিয়ে ৪৫টি মতবিনিময় সভায় ১,৪০১ জন উপস্থিত হয়ে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও মতামত দিয়েছেন।

আমরা গণমাধ্যমের রূপান্তরের চ্যালেঞ্জসমূহ, সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা, স্বনিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতার মতো বিষয়গুলোয় বিশ্বের উত্তম চর্চাগুলোর নজির থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। আমাদের গণমাধ্যমের গত ৫৪ বছরের পথপরিক্রমার নির্মোহ বিশ্লেষণ করেছি। গণমাধ্যমের সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়নে আমরা নির্ভর করেছি নিরেট তথ্যপ্রমাণের ওপর। শত শত পৃষ্ঠার সরকারি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর সূচনা থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিচালনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করেছি। সরকারের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দপ্তর, বিভাগ ও সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক সহায়তা পাওয়ায় গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের পক্ষে এই দুঃসাধ্য অনুশীলন সম্ভব হয়েছে।

সংবাদপত্রশিল্পের কেউ কেউ আদালতে বিচারাধীন ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের উপায় অনুসন্ধানে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ভূমিকা গ্রহণ করুক–এমনটি দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের কর্মপরিধি বা এখতিয়ারের সীমারেখা সীমিত ছিল শুধু শক্তিশালী, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার বিষয়ে। তবুও যেহেতু 'অর্থই সকল অনর্থের মূল', সেহেতু সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও তাদের আর্থিক বাস্তবতার ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

তাই সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের রুটি-রুজির নিশ্চয়তা, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের টেকসই পরিচালনব্যবস্থার প্রশ্নগুলো কমিশনকে গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।

একজন গণনীতি বিশ্লেষকের কথা ধার করে বলা যায়, গণমাধ্যম অর্থনীতির বিষয়ে আমাদের সামনে কোনো আদর্শ অনুকরণীয় মডেল নেই। তবে যেটুকু স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো, কালোটাকার দৌরাত্ম্য এবং গণমাধ্যমের প্রভাবক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি যাদের উদ্দেশ্য, তারা গণমাধ্যমের পরিসরকে নৈরাজ্য ও অসুস্থ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। জনস্বার্থের জন্য সুস্থ, নীতিনিষ্ঠ এবং ভালো গণমাধ্যমের জন্য স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক যে অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। সংবাদ প্রথমত একটি জনসেবার বিষয়, অন্যসব পণ্যের মতো মুনাফামুখী নয়। তাই সংবাদের কারবার সবসময় লাভজনক হবে না; কিন্তু তার পরিচালনব্যবস্থা টেকসই হতে হবে। গণমাধ্যমের বর্তমান পরিচালন মডেলে তাই একটা বলিষ্ঠ ও সাহসী পরিবর্তন প্রয়োজন।

বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে আরেকটি বড় বাধা হচ্ছে, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। ক্ষমতাধররা, তা সে রাজনৈতিক ক্ষমতা কিংবা আর্থিক অথবা সামাজিক, যে ক্ষমতার অধিকারীই হোন না কেন–তার অপপ্রয়োগে নানা ধরনের আইনের সুযোগ নেন, তার অপব্যবহার করেন। এসব আইন ও সরকার ঘোষিত নীতিমালা গত দেড় দশকে ভিন্নমত দমনে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনই তোষণকারীদের লালন-পালনেও সহায়ক হয়েছে। নিপীড়ক ও দমনমূলক আইনগুলোর সংস্কার এবং সাংবাদিকতার পেশাগত অধিকারের সুরক্ষায় বিশেষভাবে সরকারকে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

গণমাধ্যমের জবাবদিহি তার পাঠক-দর্শক-শ্রোতার কাছে। স্বেচ্ছায় গণমাধ্যম যদি নিজেদের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা তুলে ধরে, স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ করে, ভুল করলে স্ব-উদ্যোগে তা স্বীকার করে নেয় এবং সংশোধনী প্রকাশ করে ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষোভ প্রশমন করে, তাহলে সেখানে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সরকারের নাক গলানোর পথ বন্ধ করা সহজ হয়। গণমাধ্যমে তাই স্বনিয়ন্ত্রণের এমন ব্যবস্থা প্রয়োজন, যা সরকারের প্রভাবমুক্ত থেকে যথার্থই স্বাধীনভাবে কাজ করবে।

কমিশন সময়ের টানাপোড়েন ছাড়াও আরও কিছু সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ও সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে কমিশন চিঠি দিয়ে গণমাধ্যম সংস্কার বিষয়ে তাদের মতামত চেয়েছিল। কিন্তু তাতে আশানুরূপ সাড়া মেলেনি। অল্প কয়েকটি দল লিখিত প্রস্তাব দিয়েছে। তবে আশার কথা, বড় রাজনৈতিক দলগুলোর নিজস্ব ঘোষণায়ও সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন করার মতো অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে।

পতিত স্বৈরাচারের সহযোগী হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে–এমন অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান তাদের নিন্দনীয় ভূমিকার জন্য ভুল স্বীকার ও দুঃখপ্রকাশ না করেও নির্বিঘ্নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অন্তর্বর্তী সরকার যেমন তাদের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তি আরোপ করেনি, তেমনই গণ-আন্দোলনে অংশ নেওয়া অনেক গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ওইসব প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েছেন। তবে ওইসব প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সধারীদের কাছে তাদের আত্মসমালোচনা বা অতীত মূল্যায়ন সম্পর্কে জানার জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানানোয় কমিশন সমালোচিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ফলে যারা 'আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনীতি' প্রচারের অঙ্গীকার করে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স পেয়েছেন, তাদের সর্বসাম্প্রতিক ভাবনা ধোঁয়াশাচ্ছন্নই রয়ে গেছে।

কমিশন যে সুপারিশমালা পেশ করছে, এর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের উপযোগী শক্তিশালী, বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন প্রাণবন্ত গণমাধ্যমের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ। কমিশন আশা করে, অন্তর্বর্তী সরকার এবং তার উত্তরসূরি নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেবে।

২

স্বাধীন বাংলাদেশে গণমাধ্যমের ঐতিহাসিক পরিক্রমা

'সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ' কথাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হলেও একটি দেশের গণমাধ্যমের বাস্তবতা তার রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির নির্ভরযোগ্য সূচক হিসেবে কাজ করে, তা সে রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, রাজতান্ত্রিক, কর্তৃত্ববাদী বা একদলীয় ব্যবস্থাধীন হোক না কেন। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের দীর্ঘ ৫৪ বছরের পথচলাও এর থেকে আলাদা নয়। ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে বিগত পাঁচ দশকে এর স্বরূপে, লক্ষ্যে এবং আচরণে বহু পরিবর্তন দেখা গেছে। কালানুক্রমিক পর্যালোচনায়, গণমাধ্যমের বিকাশের বিভিন্ন অধ্যায় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যার মধ্যে দুটি স্বল্পস্থায়ী অধ্যায় ছিল যখন এটি তুলনামূলকভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করেছে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়টি খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল, স্বাধীনতার পর তা বছর দুয়েকের মতো স্থায়ী হয়েছিল; আর দ্বিতীয় পর্বটি ছিল নব্বইয়ের দশকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পরে। আর এ দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়ের পরিস্থিতি ছিল হতাশাজনক। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ এবং ১৯৮২-১৯৯০ সালের মধ্যে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দারুণভাবে সংকুচিত হয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ধারাবাহিক চেষ্টা হয়েছে। তবে এর মধ্যেও ১৯৭৫-১৯৮২ সময়কালে গণমাধ্যম সীমিত আকারে তার অধিকার চর্চার সুযোগ পেয়েছিল।

১৯৯০-পরবর্তী বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর আমরা একই ধরনের চিত্র প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথমে ধীরে ধীরে উদারীকরণ এবং এরপর নতুন নতুন কৌশলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। পরিস্থিতির এতটাই অবনতি ঘটে যে দেড় দশক ধরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার আন্তর্জাতিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের ক্রমাবনতি ঘটেছে এবং তা এখন ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬৫তম স্থানে রয়েছে। ২০২১ সালে রিপোর্টার্স স্যঁ ফ্রতিয়েঁ (আরএসএফ) রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিন, চীনের রাষ্ট্রপতি শি এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের পতিত স্বৈরাচার শেখ হাসিনাকেও 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী' (প্রেস ফ্রিডম প্রিডেটরস) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো গণমাধ্যমের আনুগত্য আদায়ের জন্য যেমন প্রলোভন দেখিয়েছে, তেমই দমন-পীড়নের কৌশলও অবলম্বন করেছে। প্রকাশনা ও সম্প্রচার লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা; মুদ্রণসামগ্রী ও সম্প্রচার সরঞ্জামের ওপর আমদানি শুল্ক নির্ধারণ; সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ; বিজ্ঞাপনের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব; সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার সীমিতকরণ; আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পরামর্শের নামে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ; পরোক্ষ হুমকি ও হয়রানির উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পরপরই সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কৌশল হিসেবে সরকার রপ্তানির জন্য বিদেশে উচ্চ চাহিদার অজুহাত দেখিয়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নিউজপ্রিন্টের ওপর কোটা আরোপ করে। পরবর্তী বছরগুলোয় যখন সংবাদপত্রগুলো আমদানি করা নিউজপ্রিন্টের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন এই কোটা ব্যবস্থা সম্পাদকীয় নীতিকে প্রভাবিত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজনৈতিক মিত্রদের অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা খোলাবাজারে বিক্রির মতো অনৈতিক ব্যবসার সুযোগ তৈরি করে দেয়। আনুগত্যকে পুরস্কৃত করার একটি হাতিয়ার হিসেবে সরকারি বিজ্ঞাপনের ব্যবহার একটি সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়।

২.১ স্বাধীন দেশে উত্তরাধিকার ও নবযাত্রা

রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের পর নবগঠিত রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম কয়েক বছর ছিল বাস্তবিক অর্থেই বিশৃঙ্খল ও সংকটপূর্ণ। রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি গণমাধ্যমের প্রতি সরকারের নীতিও ছিল পরস্পরবিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বৈরাচারী শাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রামে গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায়, স্বাধীনতা লাভের পর গণমাধ্যমও নব-স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত হয়। পাকিস্তানি সামরিক অভিযানের

সময় বন্ধ হয়ে যাওয়া বহু সংবাদপত্র ও সাময়িকী পুনরায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব সংবাদপত্র প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছিল, তাদের মালিকেরা হয় পাকিস্তানে পালিয়ে যান, নয়তো আত্মগোপনে চলে যান, অথবা তাদের সম্পাদকদের অপসারণ করা হয়। ব্যতিক্রম ছিল 'দ্য বাংলাদেশ অবজারভার', যার মালিক ছিলেন সাবেক পাকিস্তানি মন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী। এই পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম নতুন সরকারের অধীনেও তার পদ ধরে রাখেন। তবে ১৯৭২ সালের শুরুতে 'দ্য সুপ্রিম টেস্ট' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় লেখার পর সালাম চাকরি হারান, যেখানে তিনি একটি জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দোসরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা, অবকাঠামো ও কলকারখানা ধ্বংসের ফলে কর্মসংস্থানের অভাব, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতির কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। দেশজুড়ে গণপিটুনির ঘটনা ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। চারদিকে সহিংস মৃত্যু রোধে সরকারের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ সাংবাদিক নির্মল সেন ১৯৭৩ সালের ১৪ মার্চ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত দৈনিক বাংলায় 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখে সরকারের জবাবদিহি দাবি করেন। সহকর্মীরা তার শারীরিক নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে আশ্চর্যজনকভাবে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত পত্রিকাটি পরের দিন নিবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করে। কারণ প্রথম সংস্করণে কিছু মুদ্রণগত ত্রুটি ছিল।

২.২ একদলীয় শাসনে কণ্ঠরোধ

দুর্ভাগ্যবশত, অন্যান্য কিছু ঘটনায় রাষ্ট্র এতটা সহনশীল ছিল না। একই বছর এবং একই পত্রিকায়, সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ ফারাক্কা বাঁধের কারণে সৃষ্ট সমস্যাগুলোর ওপর 'এপার পদ্মা, ওপার গঙ্গা' শিরোনামে দুই পর্বের একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, কিন্তু সরকারের হস্তক্ষেপে দ্বিতীয় অংশটি আর প্রকাশিত হয়নি। সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলের কর্মীদের দ্বারা সংবাদপত্র বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছিল। মওলানা ভাসানীর প্রকাশিত 'হক কথা'সহ সরকারের সমালোচনাকারী বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রের অনুমতি বাতিল করা হয়েছিল। আরেকটি পত্রিকা, দৈনিক গণকণ্ঠ, যা সরকারের তীব্র সমালোচনা এবং নবগঠিত বিরোধী দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পরিচিত ছিল, তা নিয়মিত হয়রানি ও আক্রমণের শিকার হয় এবং এর সম্পাদক কবি আল মাহমুদকে গ্রেফতার করা হয়।

একইভাবে ১৯৭৩ সালে প্রেস ও প্রকাশনা আইন ১৯৭৩-এর অধীনে হলিডে প্রকাশনা দুই মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল এবং ১৯৭৫ সালের ২৩শে মে এটি পুনরায় নিষিদ্ধ করা হয়। এর সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খানকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে কারাবন্দি করা হয়। শিল্পী আব্দুল লতিফ, আব্দুল আলীম এবং ফেরদৌসী রহমানের মতো জনপ্রিয় শিল্পীদের বেতার-টিভিতে নিষিদ্ধ করার পটভূমিতে 'সিক্সটি-ফাইভ মিলিয়ন কোলাবরেটরস' শিরোনামের নিবন্ধ লেখার কারণে সরকার তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রেস ও প্রকাশনা আইন প্রণয়ন করে, যার মাধ্যমে সরকারকে সংবাদপত্রের লাইসেন্স প্রদান এবং বইসহ সকল প্রকাশনার নিবন্ধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। এরপর, ১৯৭৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করে সরকারকে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রতিরোধমূলক আটকের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ওই আইনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ যেকোনো প্রতিবেদন প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে পারত।

এরপর ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী কার্যকর করা হয়, যার মাধ্যমে বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থা বাতিল করে শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের নতুন রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়, যার সদস্যপদ সংক্রান্ত সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। দলটিতে বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সদস্যপদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সম্পাদক ও সাংবাদিকরা বাকশালের সদস্য হন।

১৯৭৫ সালের ১৬ই জুন সরকার সংবাদপত্র ঘোষণা (সংশোধন) অধ্যাদেশ জারি করে, যার অধীনে ২৯টি দৈনিক এবং ১৩৮টি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। কেবল দুটি ইংরেজি এবং দুটি বাংলা সংবাদপত্র সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। এ চারটি সংবাদপত্রের মধ্যে দ্য বাংলাদেশ অবজারভার ও দৈনিক বাংলা ইতোমধ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণে ছিল। অন্য দুটি সংবাদপত্র ছিল শেখ ফজলুল হক মণির মালিকানাধীন দ্য বাংলাদেশ টাইমস এবং প্রয়াত তফাজ্জল হোসেনের (মানিক মিয়া) উত্তরসূরিদের মালিকানাধীন দৈনিক ইত্তেফাক, যার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের পারিবারিক সম্পর্ক সুবিদিত ছিল।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল প্রেস ইনস্টিটিউট (আইপিআই) তাদের ১৯৭৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছিল, 'সরকারি দৈনিক পত্রিকা ছাড়া সব সংবাদপত্রের ওপর ১৬ জুনের স্থগিতাদেশ দেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার শেষ চিহ্নের অবসান ঘটিয়েছে। এভাবে তিন বছরের মধ্যে সংবাদপত্র ১৯৭২ সালের ভার্চুয়াল স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণ সরকারি দমনে চলে গেছে।'

২.৩ সামরিক শাসনের যুগ

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাজনীতিতে এক মর্মান্তিক পরিবর্তন আসে, যখন এক রক্তক্ষয়ী সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। অভ্যুত্থানকারীরা শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে একটি নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ স্থান পান। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আরও দুটি অভ্যুত্থান ও পালটা অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে, যার মাধ্যমে জেনারেল জিয়াউর রহমান কার্যত শাসক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯৭৭ সালের এপ্রিলে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং ১৯৭৯ সালে সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হতে শুরু করে।

তবে জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়ার আগেই গণমাধ্যমের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার শুরু হয়। বাকশালের শাসনব্যবস্থা বাতিল করে মোশতাক সরকার সংবাদপত্র ঘোষণা (সংশোধন) অধ্যাদেশ (১৯৭৫)-ও বাতিল করে। ফলস্বরূপ, নিষিদ্ধ সংবাদপত্রগুলো তাদের প্রকাশনা পুনরায় শুরু করার সুযোগ পায়। অনেক সাংবাদিকের জন্য এর অর্থ ছিল অনিশ্চয়তার অবসান এবং পেশায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ। জেনারেল জিয়াউর রহমান পরবর্তী সময়ে দেশের উত্তরাঞ্চল থেকে দৈনিক বার্তা নামে সরকারি অর্থায়নে একটি নতুন সংবাদপত্র চালু করেন; সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) প্রতিষ্ঠা করেন; সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি সালিশ সংস্থা হিসেবে প্রেস কাউন্সিল গঠন করেন এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের জন্য একখণ্ড সরকারি জমি ইজারা প্রদান করেন। যখন তিনি নিজের রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি তার দলের নীতি ও কার্যক্রম প্রচারের জন্য দৈনিক দেশ নামে একটি দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকতার অনুকূলে এসব ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও সম্পাদকীয় স্বাধীনতায় সরকারের হস্তক্ষেপ অব্যাহত থাকে। দেশে কথিত রুশ গুপ্তচরদের একটি তালিকা প্রকাশের কারণে দ্য রিপোর্টার নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাংবাদিক দুর্গা দাস ভট্টাচার্যকে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর, তার উত্তরসূরি রাষ্ট্রপতি সাত্তারের বেসামরিক সরকারও তথাকথিত 'প্রেস অ্যাডভাইস' জারির প্রথা বজায় রাখে। প্রয়াত সাংবাদিক মাহফুজ উল্লাহ তার গ্রন্থে ১৯৮২ সালের ২৬শে এপ্রিলের একটি ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, যেখানে সংবাদপত্রগুলোকে কারফিউ চলাকালীন গ্রেফতারের সংবাদ প্রকাশ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সরকারের ধারণা ছিল, কারফিউ ভঙ্গ সংক্রান্ত সংবাদ সরকারকে রাজনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জ করবে।

১৯৮২ সালে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর 'প্রেস অ্যাডভাইস' রাষ্ট্রীয় নীতির

অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে, যা গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হতো। ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পরই জেনারেল এরশাদ সাংবাদিকদের আশ্বাস দেন যে তিনি চান সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীনভাবে লিখুক, যা পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের আমলে সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার সরকারই সংবাদমাধ্যমের জন্য সর্বাধিক লিখিত নির্দেশনা জারি করে, এমনকি এমন বিষয়েও যা রাষ্ট্রীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৮৫ সালের নভেম্বরে মালয়েশিয়া সফরে থাকাকালীন তার রচিত একটি কবিতা প্রকাশের নির্দেশ জারি করা হয়।

এরশাদ এবং তার মন্ত্রীরা প্রায়ই তাদের কার্যকলাপ বা নীতি প্রচারের চেয়ে বরং অপ্রীতিকর ও বিব্রতকর সত্য গোপন করার জন্য 'প্রেস অ্যাডভাইস' ব্যবহার করতেন। পিআইডির প্রেস অ্যাডভাইস হিসেবে এটি বহুল আলোচিত। সংবাদপত্র অফিসে এ নামে লগ বই ব্যবহার করা হতো। বেশির ভাগ প্রেস অ্যাডভাইস আসত সন্ধ্যার পর। উপরন্তু, জেনারেল এরশাদ মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের নির্দেশ দিতেন। ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগস্ট এমন একটি নির্দেশনা জারি করা হয়, যেখানে সংবাদপত্রগুলোকে লিখতে বলা হয় যে, দেশের পাঁচটি রাজনৈতিক দল ঢাকায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'জাতীয় ফ্রন্ট' নামে একটি জোট গঠন করেছে, যদিও বাস্তবে কোনো সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। বস্তুত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওই জোটের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলোকে সরকারপ্রধানের (এরশাদ) বক্তৃতা এবং মন্তব্য প্রকাশ করা থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হতো। ১৯৮৫ সালের ২৩শে নভেম্বর জারি করা একটি পরামর্শপত্রে সংবাদপত্রগুলোকে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাপ্তাহিক 'জাগরণ'-এ জেনারেল এরশাদের দেওয়া সাক্ষাৎকারটি প্রতিবেদন বা পুনর্মুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

এরশাদের শাসনামলে সাংবাদিকরা কঠোর পরিণতি এড়াতে বিরোধী দলের কর্মসূচি সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করার জন্য একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন। সরকার সংবাদপত্রগুলোকে হরতাল (সাধারণ ধর্মঘট) সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ না করার নির্দেশ দিলে সাংবাদিকরা 'দেশব্যাপী কর্মসূচি' পালনের জন্য বিরোধী দলের আহ্বানের কথা লিখতেন, যা পাঠকদের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে বোধগম্য হতো।

জেনারেল এরশাদ সম্পাদকদের সঙ্গে মাসিক বৈঠক আয়োজনের প্রথা চালু করেন, যেখানে পত্রিকার মালিকদের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারের সমালোচনামূলক নিবন্ধ ও খবরের বিষয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করতেন। জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'যায়যায়দিন'সহ বেশ কয়েকটি সাময়িকী বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সম্পাদক শফিক রেহমানকে কিছু সময়ের জন্য দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এরশাদের শাসনামলে 'বিচিন্তা' নামক আরেকটি সাপ্তাহিকও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত সংবাদপত্র 'বাংলার বাণী'ও কয়েক মাসের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন নিষিদ্ধ করা একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়।

১৯৯০ সালের শেষদিকে দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ-শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার অভূতপূর্ব ঐক্যের ফলে যখন এরশাদের পতন আসন্ন, তখন তিনি গণমাধ্যমের ওপর কঠোর প্রাক-সেন্সরশিপ আরোপ করার চেষ্টা করেন। সংবাদপত্রগুলোকে প্রকাশের পূর্বে সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন ও সম্পাদক পরিষদ এই নতুন নীতি প্রত্যাখ্যান করে ২৭ নভেম্বর থেকে ধর্মঘটে যায়, যা তার সরকারের পতনের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হয়।

২.৪ গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন ও গণমাধ্যমের উদারীকরণ

১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচার থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তবে এ উন্নতি ক্ষণস্থায়ী ছিল। এরশাদের পতনের পর তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সর্বদলীয় সম্মতিতে ৯০ দিনের মধ্যে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইনের দমনমূলক বিধান সংশোধন করে, যার মাধ্যমে সরকার যেকোনো প্রকাশনা কোনো কারণ না দেখিয়েই বন্ধ করার ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে বিবেচিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিজয়ী হয় এবং খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। তবে তার প্রথম মেয়াদে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিসহ বেশ কয়েকটি ইস্যুতে অস্থিরতা দেখা দেয়। এ অস্থিরতা সত্ত্বেও গণমাধ্যমের পরিবেশে সীমিত পরিসরে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়। তার সরকার প্রথমবারের মতো বিদেশি সম্প্রচারকদের জন্য আকাশ উন্মুক্ত করে দেয়, যার ফলে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস তাদের অনুষ্ঠান এফএম ফ্রিকোয়েন্সিতে সম্প্রচার করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কেবল টিভি নেটওয়ার্ক সিএনএনকেও বাংলাদেশে সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়। তবে বেসরকারি খাতে সম্প্রচারমাধ্যমের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিভিশন ও রেডিওকে বিরোধী দলের সংবাদ সীমিত আকারে প্রচারের সুযোগ দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ফ্রিডম হাউজ ১৯৭৩ সাল থেকে রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার বিশ্বব্যাপী প্রবণতা পর্যবেক্ষণের জন্য পরিচিত। ১৯৯১ সালে তারা বাংলাদেশকে 'মুক্ত' গণতন্ত্রের মর্যাদা প্রদান করে, যার অপরিহার্য শর্তগুলোর মধ্যে ছিল নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। এই অর্জিত স্বাধীনতা তার প্রথম মেয়াদের অধিকাংশ সময় বজায় থাকলেও তা স্থায়ী হয়নি।

২০০৬ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে ক্ষমতার পালাবদলের সময়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে এবং সাংবাদিকদের জন্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রথমবার ক্ষমতায় ফিরে আসে এবং বিনোদনের জন্য সংবাদ ও সমসাময়িক বিষয়ে অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্দেশ্যে একুশে টিভি, এটিএন বাংলা ও চ্যানেল আই-এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রচার লাইসেন্স প্রদান করে। তবে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের সংবাদ প্রকাশের কারণে সাংবাদিকরা গুরুতর শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে প্রথম আলোর ফেনীর প্রতিনিধি টিপু সুলতানও ছিলেন। ১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনার সরকার ট্রাস্ট মালিকানাধীন পত্রিকা দৈনিক বাংলা, টাইমস, বিচিত্রা ও আনন্দ বিচিত্রা বন্ধ করে দেয়।

২০০১ সালে উচ্চ আদালত ইটিভির লাইসেন্স বাতিল করে এবং বেসরকারি চ্যানেলগুলোকে টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচার থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে আদালতের রায়ের অজুহাতে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সম্প্রচার সরঞ্জাম জব্দ করে। সরকারের সমালোচক সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা হুমকি ও হয়রানির সম্মুখীন হন। আওয়ামী লীগের পূর্ববর্তী শাসনামলের তুলনায় এই পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত খারাপ ছিল। কিন্তু ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতির ক্রমাবনতি চরমে পৌঁছায়। আওয়ামী লীগও পূর্ববর্তী বিএনপি শাসনামলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত তিনটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয়, বিএনপি-সমর্থিত সংবাদপত্র 'আমার দেশ'-এর ছাপাখানা বন্ধ করে দেয় এবং পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশককে গ্রেফতার করে। কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)-এর তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে পাঁচজন সাংবাদিক নিহত হন এবং ২০০২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে নিহত সাংবাদিকের সংখ্যা ছিল সাত। একই ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়, ২০১২ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১১ জন সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন। সিপিজের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সরকারের অধীনে সংবাদমাধ্যম যে হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, তার তীব্রতা স্পষ্ট হয়।

২.৫ নৈরাজ্যের যুগ

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বহুত্ববাদের ধারণাটি কেবল সংখ্যাগত আধিক্যেই পর্যবসিত হয়েছে, যেখানে বহুমত, বৈচিত্র্য বা ভিন্নমতের প্রতিফলন অনুপস্থিত। স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতে গণমাধ্যম বলতে মূলত সংবাদপত্রকেই বোঝাত, কারণ ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা সম্প্রচারমাধ্যম ছিল সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু বর্তমানে প্রথাগত গণমাধ্যম এবং নতুন ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম-উভয়েরই প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে ঢাকায় ১,২০০টি দৈনিক সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন রয়েছে এবং সারা দেশে ৩,০০০টিরও বেশি (যদিও এর মধ্যে কতগুলো আসলে প্রকাশিত হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়)। এছাড়াও তিন ডজনের বেশি টিভি চ্যানেল সম্প্রচারে রয়েছে। দুঃখজনকভাবে এই অনিয়ন্ত্রিত

বৃদ্ধি প্রকৃত স্বাধীন গণমাধ্যমের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

গত দেড় দশকে দেশটি এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক রূপান্তর দেখেছে। এই সময়ে বিরোধী দলকে নির্মূল করার প্রক্রিয়ায় সংবাদমাধ্যম যেমন সরাসরি সরকার ও সরকার সমর্থকদের আক্রমণের শিকার হয়েছে, তেমনই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও তাদের আইনগত সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেমন মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন ও নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়েছে, তেমনই আদালতও সাংবাদিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বিচারকদের কেউ কেউ রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করেছেন।

দেশের তিনজন সুপরিচিত সম্পাদককে বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে, বারবার রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এবং দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকতে হয়েছে। দৈনিক আমার দেশ-এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়, তার ছাপাখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়, অন্য ছাপাখানায় পত্রিকা ছাপানোর অজুহাতে ডিক্লারেশন বাতিল করা হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহ, হত্যাচেষ্টা ও অপহরণ, গাড়ি পোড়ানোসহ মানহানির ১২৪টি মামলা দিয়ে কারাগারে দু'দফায় ৫ বছরের বেশি আটক রাখা হয়। শেখ হাসিনার মানহানির অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জেলায় অনেক মামলা হয় এবং একটি মামলায় হাজিরা দিতে যাওয়ার সময় কুষ্টিয়া আদালত প্রাঙ্গণে আওয়ামী লীগ কর্মীরা তার ওপর হামলা চালায়। আহত অবস্থায় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও পুলিশ ব্যর্থ হয়। বিচার প্রক্রিয়ার সমালোচনা করার জন্য আদালত অবমাননার অভিযোগে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। এরপর কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়কে কথিত অপহরণ ও হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একটি মামলায় আসামি করা হয়। জয়কে অপহরণের ষড়যন্ত্রের কথিত মামলায় দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার সম্পাদক অশীতিপর শফিক রেহমানকেও গ্রেফতার করা হয় এবং নেওয়া হয় রিমান্ডে। ২০১৯ সালে যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশের জেরে দৈনিক সংগ্রাম-এর সম্পাদক আবুল আসাদকে তার দপ্তরে ঢুকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা এবং তাকে পুলিশের কাছে তুলে দেয়। এরপর পুলিশ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তার বিরুদ্ধে মামলা করে এবং প্রায় পাঁচ বছর তিনি বিচারাধীন বন্দি হিসেবে জেলে ছিলেন।

অন্য সম্পাদকদের মধ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫৫টি মামলা হয়। ২০০৬-০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, ডিজিএফআই-এর সরবরাহ করা তথ্য অন্য কোনো সূত্র থেকে যাচাই না করে ছাপানো ভুল হয়েছিল বলে এক টিভি সাক্ষাৎকারে দেওয়া বক্তব্যের জেরে ডেইলি স্টার-এর সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮৪টি মামলা করা হয়, যার মধ্যে ১৬টি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহের। দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে এ ধরনের হয়রানিমূলক মামলার কোনো নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন অধিকারগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, এ সংখ্যা কয়েক ডজনের বেশি।

সাংবাদিক নেতা শওকত মাহমুদ ও রুহুল আমীন গাজীকে মামলা দিয়ে এক বছরের বেশি জেলে আটক রাখা হয়। এছাড়া মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, নিউএজ সম্পাদক নূরুল কবীর নানা ধরনের হয়রানির শিকার হন। জেলে নেওয়া হয় সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমানকে। লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপি নেতা তারেক রহমানের বক্তব্য সম্প্রচারের জন্য একুশে টিভির চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ও সাংবাদিক কনক সরওয়ারকে কারাগারে পাঠানো হয়।

গণমাধ্যমের কাছ থেকে আনুগত্য আদায়ের জন্য বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থার চরম অপব্যবহার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রকাশনা ও সম্প্রচার লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষমতা; নিউজপ্রিন্ট ও সম্প্রচার সরঞ্জামসহ মুদ্রণসামগ্রীর ওপর সীমাবদ্ধ আমদানি শুল্ক আরোপ; সরকারি বিজ্ঞাপন বরাদ্দ; এ ধরনের বিজ্ঞাপনের অর্থ পরিশোধে বিলম্ব করা; সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অফিসিয়াল কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার সীমিত করা; সরকারি ও অনানুষ্ঠানিক পরামর্শ প্রদান; হুমকি ও হয়রানির জন্য আইন প্রয়োগ করা এবং মাঝে মাঝে সহিংসতার আশ্রয় নেওয়া।

গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, তা সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল, রেডিও অথবা অনলাইন যা-ই হোক না কেন, তার অনুমতি বা লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে সব আইন ও নীতিমালা উপেক্ষা করে রাজনৈতিক পরিচয়কে প্রধান বিবেচ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্থিক দুর্নীতি। এমনকি গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ্যের কোনো প্রমাণ ছাড়াই আবেদনকারী 'আওয়ামী লীগের কর্মী' পরিচয় ও 'আওয়ামী লীগের আদর্শ প্রচারের জন্য টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্সের জন্য' আবেদন করে সরকারের অনুমোদন পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের প্রতি দলীয় আনুগত্যের জন্য পরিচিত সাংবাদিকদের অনেকেই প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে তোষণ ও বন্দনার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন, যা সাংবাদিকতা পেশাকে কলুষিত করার পাশাপাশি স্বৈরতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করেছে। একই সঙ্গে এসব তোষণকারী বেসরকারি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স বাগিয়ে নিয়েছেন, অথবা সম্পাদক বা প্রধান নির্বাহীর পদ কিংবা বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি পেয়েছেন।

২০০৯ সালের পর অনুমোদন পাওয়া টিভি চ্যানেলগুলোর একটি বড় অংশ এভাবেই দলীয় প্রচারের ঘোষণা বা অঙ্গীকারের মাধ্যমে লাইসেন্স নিয়ে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ও সক্রিয়ভাবে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪-এর সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার (তৃতীয় অধ্যায়)-এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মানদণ্ডে বর্ণিত 'তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা', 'পেশাগত নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা' এবং আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে 'সকল পক্ষের যুক্তিসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ' থাকার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা উপেক্ষা করে এসব চ্যানেল ক্ষমতাসীন দল ও তার সহযোগীদের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও নির্বাচনের সময়ে তা এতটাই প্রকট রূপ নেয় যে বিরোধী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে কুৎসা প্রচার এবং আন্দোলনকারীদের সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া নিয়মে পরিণত হয়েছিল। সামান্য ভিন্নমত ও যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা যখনই কেউ করেছেন, তখনই তাদের টেলিভিশনে উপস্থিতি বন্ধ করতে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর হয়েছে। অনেক সংবাদ ব্যবস্থাপক ও সাংবাদিককে ডিজিএফআই কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে এবং কিছু ক্ষেত্রে তাদের চাকরিচ্যুত করতে মালিকদের বাধ্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার জুলাই আন্দোলনের সময়ে অনেক টিভি চ্যানেলে আন্দোলনকারী ছাত্রনেতাদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার ও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার করা হয়। বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রও সরাসরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের সশস্ত্র সমর্থকদের নিষ্ঠুর বর্বরতার পক্ষে সাফাই ও সমর্থন দেয়।

আওয়ামী লীগের সমর্থক ও অনুগত সাংবাদিকদের অনেকেই আন্দোলন দমনে শক্তি প্রয়োগ ও সহিংসতায় উসকানি জুগিয়েছেন। এমনকি শত শত ছাত্র হত্যার নির্দেশ দেওয়ার জন্য মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে এক সভায় যোগ দিয়ে তারা আন্দোলন দমনে ব্যর্থতার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকে দায়ী করে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান দমনের জন্য সাবেক সরকার বর্বর নৃশংসতা চালায়। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, নির্বিচারে গুলি, হত্যা ও আহতদের সম্পর্কে দেশের মানুষ যেন জানতে না পারে, সেজন্য তারা গণমাধ্যমকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। ফলে অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম সরকারের নির্দেশমতো প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেনি। অনেকেই ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য নানারকম মনগড়া, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করে। নিচে কয়েকটি শিরোনাম থেকে এর একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে:

১৭ জুলাই
নিজেদের রাজাকার ঘোষণায় জনসমর্থনে ধস, জনকণ্ঠ
রাজনৈতিক নীলনকশা প্রকাশ, ভোরের কাগজ

২১ জুলাই
বিএনপি-জামায়াতের মরণকামড়, ভোরের কাগজ

দৈনিক ইত্তেফাক

শুক্রবারের

টাকায় পদ কিনে মাঠে নামবে কেন

কোটার আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে রহস্য

এক দিনে ২৫ হাজার কোটি টাকা ধার দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

থেমে গেল শাফিনের কণ্ঠ

দুধ নিয়ে দুর্যোগে খামারিরা

সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি

কালের কণ্ঠ

নেপথ্যে জামায়াত-বিএনপির শীর্ষ ৫০ নেতা

তদন্তে সহযোগিতার প্রস্তাব জাতিসংঘের

ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনার ভাষা নেই জনগণের কাছে বিচার চাইছি

ঐক্যের জন্য ডাকা সভায় বিবাদে জড়ালেন নেতারা

ছয় দিনে সারা দেশে চার হাজারের বেশি গ্রেপ্তার

ছয় দশকে পৌনে ৩ লাখ হেক্টর বন সৃজন

দৈনিক কালবেলা

ছাত্রলীগের তিন নেতার ভূমিকা 'রহস্যময়'

তিন সমন্বয়কের টার্গেট ছিল সরকার পতন

ছাত্র আন্দোলনকে পুরোপুরি রং হ্যান্ডলিং করেছে সরকার

সংঘর্ষের ৪ দিনে ঢাকায় নতুন এক লাখ সিম

ইসলামী ব্যাংক

Offshore Banking

ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলুন ইসলামী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে

আমাদের সময়

গ্রেপ্তারের তালিকা বড় হচ্ছে

ক্লাসে ফিরতে চায় শিক্ষার্থীরা

শিপিং খাতের যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়নি

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-এর সাথে INSURANCE আরও নিরাপদ আরও বিশ্বস্ত

BANCASSURANCE

আজই ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-এর নির্ধারিত শাখা থেকে Insurance Policy ক্রয় করুন

আর ঝামেলা ছাড়াই Premium প্রদান করুন এবং বীমা দাবী গ্রহণ করুন

আমাদের Partner হিসেবে আছে দেশের সুরক্ষিত, শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য Guardian Life Insurance

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক

২৬ জুলাই
আন্দোলন পরিচালনায় ছিলেন ২ শতাধিক বিএনপি নেতা, ভোরের কাগজ

২৪ জুলাই
দুর্বৃত্তদের হিংস্রতার দগদগে ক্ষত দেশজুড়ে, কালের কণ্ঠ

২৬ জুলাই
নেপথ্যে জামায়াত-বিএনপির শীর্ষ ৫০ নেতা, কালের কণ্ঠ

২৭ জুলাই
ষড়যন্ত্র দেশে-বিদেশে সমান তালে অপপ্রচার, ভোরের কাগজ

২৮ জুলাই
শিবির ছাত্রদলের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দেওয়ার পরদিন শিক্ষার্থী হত, কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ডেইলি সান

২.৬ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত কয়েক মাসে দেশের মিডিয়াজগতে ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। অনেক সংবাদমাধ্যমে সম্পাদকসহ শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিরা নিরাপত্তাহীনতা ও চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে পড়েন। তাদের কেউ কেউ আত্মগোপনে চলে যান। ৭১ টিভির মোজাম্মেল বাবু, ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত, ৭১ টিভির বার্তাপ্রধান শাকিল আহমেদ ও বিশেষ প্রতিনিধি ও টক-শো উপস্থাপক ফারজানা রুপাকে দেশত্যাগের চেষ্টার সময় আটক করে পরে হত্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথম দুজন বেআইনিভাবে সীমান্ত পেরোনোর চেষ্টা করছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে মামলার দাবি করা হলেও তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। এদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, গত ১৫ বছরে তারা বিভিন্ন সময়ে ফ্যাসিবাদী সরকারের সহযোগী হিসেবে এমন সব কাজ করেছেন, যা সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। বরং তারা দলীয় কর্মী হিসেবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মূলে মানবাধিকার লঙ্ঘনে ক্ষমতাসীনদের উৎসাহ জুগিয়েছেন, ক্ষেত্রবিশেষে উসকানি দিয়েছেন। বিশেষ করে জুলাইয়ের ছাত্র আন্দোলনের সময়ে ২৬ জুলাই গণভবনে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর আহূত সভায় যোগ দিয়ে তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা আন্দোলন দমনে হত্যা, গুম ও দমন-পীড়নে উৎসাহিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এই ফ্যাসিস্ট সহায়ক ভূমিকার কারণে শেখ হাসিনার পতনের পর বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম গণরোষের শিকার হয়। তবে অন্য অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হলেও তারা গ্রেফতার হননি।

সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে-এমন একাধিক সংগঠন অবশ্য গ্রেফতার হওয়া চার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দেওয়ার সমালোচনা করেছে। উসকানিমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ দায়েরের পরিবর্তে হত্যা মামলায় আসামি করার কারণেই সরকার সমালোচনার মুখে পড়েছে বলে মনে করা হয়। দীর্ঘ ১৫ বছরের শাসনকাল এবং একদলীয় আধিপত্যের পটভূমিতে বিপুলসংখ্যক গণমাধ্যম মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে একধরনের তোষণবাদী ও সুবিধাভোগী সম্পর্ক গড়ে তোলে। ফলে আন্দোলনকারীদের ক্ষোভের মুখে পড়া সাংবাদিকদের তালিকাও দীর্ঘ। অন্তর্বর্তী সরকার এদের অনেকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে, ব্যাংকের লেনদেন স্থগিত করেছে। এছাড়াও সরকার প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ঢালাওভাবে বাতিল করে সমালোচিত হয়। তবে সরকারি ব্যাখ্যায় বলা হয়, বিগত সরকারের আমলে অনেক অসাংবাদিক দলীয় কর্মীকে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেওয়ায় তার অপব্যবহার ঘটেছে, তাই সরকার নতুন করে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড দেবে। এরপর সরকার অংশীজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেয়, যার তৈরি করা নীতিমালার আলোকে বিষয়টির সুরাহা হয়েছে।

বিদেশি মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশি জার্নালিস্টস ইন ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া (বিজিএইএম)-এর সর্বশেষ হিসাব মতে, ৫ আগস্টের পর গত ছয় মাসে অন্তত ৩১ জন সাংবাদিক তাদের দায়িত্ব পালনের সময়

হামলার শিকার হয়েছেন। এ সংখ্যা থেকেই পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়, সাংবাদিকরা কোন পরিবেশে কাজ করছেন।

হাসিনা ও তার সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার অভিযোগে অনেকের ওপর রাজনৈতিক চাপ আসে পদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অনেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। অনেককে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত করেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী হিসেবে পরিচিত সাংবাদিকদের নিয়োগ দেন। অতীতেও ক্ষমতায় রাজনৈতিক পালা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণমাধ্যমের বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় পদে পরিবর্তন ঘটেছে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দলটির সমর্থক সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দখলে শক্তি প্রয়োগেও লিপ্ত হয়েছেন। ২০১৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার সমর্থক সাংবাদিকরা জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত নেতৃত্বকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে তা দখলে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। ঢাকার বাইরেও একই ধরনের পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে। জেলা শহর বা উপজেলা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সমর্থক সাংবাদিকদের অনেকেই তাদের রাজনৈতিক ভূমিকার কারণে হত্যা মামলাসহ নানা ধরনের মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন।

এবারও অনেকে চাকরিচ্যুত হয়েছেন, আবার কেউ কেউ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথিত দলবদ্ধ আক্রমণ বা মবের ভয়ও কাজ করেছে বলে শোনা যায়। সম্প্রতি দেশের ৩০টি টেলিভিশনের ওপর পরিচালিত এক জরিপে এর কিছুটা চিত্র পাওয়া যায়। জরিপে দেখা যায়, এক বছরে টেলিভিশনে কর্মরত ১৫০ জনের বেশি সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে, যাদের অধিকাংশই চাকরি হারিয়েছেন ৫ আগস্টের পরে। সম্প্রচার সাংবাদিকদের সংগঠন ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি) এই জরিপ পরিচালনা করে। দেশের বিভিন্ন টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও অনলাইনে নিউজ পোর্টালে কর্মরত ও চাকরি হারানো ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ৬ মাসে অন্তত ২৯টি সংবাদমাধ্যমের নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৬টি টিভি চ্যানেল, ১১টি দৈনিক পত্রিকা ও দুটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল। তবে বেসরকারি কোনো এফএম রেডিও চ্যানেলে এ ধরনের পরিবর্তনের খবর পাওয়া যায়নি।

যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সেসব মিডিয়ায় নতুন নেতৃত্বে যারা এসেছেন বা নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন, তারা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত। মূলত পতিত সরকারের ঘনিষ্ঠ মালিকরা গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক বাস্তবতা যেসব দলের উত্থান ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার কৌশল হিসেবেই এসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এছাড়াও কয়েকটি গণমাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদেও পরিবর্তন ঘটে। পর্ষদ পুনর্গঠন করে নতুন চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো:

একাত্তর টিভি

এই চ্যানেলের অন্যতম কর্ণধার মোজাম্মেল বাবু তার নিজের ও একাত্তর টিভির ভূমিকার কারণে সমালোচিত ও বিতর্কিত ছিলেন। একজন সাংবাদিক হয়ে তিনি এই চ্যানেলকে শেখ হাসিনা ও তার সরকারের অন্যতম প্রচারমাধ্যমে পরিণত করেন। এসব কারণে ৫ আগস্ট একাত্তর টিভিতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা করে। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার পরপরই দ্রুত ও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে একাত্তর টিভিতে। এই টিভির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন শফিক আহমেদ। এই চ্যানেলের বিএনপি বিটের রিপোর্টার শফিক প্রথমে বার্তা প্রধান পদে নিয়োগ পান। এরপর তিনি সিওও-এর দায়িত্ব পেয়ে চ্যানেলটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

নাগরিক টিভি

সবচেয়ে বেশি ৪০ জন কর্মী ছাঁটাই হয়েছে রুবানা হক ও তার ছেলে নাভিদুল হকের মালিকানাধীন এই চ্যানেলে। তাদের মধ্যে ২৫ জন সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। বার্তাপ্রধান দীপ আজাদসহ তিনজন রিপোর্টার এবং দুজন নিউজ এডিটর রয়েছেন চাকরিচ্যুতদের তালিকায়। নাগরিক টিভির একাধিক সংবাদকর্মীর সাথে কথা বলে জানা যায়,

আওয়ামী লীগ আমলে দীপ আজাদের ভূমিকার কারণে ৫ আগস্টের পর তিনি নিজে যেমন নিরাপত্তাহীনতায় পড়েন, তেমনই মালিকপক্ষও মনে করেন, দীপ আজাদ তার দায়িত্বে থাকলে প্রতিষ্ঠান ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। ফলে তিনি তাদের চাহিদামতো পদত্যাগ করে এই চ্যানেল ছেড়ে চলে যান। তিনি আওয়ামী লীগ-সমর্থিত বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব ছিলেন।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ

বসুন্ধরা গ্রুপের পাঁচটি সংবাদমাধ্যমের চারটিতেই বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। ৫ আগস্টের পর এই গ্রুপের মালিকানাধীন ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া লিমিটেডের অন্যতম নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ পান বিএনপির মিডিয়া সেল ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের সদস্য কাদের গনি চৌধুরী। কোম্পানির উপব্যবস্থাপনা পরিচালকের (ডিএমডি) দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিএনপি মালিকানাধীন দৈনিক দিনকালের সাংবাদিক কাদের গনি। তিনি বিএনপি রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বসুন্ধরা গ্রুপ এবং এর মিডিয়াগুলো নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। এছাড়া ৫ আগস্ট সকালে রাজধানীর বাড্ডায় ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গুলি করে এক যুবককে হত্যার মামলায় আসামি করা হয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেড ও বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আকবর সোবহান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সায়েম সোবহানকে।

কালের কণ্ঠ ও বাংলাদেশ প্রতিদিন

ইমদাদুল হক মিলনকে সরিয়ে দৈনিক কালের কণ্ঠের সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছে হাসান হাফিজকে। আর বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজামকে সরিয়ে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে আবু তাহেরকে। হাসান হাফিজ এর আগে আমার দেশ, বৈশাখী টিভি ও দৈনিক বাংলায় কাজ করেছেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সর্বশেষ নির্বাচনে তিনি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্যানেল থেকে সিনিয়র সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেখ হাসিনার পতনের পর তিনি সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

নিউজ টুয়েন্টিফোর, বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম

নিউজ টুয়েন্টিফোর এবং বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম-এর শীর্ষপদেও পরিবর্তন ঘটে। বাংলানিউজ টুয়েন্টিফোর ডটকম-এর এডিটর জুয়েল মাজহারকে সরিয়ে দিয়ে সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় লুতফর রহমান হিমেলকে। হিমেল আগে বাংলাদেশ প্রতিদিনে কাজ করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় মাস্টার্স করেছেন। নিউজ টুয়েন্টিফোরে নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেছেন ফরহাদুল ইসলাম ফরিদ। তিনি একসময় এই চ্যানেলে নিউজ এডিটর ছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে নিউজ টুয়েন্টিফোর ছেড়ে দেশ টিভিতে যোগদান করেন। বসুন্ধরার এই টিভি চ্যানেলের নির্বাহী সম্পাদক রাহুল রাহাকে সরিয়ে দিয়ে সে পদে ফরিদকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বার্তাপ্রধান, প্রধান বার্তা-সম্পাদক, পরিকল্পনা সম্পাদকসহ আরও কয়েকটি পদে বিএনপি সমর্থক হিসাবে পরিচিত সাংবাদিকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এই চ্যানেলে।

এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ

মাহফুজুর রহমানের মালিকানাধীন দুটি টিভি চ্যানেলেই পরিবর্তন ঘটেছে। সাংবাদিক জ ই মামুন, যিনি এটিএন বাংলায় প্রধান নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, তাকে বরখাস্ত করা হয়। একই পরিণতি হয় এটিএন নিউজের বার্তাপ্রধান প্রভাস আমিনের। মামুনের জায়গায় নিয়োগ পেয়েছেন ওই চ্যানেলের মনিউর রহমান, অন্যদিকে প্রভাসের পদে বসানো হয়েছে তারই ডেপুটি শহীদুল আজমকে।

ইনডিপেনডেন্ট টিভি

বেক্সিমকো গ্রুপের এই চ্যানেলের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। সেখানে শীর্ষ দুটি পদে থেকে যারা শেখ হাসিনা সরকারের

পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছেন, তারা এখনো স্বপদে বহাল আছেন। ২০১১ সাল থেকে এই টিভির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং প্রধান সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এম শামসুর রহমান (মোমেন) এবং বার্তাপ্রধান হিসেবে আছেন মামুন আব্দুল্লাহ। শেখ হাসিনার পতনের পর এই টিভি পরিচালনায় মূল ভূমিকা নিয়েছেন মোস্তফা আকমল। বিএনপি ঘরানার এই সাংবাদিক অনেক বছর বঞ্চিত ছিলেন সালমান এফ রহমানের এই চ্যানেলে। পূর্বে তিনি চ্যানেল ওয়ানে কাজ করতেন, যে চ্যানেলের মালিক ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন। ৫ আগস্টের পর বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলের কার্যালয়ে আক্রমণ করে ভাঙচুর করা হয়। ইনডিপেনডেন্ট টিভি অফিসে আক্রমণ চালাতে গেলে মোস্তফা আকমল দায়িত্ব নিয়ে তাদের নিবৃত্ত করে পরিস্থিতি সামাল দেন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই টিভির প্রধান বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব পান। এই পদে থাকা আশিস সৈকতকে ৫ আগস্টের পর অফিসে আসতে মানা করা হয়। সম্প্রতি তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানা যায়।

ডিবিসি টিভি

ডিবিসি টিভিতেও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই চ্যানেলের শীর্ষ পদে থাকা চারজন চাকরি হারান। তারা হচ্ছেন সম্পাদক জায়েদুল আহসান পিন্টু, সম্পাদক প্রণব সাহা, বার্তাপ্রধান নইম তারিক ও অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর মাসুদ কার্জন। অভ্যন্তরীণ কিছু কর্মী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের চাপে তাদের কেউ চাকরি ছেড়েছেন, আবার কাউকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সমকালের সহযোগী সম্পাদক লোটন একরাম ডিবিসিতে সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেছেন। দীর্ঘদিন বিএনপি বিটে সাংবাদিকতা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। তবে এই চ্যানেলের অন্যতম কর্ণধার চেয়ারম্যান ইকবাল সোবহান চৌধুরী ও প্রধান সম্পাদক মনজুরুল ইসলাম স্বপদে বহাল রয়েছেন। অবশ্য ৫ আগস্টের পর তারা কেউই অফিসে আসেননি।

আরটিভি

বেঙ্গল গ্রুপ ও মোরশেদুল আলমের মালিকানাধীন আরটিভিতে নতুন বার্তাপ্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন ইলিয়াস হোসেন। এর আগে তিনি কালবেলার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন বাংলাভিশন, ইনডিপেনডেন্ট ও এসএ টিভিতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বর্তমানে বন্ধ থাকা চ্যানেল ওয়ানেও সাংবাদিকতা করেছেন। এর আগে এই চ্যানেলের সিইও আশিক রহমান বার্তাপ্রধানের পদটি নিজের করে রেখেছিলেন। ৫ আগস্টের পর তিনি এবং সিনিয়র সাংবাদিক শরিফ উদ্দিন লেমন চাকরি হারান।

বৈশাখী টিভি

এই টিভিতে দীর্ঘদিন বার্তাপ্রধান ছিলেন অশোক চৌধুরী। তাকে এই পদ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। এই পদে নিয়োগ পেয়েছেন জিয়াউল কবির সুমন, যিনি বর্তমানে বন্ধ দিগন্ত টিভিতে কর্মরত ছিলেন। প্রধান বার্তা-সম্পাদক সাইফুল ইসলামকেও তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয় তৌহিদুল ইসলাম শান্তকে, যিনি একই চ্যানেলে বিএনপি বিট কাভার করতেন। নিউজ সেকশন থেকে একজন বার্তা-সম্পাদকসহ আরও তিনজন চাকরি হারান।

এশিয়ান টিভি

এশিয়ান টিভিতে নতুন বার্তাপ্রধান হিসেবে যোগ দিয়েছেন সিরাজুল ইসলাম। তিনি রেডিও তেহরানে ব্রডকাস্ট সাংবাদিক হিসেবে কাজ করতেন। এর আগে এই চ্যানেলে বার্তাপ্রধানের দায়িত্বে ছিলেন বেলাল হোসেন। গত সেপ্টেম্বরে তিনি এশিয়ান টিভি ছেড়ে যান।

দেশ টিভি

এই টিভির বিশেষ প্রতিনিধি মহিউদ্দিন ৫ আগস্টের পর প্রথমে প্রধান প্রতিবেদক হন। পরে তাকে বার্তাপ্রধান পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। বার্তাপ্রধানের দায়িত্বে দীর্ঘদিন কেউ ছিলেন না। আওয়ামী লীগ বিটের রিপোর্টার জয় দেব ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শামীমা আখতারকে চাকরিচ্যুত করা হয়। দেশ টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরিফ হাসান বিমানবন্দর থানায় দায়ের করা হত্যাচেষ্টার এক মামলায় আটক হয়ে বর্তমানে কারাগারে আছেন। এ টিভিতে সাবেক পরিবেশমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা সাবের হোসেন চৌধুরীর যে নিয়ন্ত্রণমূলক অংশীদারত্ব ছিল, তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন বলে জানা যায়।

গাজী টিভি

গাজী গ্রুপের এই চ্যানেলটি এখন দেখভাল করছেন ইকবাল করিম নিসান। বর্তমানে তিনি প্রধান সম্পাদকের দায়িত্বে আছেন। এর আগে তিনি বার্তাপ্রধান ছিলেন। ৫ আগস্টের পর বার্তাপ্রধান করা হয় এই চ্যানেলের বিশেষ প্রতিনিধি গাওসুল আযম বিপুকে। তবে ৫ আগস্টের পর প্রথমে তাকে প্ল্যানিং এডিটর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি দীর্ঘদিন বিএনপি বিটের রিপোর্টার ছিলেন।

সময় টিভি

৫ আগস্ট-পরবর্তী অনেক ঘটনার কারণে সময় টিভি বেশ আলোচিত হয়। বিনিয়োগকারী ও শেয়ারের সিংহভাগ অংশীদারত্বের অধিকারী সিটি গ্রুপ এই টিভির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ জোবায়েরকে বরখাস্ত করে। সিটি গ্রুপের পরিচালক শম্পা রহমানকে নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বানানো হয়। তিনি সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানের মেয়ে এবং সময় টিভির একজন শেয়ারহোল্ডার। এছাড়াও বার্তাপ্রধানসহ তিনজন সময় টিভি ছেড়ে চলে যান। গত ডিসেম্বরে কর্তৃপক্ষ প্রধান প্রতিবেদকসহ আরও পাঁচজনকে বরখাস্ত করে। অভিযোগ রয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন।

মোহনা টিভি

মোহনা টিভিতে নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টর গঠন হয়েছে ৫ আগস্টের পরপরই। শুরু থেকে এই চ্যানেলের চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন আওয়ামী লীগের এমপি কামাল আহমেদ মজুমদার। তিনি ছাড়াও এই টিভির মোট শেয়ারহোল্ডার ১০ জন। এর মধ্যে রয়েছেন তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। তারা সবাই বোর্ডের মেম্বার হওয়ার ফলে কামাল মজুমদার নিয়ন্ত্রণ করেন এই চ্যানেল। অন্য পাঁচ শেয়ারহোল্ডারকে কোনো ধরনের সুযোগ দেননি তিনি। তবে হত্যা মামলায় তার আটকের পর বাকি পাঁচ শেয়ারহোল্ডার সভা করে নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টর গঠন করে চ্যানেলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। টিভির নতুন চেয়ারম্যান আতাহার আলী এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক হচ্ছেন সজীব গ্রুপের এমএ হাশেম। তবে এই চ্যানেলে অন্য কোনো শীর্ষ পদে পরিবর্তন ঘটেনি।

একুশে টিভি

৫ আগস্ট সরকার পতনের দিনই একুশে টিভির প্রকৃত মালিক আব্দুস সালাম চ্যানেলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এরপর তিনি শীর্ষ পদে থাকা কয়েকজন সাংবাদিককে সরিয়ে তার পছন্দের সাংবাদিকদের বসিয়েছেন। বার্তাপ্রধান রাশেদ চৌধুরীকে সরিয়ে সেই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ডয়চে ভেলের সাংবাদিক হারুন অর রশিদকে। একসময় তিনি এই টিভিতে কাজ করতেন। একুশে টিভির মালিকানা নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। ২০১৫ সালে তারেক রহমানের বক্তব্য ইটিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করার পরদিন পর্নোগ্রাফি আইনে করা একটি মামলায় তৎকালীন চেয়ারম্যান ও সিইও আব্দুস সালামকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এরপর আওয়ামী লীগ সরকারের শীর্ষ মহলের ইচ্ছায় এই টিভি দখলে নেয় এস আলম গ্রুপ। সেসময়েও বেশ কয়েকজনকে চাকরিচ্যুত করে নতুনদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

গ্লোবাল টিভি

সম্প্রতি এই টিভির প্রধান সম্পাদক করা হয়েছে সাংবাদিক নাজমুল আশরাফকে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাংলাভাষীদের অনলাইন সংবাদমাধ্যম টিবিএন টোয়েন্টিফোরে কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি দ্য ডেইলি স্টার, এনটিভি, চ্যানেল ওয়ান, যমুনা টিভি, এসএ টিভি, আরটিভি ও দীপ্ত টিভিতে কাজ করেছেন।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

পত্রিকাটির সম্পাদক পদে পরিবর্তন ঘটে জানুয়ারি মাসে। সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি সরে গেলে পত্রিকাটির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোরসালিন বাবলা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সময়ের আলো

এই পত্রিকার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শাহনেওয়াজ করিম ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। গত বছর সেপ্টেম্বরে সম্পাদক কমলেশ রায় পদ ছেড়ে দিলে এই পরিবর্তন ঘটে।

দৈনিক সমকাল

শেখ হাসিনার পতনের পর সমকালের সম্পাদক আলমগীর হোসেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সাংবাদিকতাচর্চায় তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণে এই ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন রিপোর্ট তিনি প্রকাশ করতেন না। ফলে সাংবাদিকদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৫ আগস্টের পরে। সমকালের দুই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকের মতে, একদল সংবাদকর্মী সেপ্টেম্বরে প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং তার পদত্যাগের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। এরপর কর্তৃপক্ষ আলমগীর হোসেনকে তার চুক্তি নবায়ন না করার কথা জানিয়ে অফিসে আসতে নিষেধ করে। পরবর্তীতে হামীম গ্রুপের পরিচালক আবুল কালাম আজাদকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দৈনিক যুগান্তর

যমুনা গ্রুপের দুটি মিডিয়ার মধ্যে শুধু যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক পরিবর্তন হয়েছে। সাইফুল আলম দীর্ঘদিন সম্পাদক ছিলেন। হত্যা মামলার আসামি হওয়ার পর তিনি ভীষণ চাপে ছিলেন এবং জানুয়ারিতে পদত্যাগ করেন। সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন কবি ও সাহিত্যিক আবদুল হাই শিকদার। তিনি আমার দেশ ও ইনকিলাব পত্রিকায় কাজ করেছেন। বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছাড়াও দলটির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার একজন উপদেষ্টা তিনি।

দেশ রূপান্তর

জানুয়ারিতে মোস্তফা মামুন পদত্যাগ করার পর এই দৈনিকের সম্পাদক হয়েছেন কামাল উদ্দিন সবুজ। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তবে ২০২২ সালে বিএনপি ও জামাতের সমর্থন নিয়ে ঐ পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। সবুজ এর আগে বিএসএস ও ইউএনবিতে সাংবাদিকতা করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

বিশেষ প্রতিনিধি শ্যামল সরকার চাকরি হারিয়েছেন। ৫ আগস্টের পর তিনি অফিসে আসা বন্ধ করে দেন। এছাড়াও ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষ নির্বাহী সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও যুগ্মসম্পাদক পদে নতুন করে পদায়ন করেছে। এই তিনটি পদ দীর্ঘদিন ফাঁকা ছিল। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক হয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি সাইদুল ইসলাম এবং যুগ্মসম্পাদক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশেষ প্রতিনিধি আনোয়ার আল দীন।

ভোরের আকাশ

সম্পাদক মনোরঞ্জন ঘোষালকে সরিয়ে ইলিয়াস খানকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিএনপি মনোনীত প্যানেল থেকে তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের একবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে গত নির্বাচনে একই প্যানেল থেকে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন করে ইলিয়াস পরাজিত হন।

আলোকিত বাংলাদেশ

৫ আগস্টের পর এই পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শামীম সিদ্দিকি, যিনি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকেরও দায়িত্ব পালন করতেন, তিনি অফিসে যেতে পারছেন না। এই পত্রিকার কয়েকজন জানান, তিনি আর পদে ফিরতে পারবেন না। তার জায়গায় নতুন একজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

সারাবাংলা ডটনেট

গাজী গ্রুপের মালিকানাধীন এই নিউজ পোর্টালটি বিক্রি করে দেওয়া হয় গত সেপ্টেম্বর মাসে। আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এবং সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী আগস্টে আটক হওয়ার পর নানা সমস্যায় পড়ে গাজী গ্রুপ। নিয়মিত বেতন দিতে না পারার কারণে পোর্টালটি কিনে নিয়েছেন আইটি প্রতিষ্ঠান আইসিসি কমিউনিকেশন-এর সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকি। মালিকানা হাতবদলের পর উপসম্পাদক সন্দ্বীপন বসু ও প্রধান বার্তাসম্পাদক রহমান মুস্তাফিজ চাকরি হারিয়েছেন। এই পোর্টালের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করা গোলাম সামদানি হয়েছেন নতুন প্রধান বার্তা-সম্পাদক।

এভাবে এক পক্ষকে সরিয়ে আরেক পক্ষ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের প্রক্রিয়ায় এই শিল্পে একটা সাময়িক অস্থিরতা দেখা দেয়। তবে সরকারের তরফে গণমাধ্যম পরিচালনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের অভিযোগ তেমন শোনা যায়নি। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার কারণে অনেকেই সেলফ-সেন্সরশিপ অনুশীলন করছে বলে অবশ্য অভিযোগ আছে। উদীয়মান রাজনৈতিক শক্তি ও অন্য দলগুলোর কার্যক্রমের ওপর যথাযথ নজরদারি ও জবাবদিহির প্রশ্নে একধরনের অনীহা লক্ষণীয় বলে সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে।

৩

গণমাধ্যমের মালিকানায় কারা?

বাংলাদেশের অধিকাংশ গণমাধ্যমই বৃহৎ পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণে, যারা মূলত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, খাদ্য ও নিত্যপণ্য আমদানি ও সরবরাহ, পোশাকশিল্প, ওষুধশিল্প, বিমা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাত এবং আবাসন ব্যবসার সাথে জড়িত। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় রাষ্ট্র ও সমাজে তাদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে এবং এদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতেও অংশ নেন। তবে গণমাধ্যমের মালিকদের তালিকায় বেশ কয়েকজন সাংবাদিকও রয়েছেন, যাঁরা মূলত রাজনৈতিক সমর্থনের কারণে লাইসেন্স পেয়েছেন এবং পরে অন্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে প্রতিষ্ঠান গড়েছেন।

৩.১ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহ

বসুন্ধরা গ্রুপের ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক তার ছেলে সায়েম সোবহান আনভীর। ২০০৯ সালে ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বসুন্ধরা গ্রুপ সাতটি গণমাধ্যমের মালিকানা লাভ করে, যার মধ্যে পাঁচটি সংবাদভিত্তিক। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বসুন্ধরা গ্রুপ দ্রুত মিডিয়া সম্প্রসারণে আগ্রহী হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই চারটি সংবাদমাধ্যমের মালিকানা অর্জন করে। ২০১০ সালের ১০ জানুয়ারি কালের কণ্ঠ, ১৫ মার্চ বাংলাদেশ প্রতিদিন ও ২৪ অক্টোবর ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি সান প্রকাশনা শুরু করে। একই বছরের ১ জুলাই তাদের অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলানিউজ২৪ডটকম যাত্রা শুরু করে। এত অল্প সময়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এতগুলো সংবাদমাধ্যমের অনুমোদন দেওয়ার নজির আর নেই। উপরন্তু একই মালিকানায় দুটি বাংলা দৈনিক প্রকাশের বাণিজ্যিক যৌক্তিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। একই মালিকানায় একই ভাষায় দুটি পত্রিকার মধ্যে প্রকৃত প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে কি না, তা-ও বিবেচনার বিষয়। প্রায়ই দেখা যায়, এ দুটি পত্রিকায় একই দিনে হুবহু একই প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পথে অন্তরায় তৈরি করে এবং একচেটিয়া প্রভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বলেই প্রতীয়মান হয়। টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বসুন্ধরা গ্রুপও একটি টিভি চ্যানেলের অনুমোদন পায় এবং ২০১৬ সালের ২৮ জুলাই তাদের নিউজ২৪ চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করে। এর আগে ২০১৫ সালের নভেম্বরে রেডিও ক্যাপিটাল নামে একটি এফএম রেডিওর লাইসেন্স পায় বসুন্ধরা গ্রুপ। এটি মূলত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের রেডিও চ্যানেল। সর্বশেষ ২০২১ সালে মিলেনিয়াম মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ধানাদ ইসলাম দীপ্তর কাছ থেকে তিতাস টিভি কিনে নিয়ে তারা টি স্পোর্টস নামে দেশের প্রথম ক্রীড়া টিভি চ্যানেল চালু করে।

এস আলম গ্রুপ

গত কয়েক বছরে ব্যাংক লুটের অভিযোগে পরিচিত এস আলম গ্রুপের সাইফুল আলম বেশ কয়েকটি মিডিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছেন। ২০২১ সালে তার 'নেক্সাস টিভি' সম্প্রচার শুরু করে, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিনি নিজেই এবং চেয়ারম্যান তার স্ত্রী। বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার বেনামি বিনিয়োগ রয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া ২০২৪ সালে অনুমোদন পাওয়া 'স্টার নিউজ' টেলিভিশনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের কয়েকটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক থেকে অনিয়মের মাধ্যমে নাবিল গ্রুপের নামে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ বের করে নেওয়া হয়েছে, সেই নাবিল গ্রুপ স্টার নিউজের উদ্যোক্তা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদন্তে নাবিল গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এস আলমের ছায়া কোম্পানি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি প্রথমে সাম্পান টিভি নামে লাইসেন্স পেয়েছিল। এর বাইরে এস আলম গ্রুপের একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে।

ট্রান্সকম গ্রুপ

প্রয়াত শিল্পপতি লতিফুর রহমান প্রতিষ্ঠিত ট্রান্সকম গ্রুপ দেশের দুটি প্রভাবশালী সংবাদমাধ্যম গড়ে তুলেছে। ১৯৯১

সালে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি স্টার' এবং ১৯৯৮ সালে 'প্রথম আলো'র যাত্রা শুরু হয়। 'দ্য ডেইলি স্টার' এর মালিক প্রতিষ্ঠান মিডিয়াওয়ার্ল্ডে সম্পাদক মাহফুজ আনামের এবং 'প্রথম আলো'র মালিক প্রতিষ্ঠান মিডিয়াস্টারে সম্পাদক মতিউর রহমানের সামান্য শেয়ার রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তারা পত্রিকা দুটি স্বাধীনভাবে পরিচালনা করে আসছেন। মিডিয়াস্টারে ট্রান্সকমের একক মালিকানা থাকলেও, মিডিয়াওয়ার্ল্ডে র‍্যাংগস এবং আরলিং লিমিটেডের (প্রয়াত আজিমুর রহমান) অংশীদারত্ব বিদ্যমান। ট্রান্সকম, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর কাছ থেকে এফএম রেডিও চ্যানেল আয়না ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি)-এর লাইসেন্স কিনে এবিসি রেডিও প্রতিষ্ঠা করে, যা ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি চালু হয়। ২০২৩ সালে রংধনু গ্রুপ এই পুরোনো রেডিও চ্যানেলটি কিনে নেয়, যা কয়েক বছর ধরে লোকসানে চলছিল।

মেঘনা গ্রুপ

২০০৯ সালে একাত্তর টিভির লাইসেন্স পাওয়ার পর সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন বাবু মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামালের কাছে বড় অঙ্কের শেয়ার বিক্রি করে দেন। মোস্তফা কামাল তার নিজ নামে এবং এক ছেলে ও দুই মেয়ের নামে শেয়ারগুলো কেনেন। মোজাম্মেল হোসেন বাবু একসঙ্গে ১০টি চ্যানেলের জন্য আবেদন করেছিলেন। মেঘনা গ্রুপের অধীনে রেডিও ৭১ নামে একটি এফএম রেডিও চ্যানেল রয়েছে, যা ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ যাত্রা শুরু করে।

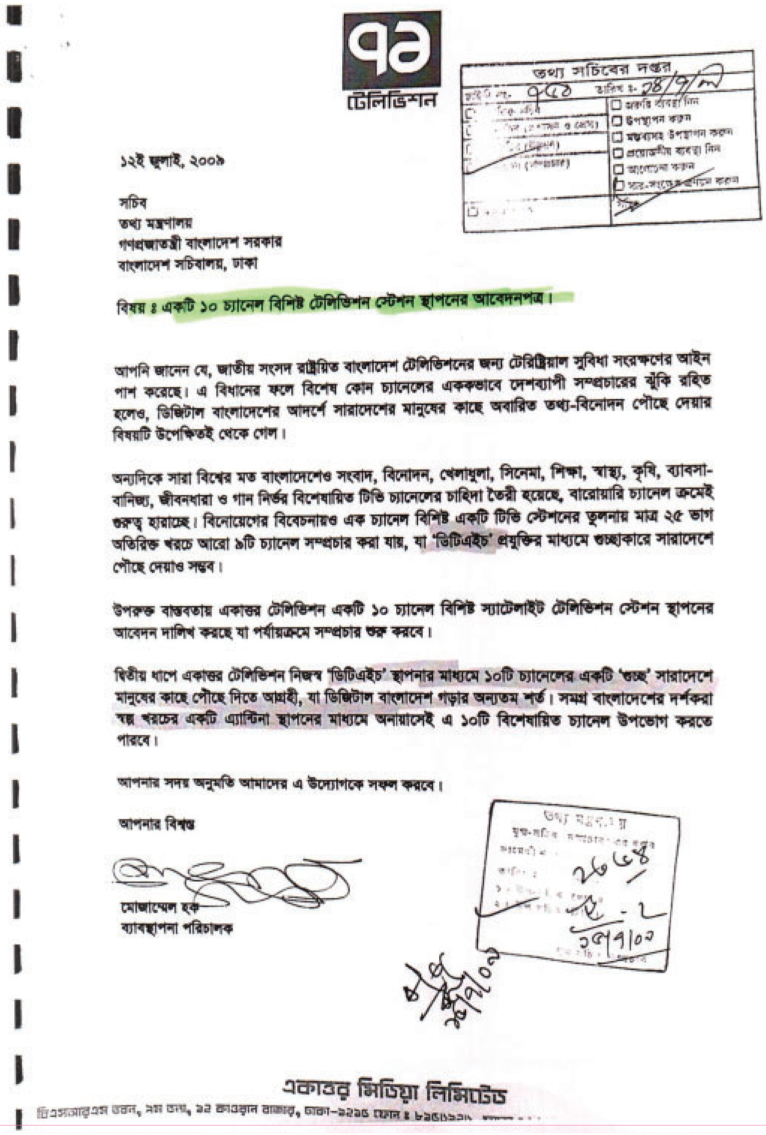
৭১ টেলিভিশন

তথ্য সচিবের দপ্তর

১২ই জুলাই, ২০০৯

সচিব
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয় ঃ একটি ১০ চ্যানেল বিশিষ্ট টেলিভিশন স্টেশন স্থাপনের আবেদনপত্র।

আপনি জানেন যে, জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রয়িত বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেরিষ্ট্রিয়াল সুবিধা সংরক্ষণের আইন পাশ করেছে। এ বিধানের ফলে বিশেষ কোন চ্যানেলের এককভাবে দেশব্যাপী সম্প্রচারের ঝুঁকি রহিত হলেও, ডিজিটাল বাংলাদেশের আদর্শে সারাদেশের মানুষের কাছে অবারিত তথ্য-বিনোদন পৌছে দেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে গেল।

অন্যদিকে সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও সংবাদ, বিনোদন, খেলাধুলা, সিনেমা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যাবসা-বানিজ্য, জীবনধারা ও গান নির্ভর বিশেষায়িত টিভি চ্যানেলের চাহিদা তৈরী হয়েছে, বারোয়ারি চ্যানেল ক্রমেই গুরুত্ব হারাচ্ছে। বিনোয়েগের বিবেচনায়ও এক চ্যানেল বিশিষ্ট একটি টিভি স্টেশনের তুলনায় মাত্র ২৫ ভাগ অতিরিক্ত খরচে আরো ৯টি চ্যানেল সম্প্রচার করা যায়, যা 'ডিটিএইচ' প্রযুক্তির মাধ্যমে গুচ্ছাকারে সারাদেশে পৌছে দেয়াও সম্ভব।

উপরুক্ত বাস্তবতায় একাত্তর টেলিভিশন একটি ১০ চ্যানেল বিশিষ্ট স্যাটেলাইট টেলিভিশন স্টেশন স্থাপনের আবেদন দাখিল করছে যা পর্যায়ক্রমে সম্প্রচার শুরু করবে।

দ্বিতীয় ধাপে একাত্তর টেলিভিশন নিজস্ব 'ডিটিএইচ' স্থাপনার মাধ্যমে ১০টি চ্যানেলের একটি 'গুচ্ছ' সারাদেশে মানুষের কাছে পৌছে দিতে আগ্রহী, যা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অন্যতম শর্ত। সমগ্র বাংলাদেশের দর্শকরা স্বল্প খরচের একটি এ্যান্টিনা স্থাপনের মাধ্যমে অনায়াসেই এ ১০টি বিশেষায়িত চ্যানেল উপভোগ করতে পারবে।

আপনার সদয় অনুমতি আমাদের এ উদ্যোগকে সফল করবে।

আপনার বিশ্বস্ত

মোজাম্মেল হক
ব্যাবস্থাপনা পরিচালক

তথ্য মন্ত্রণালয়

একাত্তর মিডিয়া লিমিটেড

মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড

মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজ টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক। ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এটিএন বাংলা যাত্রা শুরু করে। ২০১০ সালের ৭ জুন এটিএন নিউজ সম্প্রচার শুরু করে। মাহফুজুর রহমান অনুমোদন ছাড়াই এটিএন ওয়ার্ল্ড নামে আরেকটি চ্যানেল চালু করেছিলেন, যা পরবর্তী সময়ে এটিএন নিউজ হিসেবে সম্প্রচারের অনুমতি পায়। বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় আরেকটি চ্যানেল পরিচালনার জন্য তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তার কোম্পানিতে আওয়ামী লীগ সমর্থক সাংবাদিক মনজুরুল ইসলামেরও শেয়ার রয়েছে।

গাজী গ্রুপ

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য এবং সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী শিল্পপতি গোলাম দস্তগীর গাজী দুটি গণমাধ্যমের মালিক ছিলেন। গাজী টেলিভিশন ২০১২ সালের ১২ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। তিনি সারাবাংলা ডটকম নামে একটি অনলাইন নিউজ পোর্টালও প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সরকার পরিবর্তনের পর গত বছরের সেপ্টেম্বরে পোর্টালটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

রেনেসাঁ গ্রুপ

এই গ্রুপের কর্ণধার আওয়ামী লীগের নেতা ও সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম 'দুরন্ত টিভি' ও 'রেডিও ঢোল' চ্যানেলের মালিক। বরেন্দ্র মিডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে ২০১৩ সালে তিনি এই টিভি চ্যানেলের অনুমোদন পান এবং ২০১৭ সালে সম্প্রচার শুরু করেন। রেডিও ঢোল ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায়।

জেমকন গ্রুপ

জেমকন গ্রুপের কাজী আনিস আহমেদের একটি ইংরেজি দৈনিক ও একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল রয়েছে। এই গ্রুপের অন্যতম পরিচালক কাজী নাবিল আহমেদ বিতর্কিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। ইংরেজি দৈনিকটির নাম ঢাকা ট্রিবিউন এবং অনলাইন পোর্টালটির নাম বাংলা ট্রিবিউন।

কর্ণফুলী গ্রুপ

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী এই গ্রুপের কর্ণধার, যাঁর অধীনে দুটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি হচ্ছে ভোরের কাগজ। কিছুদিন পূর্বে এর প্রধান কার্যালয় বন্ধ করে দিয়ে সাংবাদিক-কর্মচারীদের বেশিরভাগকেই কর্মচ্যুত করা হয়েছে। তবে ডিক্লারেশন টিকিয়ে রাখতে বিশেষ ব্যবস্থায় এর অনিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। এই গ্রুপের অন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে দেশ টিভি। ২০০৬ সালে এই টিভির লাইসেন্স বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মুশফিকুর রহমানকে দেওয়া হয়েছিল। পরে এর বেশির ভাগ শেয়ার কিনে নেন সাবের হোসেন চৌধুরী। আওয়ামী লীগের আরেক সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূরের তত্ত্বাবধানে চ্যানেলটি ২০০৯ সালের ২৬ মার্চ যাত্রা শুরু করে। নূর সেসময় টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। তবে এই চ্যানেলের নিয়ন্ত্রণ এখন আর তাদের হাতে নেই। ৫ আগস্টের পর এই টিভির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন আরিফ হাসান। বিমানবন্দর থানায় দায়ের করা এক হত্যাচেষ্টা মামলায় আটক হয়ে তিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন। তার বিরুদ্ধে টাকা পাচারের অভিযোগও রয়েছে।

সিটি গ্রুপ

সিটি গ্রুপের মালিকানাধীন দুটি টেলিভিশন চ্যানেল হচ্ছে সময় টিভি এবং এখন টিভি (আগে যার নাম ছিল স্পাইস টিভি)। সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলামের ভাগ্নে আহমেদ জোবায়েরকে সময় মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে ২০০৯ সালে সময় টিভির অনাপত্তিপত্র দেওয়া হয়। লাইসেন্স পাওয়ার পর ২০১০ সালে তিনি এর

সিংহভাগ শেয়ার (৭৫ শতাংশ) সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমানের কাছে বিক্রি করে দেন। তবে এই টিভি পরিচালনার ভার তিনি নিজের হাতেই রেখে দেন। ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর তাকে বরখাস্ত করে সিটি গ্রুপ এই চ্যানেলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। অন্যদিকে, স্পাইস টিভির অনুমতিপত্র দেওয়া হয় ২০১৭ সালের ৯ আগস্ট। পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় এখন টিভি। স্পাইস টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হাসান ও এডিটর ইন চিফ তুষার আবদুল্লাহ। ২০২২ সালের জুনে এটি পূর্ণ সম্প্রচার শুরু করে। শিলা ইসলাম সময় টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং এখন টিভির চেয়ারম্যান। সিটি গ্রুপের মালিকানাধীন স্পাইস এফএম রেডিও ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এই রেডিও ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করে। রেডিও মাসালা লিমিটেডের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হচ্ছেন তাসনিম বর্ষা ইসলাম এবং চেয়ারম্যান শিলা ইসলাম। দুজনেই সিটি গ্রুপের কর্ণধার প্রয়াত ফজলুর রহমানের কন্যা। এই রেডিও সূত্রে জানা যায়, এই চ্যানেলটির লাইসেন্স প্রথমে পেয়েছিল ফু-ওয়াং ফুড লিমিটেড। পরবর্তীতে চ্যানেলের সিংহভাগ শেয়ার সিটি গ্রুপ কিনে নেয়।

কাজী ফার্মস লিমিটেড

দীপ্তবাংলা টিভি এই কোম্পানির মালিকানাধীন। কাজী মিডিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে চ্যানেলের আবেদন করেন কাজী জাহেদুল হাসান ২০১১ সালের ১১ নভেম্বর এবং অনাপত্তিপত্র পান ২২ ডিসেম্বর। কাজী মিডিয়া লিমিটেড হচ্ছে কাজী ফার্মস লিমিটেডের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ২০১৫ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার শুরু করে।

ইমপ্রেস গ্রুপ

ইমপ্রেস গ্রুপের মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলো হলো চ্যানেল আই ও রেডিও ভূমি। চ্যানেল আই দেশের অন্যতম পুরোনো টেলিভিশন চ্যানেল, যা ১৯৯৯ সালে যাত্রা শুরু করে। চ্যানেল আই-এর অনাপত্তিপত্র পান ফরিদুর রেজা সাগর। তবে এর মূল বিনিয়োগকারী ইমপ্রেস গ্রুপের ব্যবসা ওষুধ শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে বিস্তৃত। রেডিও ভূমি ২০১২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করে। যদিও ভূমি রেডিও গাঙচিল মিডিয়া লিমিটেডের অধীনে প্রতিষ্ঠিত, যার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুমার বিশ্বজিৎ। তবে তিনি মাত্র ১০০টি শেয়ারের মালিক, যেখানে অন্য ৭ জন প্রত্যেকেই ৭০০টি শেয়ারের মালিক। তাদের মধ্যে ফরিদুর রেজা সাগরও রয়েছেন।

এসএ টিভি

এসএ টিভির লাইসেন্স দেওয়া হয় এসএ পরিবহণ ও কুরিয়ার সার্ভিসের মালিক সালাউদ্দিন আহমেদকে। ২০১৩ সালের ১৯ জানুয়ারি আর্মি স্টেডিয়ামে চ্যানেলটির উদ্বোধন হলেও পরে এটি সংবাদকর্মীদের বেতন-ভাতা নিয়মিত পরিশোধ করতে পারেনি। ২০১৯ সালে ১৮ জনকে চাকরিচ্যুত করা হলে চাকরিচ্যুতরা মালিকের বাড়ির সামনে অনশন করেন। তবে তাদের কাউকে আর চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়নি। তাদের পাওনা পরিশোধ না করায় পরবর্তীতে তারা শ্রম আদালতে মামলা করেন, যা এখনো চলমান।

চ্যানেল নাইন

আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের ভাই মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ শাফায়েতুল ইসলাম এই চ্যানেলের জন্য আবেদন করলেও পরবর্তী সময়ে তার স্ত্রী সৈয়দা মাহবুবা আক্তারকে এই টিভির অনুমতিপত্র দেওয়া হয়। চ্যানেলটির ৮৫ শতাংশ মালিকানা ২২ কোটি টাকায় কিনে নেন এনটিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনায়েতুর রহমান।

এজি গ্রুপ

এজি অ্যাগ্রো গ্রুপের মালিকানাধীন গণমাধ্যম হলো ডিবিসি নিউজ। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান শহিদুল আহসান। সাংবাদিক

ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নামে এই টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয় ২০১৩ সালে। সেসময় তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমাধ্যমবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। ঢাকা বাংলা মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন লিমিটেডের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই টিভির তিনি চেয়ারম্যান। আরেক সাংবাদিক মনজুরুল ইসলাম এর প্রধান সম্পাদক। মনজুরুল ইসলাম এর আগে এটিএন নিউজের শেয়ার ধারণ করতেন। এছাড়াও ইকবাল সোবহান চৌধুরী ইংরেজি দৈনিক ডেইলি অবজারভারের সম্পাদক।

বেস্ট গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

কামাল আহমেদ মজুমদার এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং ঢাকা-১৫ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হিসেবে মোহনা টিভি প্রতিষ্ঠা করেন। চালু হওয়ার পর তিনি এই চ্যানেলের অফিসকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করতেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। ৫ আগস্টের পর কামাল মজুমদার হত্যা মামলায় গ্রেফতার হলে চ্যানেলটি অন্য ৫ জন শেয়ারহোল্ডারের নিয়ন্ত্রণে আসে।

গ্লোব ফার্মা

গ্লোবাল টিভি নোয়াখালী-৩ আসনের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য মামুনুর রশীদ কিরণের মালিকানাধীন। ২০১৬ সালে গ্লোব মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের পক্ষে আবেদন করে ২০১৭ সালে অনুমোদন পান। তবে চ্যানেলটি ২০২২ সালের ৩০ জুন সম্প্রচার শুরু করে।

মোহাম্মাদি গ্রুপ

মোহাম্মাদি গ্রুপের কর্ণধার প্রয়াত আনিসুল হক নাগরিক টিভি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে অনুমোদন পেতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তিনি ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠার আবেদন করেও অনুমোদন পাননি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ক্ষমতাসীন দলের মনোনয়নে ঢাকা উত্তরের মেয়র হওয়ার পর তিনি তার টিভির অনুমোদন লাভ করেন। মোহাম্মাদি গ্রুপের বিনিয়োগ ডেইলি অবজারভার পত্রিকায়ও রয়েছে।

ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিমিটেড

আব্দুল্লাহ আল মামুন (কৌসিক) চ্যানেল ২১ ও টাইমস রেডিও চ্যানেলের মালিক। ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তিনি এই দুটি চ্যানেলের অনুমোদন পান ২০১৩ সালে। তবে কোনোটিই এখনো সম্প্রচারে আসতে পারেনি।

বিশ্বাস বিল্ডার্স

নির্মাণ কোম্পানি বিশ্বাস বিল্ডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নজরুল ইসলাম দুলাল ‘কালবেলা’ পত্রিকার মালিক। ২০২২ সালে পত্রিকাটি বেশ ঘটা করে প্রকাশিত হলেও অল্পদিনের মধ্যেই সাংবাদিকতার মান নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। প্রথমে আবেদ খান পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন, যিনি পরে পদত্যাগ করলে সম্পাদক ও প্রকাশক হন সন্তোষ শর্মা। নজরুল ইসলাম বিশ্বাস ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি। তিনি ২০২৪ সালে ঝিনাইদহ-১ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন, তবে পাননি।

এইচআরসি গ্রুপ

এইচআরসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সাইদ হোসেন চৌধুরীর মালিকানাধীন বাংলা দৈনিক ‘যায়যায়দিন’। দৈনিক ‘যায়যায়দিন’ সাংবাদিক শফিক রেহমান প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, যা আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারান। জুলাই বিপ্লবের পর তিনি ‘যায়যায়দিন প্রতিদিন’ নামে এবং সাইদ চৌধুরী ‘যায়যায়দিন ১৯৮৪ থেকে’ নামে পত্রিকা বের করছেন। সাইদ হোসেন চৌধুরীর ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ ও সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় শেয়ার রয়েছে। করোনাকালে হলিডে বন্ধ হয়ে যায়। নিউ এজের মূল মালিক আরেক ব্যবসায়ী শহিদুল্লাহ খান।

যমুনা গ্রুপ

এ গ্রুপেরও দুটি গণমাধ্যম রয়েছে। দৈনিক যুগান্তর ও যমুনা টিভির প্রতিষ্ঠাতা যমুনা গ্রুপের প্রয়াত চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুল। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী সালমা ইসলাম মিডিয়া দুটির কর্ণধার। যুগান্তর প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে আর যমুনা টিভির সম্প্রচার শুরু ২০১৪ সালের ৫ এপ্রিল।

হা-মীম গ্রুপ

হা-মীম গ্রুপের শিল্পপতি এ কে আজাদ দুটি মিডিয়ার কর্ণধার। এর একটি দৈনিক সংবাদপত্র 'সমকাল', আরেকটি টেলিভিশন 'চ্যানেল ২৪'। টাইমস মিডিয়া লিমিটেড অধীনে সমকাল বাজারে আসে ২০০৫ সালের ৩১ মে। চ্যানেল ২৪ সম্প্রচার শুরু করে ২০১২ সালের ২৪ মে।

স্কয়ার গ্রুপ

স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঞ্জন চৌধুরী মাছরাঙা কমিউনিকেশনস লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে মাছরাঙা টিভির আবেদন করেন ২০০৭ সালের ২৮ নভেম্বর। ২০১০ সালে অনুমোদন পেয়ে ২০১১ সালের ৩০ জুলাই সম্প্রচার শুরু করে। এই গ্রুপের রেডিও চ্যানেল 'রেডিও দিনরাত' ২০১৬ সালে সম্প্রচারে যায়।

রংধনু গ্রুপ

রংধনু গ্রুপ তিনটি গণমাধ্যমের মালিক। এই গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম। এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো: গ্রিন টিভি, প্রতিদিনের বাংলাদেশ ও এবিসি রেডিও। গ্রিন মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রিন টিভির পেছনে ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। পরিবেশ ও বনমন্ত্রী থাকার সময় তিনি এই টিভির জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তার মেয়েকে এই টিভির চেয়ারম্যানও করা হয়। এছাড়াও সাবেক র‍্যাব ও পুলিশপ্রধান বেনজীর আহমেদও গ্রিন টিভির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০২৩ সালে 'প্রতিদিনের বাংলাদেশ' প্রকাশিত হয়। ২০২৩ সালে রংধনু গ্রুপ এবিসি রেডিও কিনে নেয়।

চৌধুরী নাফিজ সরাফাত

সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি রেস পোর্টফোলিও অ্যান্ড ইস্যু ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির মালিক চৌধুরী নাফিজ সরাফাত দৈনিক বাংলা ও নিউজবাংলা২৪ডটকমের প্রতিষ্ঠাতা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তার উত্থান ঘটে। তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতি ও জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। তিনি কয়েকটি ব্যাংকের সাথে যুক্ত ছিলেন। শেয়ারবাজারের কারসাজিসহ দুর্নীতির অনেক অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে বর্তমানে কারাগারে আটক নজরুল ইসলাম মজুমদার ও দৈনিক বাংলার শেয়ার ধারন করেন।

বিজয় টিভি

চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগের নেতা প্রয়াত এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এই টিভির লাইসেন্স নিয়েছিলেন ২০০৬ সালে। তবে বিধিসম্মত না হওয়ায় সেটি বাতিল করা হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার তাকে নতুন করে লাইসেন্স দিলেও তিনি এটি পরিচালনা করতে না পেরে তার স্ত্রী হাসিনা মহিউদ্দিন ও ছেলে চৌধুরী মহিবুল হাসানের কিছু শেয়ার এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমানের নামে লিখে দেন। পরে মহিউদ্দিন চৌধুরীর পরিবার তাদের কাছ থেকে পুরো শেয়ার ফেরত নিয়ে আসে।

চ্যানেল এস

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমত কাদির গামা ২০২১ সালে এই টিভির লাইসেন্স চেয়ে আবেদন করে ২০২২ সালে অনুমোদন পান। তিনি সানশাইন মিডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান। এই টিভি এখনো সম্প্রচারে আসেনি।

মাই টিভি

২০০৯ সালের ১১ অক্টোবরে আওয়ামী লীগ যে ১০টি নতুন টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দেয়, তার মধ্যে মাই টিভি একটি। ভিএম ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির উদ্দিন সাথি এই টিভির অনুমোদন পান। নাসির উদ্দিনকে লাইসেন্স পাইয়ে দিতে সাংবাদিক নেতা আলতাফ মাহমুদ ভূমিকা রাখেন।

এছাড়াও আরও যেসব টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে আছে প্রয়াত লেখক সৈয়দ শামসুল হকের পুত্র দ্বিতীয় সৈয়দ হকের আমার টিভি, রাশেদ খান মেননের খেলা টিভি, আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকারেজ হাউজের মালিক ও সাংবাদিক শফিকুর রহমানের সিটিজেন টিভি, তানজিয়া ইসলামের প্রাইম টিভি, আবু বাশার রকিবুল বাসেতের টিভি টুডে, মিলেনিয়াম মাল্টিমিডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুর মোহাম্মদের উৎসব টিভি, বিএসবি ফাউন্ডেশনের এম কে বাশারের ক্যাম্ব্রিয়ান টিভি এবং হাসান তৌফিক আব্বাসের আনন্দ টিভি।

বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন আরও কিছু পত্রিকা হলো: ইউএস-বাংলা গ্রুপের আজকের পত্রিকা ও ঢাকা পোস্ট অনলাইন পোর্টাল, ইউনিক গ্রুপের আমাদের সময়, রূপায়ণ গ্রুপের দেশ রূপান্তর, আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের সময়ের আলো ও গ্লোব জনকণ্ঠ শিল্প পরিবারের দৈনিক জনকণ্ঠ।

৩.২ এফএম রেডিওর মালিকানা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং রেজিস্টার জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজের দপ্তরের নথি ও অন্যান্য গবেষণার ভিত্তিতে এফএম রেডিওগুলোর মালিকানার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

রেডিও টুডে

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি এফএম রেডিও স্টেশন রেডিও টুডে কোম্পানি ২০০৫ সাল থেকে এফএম রেডিও চ্যানেল চালুর পরিকল্পনা শুরু করে। গার্মেন্টস ব্যবসায়ী মো. রফিকুল হক এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ২০০৬ সালের অক্টোবরে এর আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু হয়। শহরকেন্দ্রিক এই চ্যানেলটি মূলত সংগীতের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং শ্রোতাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সম্প্রচার শুরুর কিছুদিন পর থেকে রেডিও টুডে সংবাদ প্রচার শুরু করে। সংবাদ ও সংগীতের পাশাপাশি রেডিও টুডে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ামূলক অনুষ্ঠানের ওপরও নজর দেয়। শ্রোতাদের এসএমএসের মাধ্যমে বিভিন্ন লাইভ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়।

রেডিও ফুর্তি

এই চ্যানেলটির মালিক এমজেএইচ গ্রুপ, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবসায়ী আনিস আহমেদ। তিনি রেডিও ফুর্তি কোম্পানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ২০০৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর রেডিও ফুর্তি ২৪ ঘণ্টার আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু করে। ঢাকার স্টেশনের ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রান্সমিশন ক্ষমতার আওতায় ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোয় রেডিও ফুর্তি শোনা যায়। ২০০৭ সালের ২২ জুলাই চট্টগ্রামে রেডিও ফুর্তি সম্প্রচার শুরু করে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়াও আরও আটটি জেলায় এ রেডিও শোনা যায়। সে সময়ে এই এফএম মাধ্যমটি মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। লাখ লাখ শ্রোতা ২৪ ঘণ্টার এই চ্যানেলে গান ও বিভিন্ন শো শোনার জন্য উদ্গ্রীব থাকতেন।

ঢাকা এফএম

ব্যবসায়ী আকরাম খান এবং ডলি ইকবাল এফএম চ্যানেলের মালিক। আকরাম খান গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত এবং নিউটেক্স গ্রুপের কর্ণধার। অন্যদিকে ডলি ইকবাল আগে বিটিভির নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তাকে সাংস্কৃতিক কর্মী বলা যেতে পারে। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ঢাকা এফএম। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বগুড়া, বরিশাল ও ময়মনসিংহে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এই কোম্পানির চেয়ারপারসন বেগম ডলি ইকবাল।

পিপলস রেডিও

চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আব্দুল আওয়াল ও তার স্ত্রী সায়দা মাসুদা হক এই চ্যানেলের কর্ণধার। ২০১১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তাদের এই রেডিওর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। আওয়াল ব্রোকারেজ হাউস, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টসহ ৭-৮ ধরনের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। পিপলস রেডিও'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আউয়ালের ৩,৪৫,০০০টি শেয়ার রয়েছে, অন্যদিকে তার স্ত্রীর ৫,০০০টি শেয়ার রয়েছে। চ্যানেলের মূল স্টেশন ঢাকার দিলকুশায় অবস্থিত। ঢাকা ছাড়াও ঢাকার আশপাশের ১৫টি জেলায় এটি সম্প্রচার করে থাকে।

রেডিও স্বাধীন

২০১৩ সালের ২০ মার্চ ঢাকার সম্প্রচার শুরু করে বিজ্ঞাপন, বিপণন ও জনসংযোগ ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক গ্রুপের মালিকানাধীন এই এফএম চ্যানেলটি। সেদিন বনানীতে এশিয়াটিক সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রেডিও স্টেশনটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সারা যাকের। আলী যাকের, সারা যাকের ও আসাদুজ্জামান নূর-এই তিনজন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার এবং প্রত্যেকেরই ২,০০০টি করে শেয়ার রয়েছে।

সিটি এফএম

২০১৩ সালের ২৩ মার্চ এই এফএম স্টেশনের আনুষ্ঠানিক সম্প্রচার শুরু হয় মিডিয়া সিটি লিমিটেড কোম্পানির অধীনে প্রতিষ্ঠিত এই চ্যানেলটির। সিটি এফএম-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাইদুর আফতাব। কোম্পানির আরেকজন শেয়ারহোল্ডার আফতাব উদ্দিন আহমেদ। তারা দুজনেই ব্যবসার সাথে জড়িত। সাইদুর আফতাবের একটি কনসালটেন্সি ফার্ম রয়েছে।

কালারস এফএম

টিউন বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির এই এফএম চ্যানেলের মালিক রাকিব আহমেদ ফখরুল। তিনি এই কোম্পানির চেয়ারম্যান। ঢাকাভিত্তিক এই রেডিও স্টেশন ২০১৪ সালের ১০ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে। ২৪ ঘণ্টার এই চ্যানেলটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। রাকিব আহমেদ ফখরুল আয়ুর্বেদিক ব্যবসার সাথে জড়িত। তিনি আয়ুর্বেদিক ফার্মেসি (ঢাকা) লিমিটেডের চেয়ারম্যান।

রেডিও ৭১

ঢাকাভিত্তিক এই এফএম রেডিও ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ২০১৫ সালের ২৬ মার্চ এই এফএম রেডিওর যাত্রা শুরু করে। শুরুতে এই চ্যানেলের মূল কর্ণধার ছিলেন এমএ মতিন। তবে পরে তিনি তার শেয়ার বিক্রি করে দেন।

রেডিও ধ্বনি

এটি ২৪ ঘণ্টার একটি রেডিও চ্যানেল, যা সংবাদ, গান ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিল পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে এবং একই বছরের ২২ জুন থেকে বাণিজ্যিক সম্প্রচার শুরু করে। এই চ্যানেলের অন্যতম কর্ণধার ব্যবসায়ী রাশেদুল হোসেন চৌধুরী। তিনি রেডিও ধ্বনি লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আরেকজন শেয়ারহোল্ডার ফারজানা চৌধুরী।

রেডিও এজ

খেলাধুলাভিত্তিক দেশের প্রথম এফএম রেডিও এজ ২০১৭ সালের অক্টোবরে যাত্রা শুরু করে। ক্রিকেটার মাশরাফি বিন মুর্তজা ঢাকাভিত্তিক এই এফএম রেডিও স্টেশনের উদ্বোধন করেন। দেশের প্রধান দুই খেলা ক্রিকেট ও ফুটবলসহ দেশি ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সব ধরনের খেলার আপডেট, ধারাভাষ্য, ভেতরের খবর, খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত জীবন, স্পোর্টস ফ্যাশনসহ ক্রীড়াসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো রেডিও এজ সম্প্রচার করে থাকে। রেডিও এজ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবসায়ী শাফকাত সামিউর রহমান।

জাগো এফএম

ঢাকাভিত্তিক এই এফএম রেডিও স্টেশন ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এফএম রেডিওটি ২০১৫ সালের ২৭ অক্টোবর যাত্রা শুরু করে। জাগো এফএম একেসি প্রাইভেট লিমিটেডের, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহসান খান চৌধুরী। আহসান খান চৌধুরী শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)। তিনি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত মেজর জেনারেল (অব.) আমজাদ খান চৌধুরীর ছেলে। এই প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪ডটকম। এই গ্রুপের আরেকটি সংবাদভিত্তিক অনলাইন পোর্টাল জাগো নিউজ।

বাংলা রেডিও

বাংলা রেডিও ঢাকাভিত্তিক একটি এফএম রেডিও স্টেশন, যা ২৪ ঘণ্টা অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এফএম রেডিওটি ২০১৬ সালের ১১ এপ্রিল যাত্রা শুরু করে। এই চ্যানেলটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রেজা গ্রুপের অংশ। এই এফএম-এর প্রোপ্রাইটর সাহিদ রেজা।

সুফি এফএম

গোল্ডেন এফএম লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো. মামুনুর রহমান এই এফএম চ্যানেলের কর্ণধার। পরবর্তীতে মাসুদুর রহমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন। তারা দুজনেই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

রেডিও আম্বার

রেডিও আম্বার ঢাকা থেকে প্রচারিত ২৪ ঘণ্টার এফএম চ্যানেল, যার যাত্রা শুরু ২০১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর। এটি রেডিও মাস্তি লিমিটেড কোম্পানির আওতায় প্রতিষ্ঠিত, যার প্রোপ্রাইটর মো. আমিনুল হাকিম। তার আম্বার আইটি লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি রয়েছে, যা ইন্টারনেট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত।

রেডিও আমার

গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী ও তার পরিবারের মালিকানাধীন এই চ্যানেলটি বেশ পুরোনো। রেডিও আমার ২০০৭ সালের ১১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। সংবাদ, বাংলা গান, ইংরেজি গান, ব্যান্ড গান, আবহাওয়ার খবর, ট্রাফিক খবর এবং বাজারের খবর প্রচার করে এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শুরুতে তার ছেলে সামীর কাদের

চৌধুরী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। ২০২০ সালে সামীর কাদেরের স্থলাভিষিক্ত হন তার আরেক ছেলে সাকের কাদের চৌধুরী।

রেডিও নেক্সট

নিলয় নিটল গ্রুপ লিমিটেডের মালিকানাধীন এই চ্যানেল ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি মহাখালীতে নিটল-নিলয় গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে পরীক্ষামূলক সম্প্রচারের উদ্বোধন করলেও পরে এটি পুরোপুরি সম্প্রচারে যেতে পারেনি। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই চ্যানেলের অনুমোদন বাতিল করা হয়েছে।

এফএম রেডিওর হারানো জনপ্রিয়তা

বাংলাদেশে এফএম রেডিও ২০০৬ সালে চালু হওয়ার ২-৩ বছরের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছায়। কিন্তু ২০১২ সালে দেশে থ্রিজি চালু হওয়ার পর থেকে এফএম রেডিওর জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। মূলত এই সময়ের পর বেসরকারি টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়ার উত্থান ঘটে। বিভিন্ন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের আগমন, বিনোদনের জন্য ইউটিউব, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জনপ্রিয় হওয়ায় মানুষ এফএম রেডিও থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করে। ফলে শ্রোতা ও বিজ্ঞাপন উভয়ই কমতে থাকে, যার কারণে মালিক ও উদ্যোক্তারা এফএম রেডিও চালু রাখতে হিমশিম খেতে শুরু করেন। অনেক এফএম রেডিও ধুঁকতে ধুঁকতে চলতে থাকে। বর্তমানে চারটি চ্যানেল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে: রেডিও নেক্সট, রেডিও আমার, রেডিও ঢোল ও এশিয়ান রেডিও।

সম্প্রচারের অপেক্ষায় ৫টি এফএম রেডিও

টাইমস রেডিও: ব্রডকাস্ট ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ লিমিটেডের মালিকানাধীন, যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন (কৌসিক)।

দেশ রেডিও: নাট্যব্যক্তিত্ব নাদের চৌধুরী এই চ্যানেলের কর্ণধার।

রেডিও অ্যাক্টিভ: শমী কায়সার তার ধানসিঁড়ি কমিউনিকেশন লিমিটেডের ব্যানারে এই চ্যানেলের লাইসেন্স পেয়েছেন।

রেডিও প্রাইম: সিআইইউএস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান সৈয়দ জহিরুল ইসলাম এই রেডিও চ্যানেলের কর্ণধার।

রেডিও মিউজিক টুডে: মিডিয়া টুডে লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মাহফুরুর রহমানের মালিকানাধীন।

বিগত কয়েক বছরে দেশে এফএম রেডিওর জনপ্রিয়তা দ্রুত কমে যাওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে: বৈচিত্র্য না এনে অন্যের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান অনুকরণ, শুধু গান প্রচারের ওপর নির্ভরতা, বিজ্ঞাপনী সংস্থার মনমতো অনুষ্ঠান প্রচার এবং অনুষ্ঠানের গুণগত মানে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন না থাকা। এর পাশাপাশি বিজ্ঞাপন দ্রুত কমে যাওয়ায় অনুষ্ঠান নির্মাণে বিনিয়োগও প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

৪

গণমাধ্যমের ব্যাপ্তি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.১ সংবাদপত্র

বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনায় সংবাদপত্রের ভূমিকা গৌরবময়। স্বাধীনতার আগে ও পরে, ২০০৮ সাল পর্যন্ত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাই ছিল সাধারণ মানুষের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। সে সময় খবর সরবরাহে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বেতার ও টেলিভিশনের ভূমিকা সীমিত ছিল। এই দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ছিল সরকারি কার্যক্রমের সংবাদ ও বিভিন্ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ভাষ্য প্রচার করা। তবে শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে তারা সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে পেরেছিল।

পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসনের অবসান হলে গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তনের সুবাদে নতুন অসংখ্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এদের অনেকেরই উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধি। সংবাদপত্র মালিকদের মধ্যে কমিশন পরিচালিত এক জরিপে প্রকাশের উদ্দেশ্য জানতে চাওয়া হলে খুব কমসংখ্যক মালিক জনসেবা বা সমাজের কল্যাণকে লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করেন। সংবাদপত্র মালিকদের স্বীকৃত সংগঠন নিউজপেপার্স ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)-এর যেসব সদস্য কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়েছেন, তাদের কাছ থেকে বেনামে মতামত নেওয়া হয়। আর সমিতির সদস্য নন, কিন্তু সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর মিডিয়া লিস্টভুক্ত পত্রিকাগুলোর যেসব পত্রিকা বিক্রি হয়, সেগুলোর প্রকাশকদের কাছে ইমেইলে মতামত চাওয়া হলেও একজন ছাড়া আর কেউ জবাব দেননি। ফলে প্রকাশকদের সুস্পষ্ট কোনো উদ্দেশ্য (মিশন স্টেটমেন্ট) পাওয়া যায় না।

সামরিক সরকারের কঠিন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশে সংবাদপত্র কাজ করেছে। সরকারের মামলা, হামলা, হয়রানির শিকার হয়েও সংবাদপত্র গণতন্ত্র ও মানুষের কথা বলেছে। তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে সেই সুযোগ অনেক সংকুচিত হয়ে আসে। অন্যদিকে ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রসারের ফলে ছাপা পত্রিকার প্রচারসংখ্যা ও আয় কমেছে। এখন বেশির ভাগ পত্রিকাকে লোকসান গুনতে হচ্ছে। বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও বেশকিছু পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশে পত্রিকার সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েছে। দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। সবচেয়ে বড় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে প্রচারসংখ্যা নিয়ে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) ২০২৪ সালের নভেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, মোট নিবন্ধিত দৈনিক পত্রিকা ১৩৪০টি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ৫৪৬টি এবং ঢাকার বাইরের থেকে ৭৯৪টি। তবে এর মধ্যে কয়টি নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। একই বছরের মে মাসের হিসাব অনুযায়ী, নিবন্ধিত সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যাও দৈনিকের কাছাকাছি এবং দৈনিক পত্রিকার মতো ঢাকার বাইরে থেকে সাপ্তাহিকও বেশি প্রকাশিত হয়। ঢাকায় সাপ্তাহিক রয়েছে ৩৫৫টি এবং ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত হয় ৮৬৩টি। সর্বমোট ১২১৮টি সাপ্তাহিক পত্রিকা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কিছু পাক্ষিক, মাসিক, দ্বিমাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের তালিকায় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে দেশে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ৩২৭০টি। এর মধ্যে ঢাকায় রয়েছে ১৩৭১টি এবং ঢাকার বাইরে ১৮৯৮টি।

এই বিপুলসংখ্যক পত্র-পত্রিকার অনেকগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে অথবা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অনেক দৈনিক পত্রিকা নিবন্ধিত হলেও তারা শুধু সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ লাভজনক পরিমাণে বিজ্ঞাপন পাওয়া গেলে সেদিন পত্রিকা সীমিত সংখ্যায় ছাপা হয়, অন্যান্য দিন হয় না। যখন যে প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দেয়, সে প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি কিছু দপ্তরে এসব পত্রিকার কপি পৌঁছে দেওয়া হয়। এমন কিছু পত্রিকারও সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলো শুধু পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে হুবহু একই কাঠামোতে ছাপা হয়। এসব পত্রিকার বেশির

ভাগের নাম পাঠক কখনো শোনেননি।

এছাড়াও কিছু পত্রিকা হাতে গোনা কয়েক কপি ছাপা হয়, যা কিছু নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তর এবং যাদের নিয়ে বিশেষ সংবাদ করা হয়, তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই পত্রিকাগুলো 'দেওয়াল পেস্টিং' পত্রিকা ও 'আন্ডারগ্রাউন্ড পত্রিকা' নামে পরিচিত। আবার ডিএফপির মিডিয়া তালিকাভুক্তি নিয়েও অনেক বিতর্ক ও অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টের তথ্য অনুযায়ী, ডিএফপি মিডিয়ালিস্টভুক্ত দৈনিকের সংখ্যা ৫৮৪টি, যার মধ্যে ঢাকাকেন্দ্রিক ২৮৪টি। এ তালিকায় সাপ্তাহিক রয়েছে ৮৭টি, পাক্ষিক ১২টি, মাসিক ২৪টি ও ত্রৈমাসিক ১টি। মোট মিডিয়ালিস্টভুক্ত পত্রপত্রিকার সংখ্যা ৭০৮টি। ঢাকায় সব ধরনের পত্রিকা যে দুটি হকার সমিতির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়, তাদের কাগজ বা রসিদেও ৫৬টির বেশি নাম পাওয়া যায় না। বাস্তবে বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে ৫০টির মতো দৈনিক পত্রিকা পাঠক পয়সা দিয়ে কেনেন। অন্য কোন পত্রিকা হকারদের বিক্রির তালিকায় নেই।

ক) প্রচারসংখ্যা নিয়ে বিতর্কের নেপথ্যে

সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা নিয়ে বিতর্কের মূলে রয়েছে এটিকে বাড়িয়ে দেখানোর প্রবণতা, যা প্রায় একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছে। ব্যতিক্রম কেবল সেসব পত্রিকা, যারা স্বেচ্ছায় প্রকৃত প্রচারসংখ্যা ঘোষণা করে। অনুসন্ধানে প্রচারসংখ্যা বাড়ানোর মূলত দুটি কারণ জানা যায়: বিজ্ঞাপনের জন্য বাড়তি দর আদায় এবং কম শুল্কে নিউজপ্রিন্ট আমদানি করে খোলাবাজারে বিক্রি করে বাড়তি আয় করা। বর্তমানে, সুনামের কারণে উচ্চদরে বিজ্ঞাপন পাওয়ার ধারণাটি প্রায় বিস্মৃত। শীর্ষস্থানীয় দুই-তিনটি পত্রিকায় বেসরকারি বিজ্ঞাপনদাতারা যে মূল্য দেন, অন্যান্য পত্রিকা তার চেয়ে অনেক কম দামে বিজ্ঞাপন ছাপাতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এই বাজারনীতি সরকারি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেখানে প্রচারসংখ্যা এবং ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নই বিজ্ঞাপনের দর নির্ধারণ করে। ফলে, সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল পত্রিকাগুলো যেকোনো উপায়ে প্রচারসংখ্যা অতিরঞ্জিত করতে তৎপর হয়। পাশাপাশি, বেশি প্রচারসংখ্যা দেখালে আমদানির ক্ষেত্রে কিছু শুল্কছাড় মেলে, যা বাড়তি নিউজপ্রিন্ট খোলাবাজারে বিক্রি করে আয়ের সুযোগ তৈরি করে।

ডিএফপির মিডিয়া লিস্টে থাকা পত্রিকাগুলোর ঘোষিত প্রচারসংখ্যার যোগফল দৈনিক প্রায় পৌনে দুই কোটি। ডিএফপির হিসাব অনুযায়ী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ৫৭টি দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন ১ লাখ বা তার বেশি কপি ছাপা হয়। কিন্তু ঢাকার দুটি হকার সমিতি এবং সারা দেশে বিতরণকৃত পত্রিকা বিক্রির হিসাবে মোট সংখ্যা দৈনিক ১০ লাখের বেশি নয়। তাহলে বাকি ১ কোটি ৭০ লাখ পত্রিকা কোথায় যায়? পুরোনো কাগজ কেনাবেচার ব্যবসায়ও এত বিপুল পরিমাণে অবিক্রীত কাগজ বিক্রির বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ মেলে না। ডিএফপির মিডিয়া লিস্টভুক্ত পত্রিকাগুলোর বছরে দুইবার নিরীক্ষা হিসাব জমা দেওয়ার কথা। নিরীক্ষায় ছাপাখানার রেকর্ড, ছাপানোর বিল, বিক্রির বিল, নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারের হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা। ডিএফপির অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন (এবিসি)-এর পরিদর্শকদেরও সময়ে সময়ে ছাপাখানা পরিদর্শন ও নথিপত্র যাচাই করার বিধান রয়েছে, যার ভিত্তিতে প্রচারসংখ্যার যথার্থতা নিশ্চিত হওয়ার কথা।

রেজিঃ নং-৫৭/৯২

সংশোধিত রেজিঃ নং-৫৮/০৫

সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

ফ্ল্যাট-এ/৪, ২০৪, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, (২য় তলা), আজিজ কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্স, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০

দৈনিক পত্রিকার চাহিদা ফেরৎ ও বিক্রিবহি

মাসের নাম ঃ অক্টোবর/২০২৪ তারিখ ঃ ৭৭/১০/২৪

ক্রমিক	পত্রিকার নাম	মূল্য	চাহিদা	ফেরত	বিক্রয় কপি	বিল নং	মন্তব্য
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	দৈনিক ইত্তেফাক		২৬৮০	১০৭২+১৫০	১৩৭৮	4082	
০২	দৈনিক প্রথম আলো		২০৬৩০	১১৫৯ ১১৮৬	১৯৪৪৫	3432	
০৩	দৈনিক যুগান্তর		৩৬১০	১৫৭০+১৭৫	১৮৬২	3482	
০৪	দৈনিক ইনকিলাব		৬৪৪৫	১১৭ +১২৫	৪৯৩	4032	
০৫	দৈনিক সংবাদ		৬৯০	৬০২ +৫	৫৩	2032	
০৬	দৈনিক শেয়ার বীজ		১২৫	১০২ +০	২৩	2082	
০৭	ফিনানসিয়াল এক্সপ্রেস		৮০১	২৮০ +৩২	৫৩৯	4282	
০৮	দি ডেইলি স্টার		৪৬৬৬	১২৪ +৩০	৪২৯১	4232	
০৯	নিউ নেশান		১৪০	১৩২ +০	৮	5542	
১০	দৈনিক সংগ্রাম		২৬৪	১৯ +৭	২৩৮	3332	
১১	নিউজ টু-ডে		৩৫	২৬ +০	০৯	5543	
১২	দৈনিক আমাদের সময়		৩২৯৫	১৩৫৭ +৫০	১৮৮৮	3382	
১৩	দৈনিক নয়া দিগন্ত		২২৯০	৮৭২ +২২০	১১৯৮	4432	
১৪	দৈনিক অবজারভার		১৩৫	৩৯ +৫	৯১	4482	
১৫	দৈনিক সমকাল		১৬৭০	৬১০ +০	১০৬০	4832	
১৬	দৈনিক কালের কণ্ঠ		১৬৭৫	৪০২ +২৫০	৯৯৩	4882	
১৭	দৈনিক যায়যায়দিন		১১৭	১৪৫ +৫	৪৭	1932	
১৮	দৈনিক জনকণ্ঠ		৫৯০	২৪০ +০	৩৫০	1982	
১৯	দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউন		৪৩৮	২৪৭ +৫	১৮৬	1682	
২০	দৈনিক মানবজমিন		১৫৯৫	৯৮৯ +১৫	৬১১	1632	
২১	দৈনিক ভোরের কাগজ		৩৮৫	২৮৯ +১৯	২৮	1732	
২২	দৈনিক ভোরের পাতা		৩৫০	২৯৪ +২০	৩৬	1782	
২৩	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন		১৭৫০৫	৩৫০, ৫৫৯ ৮৫০	১৬০৪৫	4332	
২৪	দৈনিক আজকালের খবর		৩৫০	০+০	৩৫০	2467	
২৫	দৈনিক আমাদের অর্থনীতি						
২৬	দৈনিক নিউ এইজ		৩৩১	১৬৬ +২০	১৪৫	4182	
২৭	দৈনিক ডেইল সান		২৬০	২৭ +১৫	২১৮	4682	
২৮	দৈনিক মানবকণ্ঠ		৪২১	২১৪ +৬০	১৪৭	4982	
২৯	দৈনিক বনিক বার্তা		১৪৬০	৬৭৫ +২০	১১৯৬	4932	
৩০	আলোকিত বাংলাদেশ		১১১	৬৬ +২০	২৫	4632	
৩১	দৈনিক প্রতিদিন সংবাদ		২০০	৭১ +২০	১০৯	2477	
৩২	দৈনিক আমার সংবাদ		৩				
৩৩	দি এশিয়ান এইজ		১০০	৮৪ +০	১৬	5544	
৩৪	দি আওয়ার টাইম						
৩৫	দৈনিক খোলা কাগজ		৫৩০	০ +৫০	৪৮০	2476	
৩৬	দৈনিক বাংলাদেশ পোষ্ট						
৩৭	দৈনিক নতুন সময়						
৩৮	দৈনিক দেশ রূপান্তর		২০৬৫	১০৩৯ +৫০	৯৫৬	4532	
৩৯	দৈনিক সময়ের আলো		২৯৩০	৬২৮ +২৪	২২৭৭	4533	
৪০	দৈনিক বিজনিস স্ট্যান্ডার্ড		১০৭০	১৬৭ +৫	৯২৮	4132	
৪১	দৈনিক স্বাধীন মত		২৯০	০ +২০	২৭০	2165	
৪২	দৈনিক ভোরের ডাকা		৬৬০	৬ +২০	৬৪০	1835	
৪৩	দৈনিক আজকের পত্রিকা		১৮৫৫	১০৭৬ +৫০	৭২৯	1882	
৪৪	দৈনিক বিজনিস পোষ্ট		৮৫	৭২ +০	১৩	5545	
৪৫	দৈনিক বাংলা		৪৮৫	২৫ +৩০	৪২৮	5636	
৪৬	দৈনিক কালবেলা		২৭৮৫	৭৪২+৯৮০+৫০	১০১৩	4782	
৪৭	দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ		১৪৩০	৯৪২ +৫০	৪২৮	4732	
৪৮	দৈনিক খবরের কাগজ		২৯৭০	১৭৪০ +৫০	১১৮০	4382	
৪৯	নিউজ টাইম						
৫০	দি ইন্ডাস্ট্রি						

ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেড

১০, রাজ.উ.ক এভিনিউ, মতিঝিল ঢাকা-১০০০

বিল নং- 10400

নাম : ১৭/১১/২০২৪ কেন্দ্র : ০৯/১১/২০২৪ তারিখ :

নং	পত্রিকার নাম	চাহিদা	ফেরত	বিক্রী	দর	টাকা	পঃ
১।	দৈনিক ইত্তেফাক	৮৬০৫		৭৮৮৫			
২।	দৈনিক ইনকিলাব	২৪৭২		২৪৪২			
৩।	দৈনিক প্রথম আলো	৬৩৮৮০		৬৩৮২০			
৪।	দি ইনডিপেন্ডেন্ট						
৫।	দৈনিক সংগ্রাম	১১৮৫		১১২০			
৬।	দৈনিক নয়া দিগন্ত	৭২৪০		৬৬৮৪৫	৭.৮০		
৭।	দৈনিক বণিক বার্তা	৫৭১০		৫২০০			
৮।	দি নিউ নেশন	৩৮৫		৩৭০			
৯।	দৈনিক জনকণ্ঠ	২৯৫০		৩০০০			
১০।	দৈনিক সমকাল	৭৯৯০		৭৮২০			
১১।	দি বাংলাদেশ টুডে •	২৫০		২৫০			
১২।	দৈনিক যুগান্তর	১৫২৫০		১৫১৫০			
১৩।							
১৪।	শেয়ার বিজ	৫৩০		৫১০	৬.৫০		
১৫।	মানবজমিন	৫০৯০		৫০২০			
১৬।							
১৭।	দি অবজারভার	৬৫২		৬৩০	৫.৫০		
১৮।	দৈনিক খবরের কাগজ	৬০৭৫		৬০২০			
১৯।	দৈনিক যায়যায় দিন	৬৫৭		৬৭০			
২০।							
২১।	কালের কণ্ঠ	৫৯৫০		৫৮৭০	৭.২০		
২২।	দি নিউ এইজ	১০১৫		১০২০			
২৩।							
২৪।							
২৫।	দি ডেইলী স্টার	১৪৫৯৫		১৪৬০০	৯.৭৫		
২৬।	দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস	৩১২৯		৩১১০			
২৭।							
২৮।	দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড	৫৫৩৪		৫৫২০	৭.৫০		
২৯।	দি বিজনেস পোস্ট				৭.০০		
৩০।							
৩১।	দৈনিক সংবাদ	১০৮০		১০৫০	৫.২০		
৩২।	উত্তর দক্ষিণ •	৩৭০		৩৭০	৬.০০		
৩৩।	আমার দেশ						
৩৪।	রূপালী বাংলাদেশ	২৫৯৫		২৫৯৫	৩.৮০		
৩৫।	আজকের পত্রিকা	৩৪৬৫		৩৪৭০	৫.০০		
৩৬।							
৩৭।	প্রতিদিনের বাংলাদেশ	৩৮৪০		৩৮৫০	৪.২৫		
৩৮।	দৈনিক আমাদের সময়	৯২১০		৯২০০			
৩৯।	সময়ের আলো	৪৩১০		৪৩১০			
৪০।	দেশ রূপান্তর	৬৪৩৫		৬৪২০			
৪১।							
৪২।	আমার সংবাদ	৪৮০		৪৮০	৩.২৫		
৪৩।	ঢাকা ট্রিবিউন	৯৭৯		৯৭০	৯.২৫		
৪৪।	বাংলাদেশ পোস্ট				৫.০০		
৪৫।	দৈনিক বাংলা	৯৫০		৯৫০	৩.৯০		
৪৬।							
৪৭।	বাংলাদেশ প্রতিদিন	৫৫১৯৫		৫৫২৫০	৫.৭৫		
৪৮।	দৈনিক মানব কণ্ঠ	১৬৪৫		১৬৪৫	৪.৫০		
৪৯।	ডেইলি সান	৫১৪		৫১৪			
৫০।							
৫১।	আলোকিত বাংলাদেশ	২৭৯		২৮০	৪.৭৫		
৫২।	ভোরের কাগজ	৮৭০		৮৭০			
৫৩।							
৫৪।	কালবেলা	৮৮২০		৮৮২০	৪.০০		
৫৫।	দিনকাল	১৪৮০		১৪৮০			
৫৬।	খোলা কাগজ	১৩৫০		১৩৫০			
৫৭।							
৫৮।	স্বদেশ প্রতিদিন						
৫৯।	ভোরের ডাক	৯৩০		৯৩০	২.৫০		
৬০।	দি বিজনেস আই						
৬১।	দৈনিক আজকালের খবর	৪৫০		৪৫			
৬২।							
৬৩।	ভোরের দর্পন	২৪৩		২৪৩	৩.০০		
৬৪।	দৈনিক করতোয়া	১৭৫		১৭৫			
৬৫।	আমাদের নতুন সময়						
৬৬।	ভোরের আকাশ						
৬৭।	প্রতিদিনের সংবাদ	৫৮০		৫৮০			
৬৮।	আমাদের অর্থনীতি						
৬৯।	আওয়ার টাইম						
৭০।	জবাবদিহি						
৭১।	দৈনিক জনতা •	৩৫০		৩৫০			
৭২।							
৭৩।	দি ইন্ডাস্ট্রি	৩৪০		৩৪০			
৭৪।	বুলেটিন				৩.৫০		
৭৫।	আল ইহসান	১৮৫		১৮৫			
৭৬।							
৭৭।	এশিয়ান এইজ	২৭০		২৭০	৫.৫০		
৭৮।	দৈনিক খবর •	৯৭০		৯৭০	১.৭৫		
৭৯।							
৮০।							
৮১।							

প্রচারসংখ্যা, ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন এবং পত্রিকা প্রকাশের শর্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, তা সরকারি কর্মকর্তাদের যাচাইয়ের পাশাপাশি শিল্পের বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি তদারকি ব্যবস্থাও রয়েছে। এই কমিটির প্রত্যয়নের ওপর সরকারি বিজ্ঞাপনের দর নির্ধারিত হয়। মিডিয়া তালিকাভুক্ত প্রায় ৬০০ পত্রিকার নথিপত্র যাচাই সময়সাপেক্ষ হওয়ায় কমিশন নমুনা হিসেবে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পাঁচটি পত্রিকার নথি যাচাই করেছে: দ্য ট্রাইবুনাল, দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, প্রথম আলো, মানবজমিন এবং আজকের পত্রিকা। ডিএফপির তালিকায় প্রচারসংখ্যায় শীর্ষে আছে দ্য ট্রাইব্যুনাল এবং শীর্ষ পাঁচটির মধ্যে একটি দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস। বাংলায় শীর্ষ দৈনিকের প্রচারসংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও স্বেচ্ছায় প্রচারসংখ্যা কম ঘোষণা দেওয়া প্রথম আলো, অপেক্ষাকৃত নতুন প্রকাশনা আজকের পত্রিকা এবং একমাত্র ট্যাবলয়েড মানবজমিনকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

ইংরেজি পত্রিকার প্রচারসংখ্যার চিত্র অবিশ্বাস্য রকম গোলমেলে। ডিএফপির তালিকা অনুযায়ী, শীর্ষে থাকা দ্য ডেইলি ট্রাইব্যুনাল ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর ঘোষণাপত্র (ডিক্লারেশন) পেয়ে ২০১৬ সালের ১ আগস্ট মিডিয়া তালিকাভুক্তির আবেদন করে। মাসখানেকের মধ্যে ডিএফপি অফিস ও প্রেস পরিদর্শন করে এবং ৭ সেপ্টেম্বর ৬,০০৫ কপি প্রচারসংখ্যা দেখিয়ে তালিকাভুক্ত করে। মাত্র আট মাস পর ২০১৭ সালের ২৫ মে প্রচারসংখ্যা তারা বাড়ানোর আবেদন করে। কোনো পরিদর্শন ছাড়াই ৬ জুন এর প্রচারসংখ্যা ২১,৩০০ কপি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। সরকারি বিজ্ঞাপনের রেট ১০৪ টাকা থেকে বেড়ে ১২২.২০ টাকা হয়। তিন মাস পর সেপ্টেম্বরে অষ্টম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়িত হওয়ার দাবি জানিয়ে বিজ্ঞাপনের হার পুনর্নির্ধারণের আবেদন করা হয়। ৩০ নভেম্বর পত্রিকাটি পরিদর্শন করে ১৪ ডিসেম্বর রেট প্রায় চারগুণ বাড়িয়ে ৫০৩ টাকা করা হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিলে আবার প্রচারসংখ্যা বাড়ানোর আবেদন করা হলে ৫ মে পরিদর্শন করে ৯ মে ৩৮,৫০০ কপি নির্ধারণ করা হয়। রেটও বেড়ে ৫৩৩ টাকা হয়। ডিসেম্বরে আবারও আবেদন করা হলে ৩৮,৯৯০ কপি করা হয়। ২০১৯ সালের মার্চে আবেদনের পর পরিদর্শন করে ৪০,১০০ কপি করা হয় এবং রেট ৫ টাকা বাড়ানো হয়। এবার মাত্র তিনদিনেই আবেদন, পরিদর্শন ও সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হয়। ওই বছরেই ২১ আগস্ট আবেদনের পর পরিদর্শন করে ৪০,৫০০ কপি নির্ধারণ করা হয় এবং বিজ্ঞাপনের রেট ৫৪৩ টাকা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd

নং-১৫.৫৭.০০০০.০০৭.০১.০২০.১৬- ৬৭৭২

তারিখ: ০৬ পৌষ ১৪৩১ / ২০ জানুয়ারি ২০২৫

বিষয়: 'The Daily Tribunal' সংবাদপত্রের প্রতিবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'The Daily Tribunal' সংবাদপত্রের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে নিম্ন ছকে বর্ণিত তথ্যাদি পাওয়া গেছে।

ক্র: নং	বিবরণ	মন্তব্য
১	২৪.১১.২০১৪ তারিখে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত, ঢাকা কর্তৃক ঘোষণাপত্র প্রদান করা হয়েছে।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৯৩ সদয় দেখা যেতে পারে।
২	১৬.১২.২০১৪ তারিখে সংবাদপত্রটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছে	--
৩	১৯.১১.২০১৫ তারিখে তিন মাসের (অর্থাৎ জুলাই ২০১৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) সময়ের ডিএফপি'র নিবন্ধন শাখা কর্তৃক নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৯৪ সদয় দেখা যেতে পারে।
৪	স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ, রাজারবাগ, ঢাকা কর্তৃক ০১.০৩. ২০১৫ থেকে ১৪.০৬.২০১৫ পর্যন্ত সময়ের নিয়মিত সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেছেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৯৫ সদয় দেখা যেতে পারে।
৫	০৭.০৬.২০১৬ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, রাজনৈতিক-৩ অধিশাখা কর্তৃক সংবাদপত্রটির মিডিয়া তালিকাভুক্তিতে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হযেছে।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৯৬ সদয় দেখা যেতে পারে।
৬	সংবাদপত্র মিডিয়া তালিকাভুক্তির প্রাথমিক তথ্যাবলী পুরণ করে সংযুক্ত করা হয়েছে (সংবাদপত্রে মিডিয়া তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে অফিস, জনবল, প্রেস ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ রয়েছে)।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৯৮ সদয় দেখা যেতে পারে।
৭	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ০১.০৮.২০১৬ তারিখে মিডিয়া তালিকাভুক্তির জন্য অত্র অধিদপ্তরে আবেদন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৯৯ সদয় দেখা যেতে পারে।
৮	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষকে ২৪.০৮.২০১৬ তারিখে মিডিয়া তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে নিরীক্ষায় হাজির হওয়ার জন্য নোটিশ জারি করা হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১০০ সদয় দেখা যেতে পারে।
৯	সংবাদপত্রটি ০৭.০৯.২০১৬ তারিখে মিডিয়া তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে অফিস ও প্রেস পরিদর্শন করা হয়েছে।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১০১ সদয় দেখা যেতে পারে।
১০	সংবাদপত্রটি ০৭.০৯.২০১৬ প্রচার সংখ্যা ৬,০০৫ (ছয় হাজার পাঁচ) কপি ও বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ১০৪.০০ (একশত চার) টাকা নির্ধারণ করে মিডিয়া তালিকাভুক্তির পত্র জারি কার হয়। সংবাদপত্রটি ৮ (আট) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১১৭ ও ১১৫ সদয় দেখা যেতে পারে।

G:\ASAD New ABC WorkStar Of DFP\ABC-ASAD-New Letter.docx 517

১১	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ২৫.০৫.২০১৭ তারিখে প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১৪১ সদয় দেখা যেতে পারে।
১২	আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ০৬.০৬.২০১৭ তারিখে প্রচার সংখ্যা ২১,৩০০ (একুশ হাজার তিনশত) কপি ও বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ১২২.২০ (একশত বাইশ দশমিক দুই শূন্য) টাকা পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১৪২ ও ১৪৩ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৩	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ২১.০৯.২০১৭ তারিখে ৮ম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ণের জন্য অত্র অধিদপ্তরে আবেদন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৭ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৪	৮ম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ণের জন্য ৩০.১১.২০১৭ তারিখে ৮ম ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং টিম কর্তৃক সংবাদপত্রটির অফিস পরিদর্শন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ১৫৯ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৫	৮ম ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং টিম কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে সংবদপত্রটিকে ১৪.১২.২০১৭ তারিখে প্রচার সংখ্যা ২১,৩০০ (একুশ হাজার তিনশত) কপি, বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ৫০৩.০০ (পাঁচশত তিন) টাকা ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ৩৯.৭২ (উনচল্লিশ দশমিক সাত দুই) মেট্রিক টন পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২১৫ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৬	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ২৩.০৪.২০১৮ তারিখে পুনরায় প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৫৪ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৭	পরিপ্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক ০৬.০৫.২০১৮ তারিখে সংবাদপত্রটির অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৬৮ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৮	০৯.০৫.২০১৮ তারিখে নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের ভিত্তিতে সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা ৩৮,৫০০ (আটত্রিশ হাজার পাঁচশত) কপি, বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ৫৩৩.০০ (পাঁচশত তেত্রিশ) টাকা ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬.৩২ (ছয়চল্লিশ দশমিক তিন দুই) মেট্রিক টন পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয়। সংবাদপত্রটি ৮ (আট) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৭০-২৭২ সদয় দেখা যেতে পারে।
১৯	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ০৯.১২.২০১৮ তারিখে পুনরায় প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৭৫ সদয় দেখা যেতে পারে।
২০	২৭.১২.২০১৮ তারিখে নিরীক্ষা ভিত্তিতে সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা ৩৮,৯৯০ (আটত্রিশ হাজার নয়শত নব্বই) কপি ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬.৯০ (ছয়চল্লিশ দশমিক নয় শূন্য) মেট্রিক টন পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয়। সংবাদপত্রটি ৮ (আট) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৯০-২৯১ সদয় দেখা যেতে পারে।
২১	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ১২.০৩.২০১৯ তারিখে পুনরায় প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৯২ সদয় দেখা যেতে পারে।
২২	পরিপ্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪.০৩.২০১৯ তারিখে সংবাদপত্রটির অফিস সরেজমিন পরিদর্শন করেন।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ২৯৩ সদয় দেখা যেতে পারে।
২৩	১৪.০৩.২০১৯ তারিখে নিরীক্ষা ভিত্তিতে সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা ৪০,১০০ (চল্লিশ হাজার একশত) কপি, বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ৫৩৮.০০ (পাঁচশত আটত্রিশ) টাকা ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৮.২৪ (আটচল্লিশ দশমিক দুই চার) মেট্রিক টন পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয়। সংবাদপত্রটি ৮ (আট) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয়।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩০১-৩০৩ সদয় দেখা যেতে পারে।

মনিটরিং টিমে সদস্য ছিলেন কারা?

২৪	সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ ২১.০৮.২০১৯ তারিখে পুনরায় প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩০৪ সদয় দেখা যেতে পারে ।
২৫	পরিপ্রেক্ষিতে অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬.০৯.২০১৯ তারিখে সংবাদপত্রটির অফিস ও প্রেস সরেজমিন পরিদর্শন করেন ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩০৫ সদয় দেখা যেতে পারে ।
২৬	১৭.১০.২০১৯ তারিখে নিরীক্ষা ভিত্তিতে সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা ৪০,৫০০ (চল্লিশ হাজার পাঁচশত) কপি, বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ৫৪৩.০০ (পাঁচশত তেতাল্লিশ) টাকা ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ৪৮.৭২ (আটচল্লিশ দশমিক সাত দুই) মেট্রিক টন পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয় । সংবাদপত্রটি ৮ (আট) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয় ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩১৪-৩১৬ সদয় দেখা যেতে পারে ।
২৭	২৬.১০.২০২০ তারিখ থেকে সংবাদপত্রটি ১২ (বারো) পৃষ্ঠার প্রকাশনা হয় উল্লেখ্যপূর্বক অবগতকরণ ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করে আবেদন দাখিল করেন ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩৩৫ সদয় দেখা যেতে পারে ।
২৮	০২.০৯.২০২১ তারিখ থেকে সংবাদপত্রটি ১২ (বারো) পৃষ্ঠার প্রকাশনা হওয়ায় প্রচার সংখ্যা ৪০,৫০০ (চল্লিশ হাজার পাঁচশত) কপির ভিত্তিতে মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ হয় ৭৩.০৮ (তিহাত্তর দশমিক শূন্য আট) মেট্রিক টন ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩৫০ সদয় দেখা যেতে পারে ।
২৯	অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক ২৩.০২.২০২২ তারিখে সংবাদপত্রটির অফিস ও প্রেস সরেজমিন পরিদর্শন করেন ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩৬৪ সদয় দেখা যেতে পারে ।
৩০	পরিপ্রেক্ষিতে ১৯.০৪.২০২২ তারিখে নিরীক্ষা ভিত্তিতে সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা ১৩,৫০০ (তেরো হাজার পাঁচশত) কপি, বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ৩৯২.০০ (তিনশত বিরানব্বই) টাকা ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ১৬.৩২ (ষোলো দশমিক তিন দুই) মেট্রিক টন পুনর্নির্ধারণ করে পত্র জারি করা হয় । সংবাদপত্রটি ৮ (আট) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয় ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৩৬৫ সদয় দেখা যেতে পারে ।
৩১	মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট অব বাংলাদেশ-এর হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নম্বর ৩৮৩১/২০২৪-এর আদেশ মোতাবেক অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক ১১.০৬.২০২৪ তারিখে সংবাদপত্রটির প্রচার সংখ্যা ৪০,৫০০ (চল্লিশ হাজার পাঁচশত) কপি, বিজ্ঞাপন হার প্রতি কলাম ইঞ্চি ৫৪৩.০০ (পাঁচশত তেতাল্লিশ) টাকা ও মাসিক নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দের পরিমাণ ৭৩.০৮ (তিহাত্তর দশমিক শূন্য আট) মেট্রিক টন পুনর্বহাল করে পত্র জারি করা হয় । সংবাদপত্রটি ১২ (বারো) পৃষ্ঠা ডিমাই আকারে প্রকাশিত হয় ।	পত্র পৃষ্ঠা নম্বর ৪১১-৪৯৯ সদয় দেখা যেতে পারে ।

Pasuy
20.01.2025

চৌধুরী সাহেলা পারভীন
উপপরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা)
ফোন: ০২-৪৮৩১৩০৩৬

কমিশন প্রধান
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন
তথ্য ভবন (লেভেল-১৫)
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা ।

O:\ASAD\New ABC WorkStar\DFP\ABC-ASAD-New Letter.docx 519

প্রচারসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে শুধু বিজ্ঞাপনের রেট নয়, নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দও বাড়ে। ২০২০ সালের ২৬ অক্টোবর ১২ পৃষ্ঠা করার ঘোষণায় বরাদ্দ বাড়ে। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে ৪৮.৭২ টন থেকে ৭৩ টন করা হয়। ২০২২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ডিএফপি পরিদর্শন করে ১৯ এপ্রিল প্রচারসংখ্যা কমিয়ে ১৩,৫০০ কপি এবং রেট কমিয়ে ৩৯২ টাকা করে। নিউজপ্রিন্ট বরাদ্দও কমে ১৬.৩২ টন হয়। এরপর আদালতের মাধ্যমে ২০২৪ সালের ১১ জুন থেকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। এভাবেই পত্রিকাটি কাগজে-কলমে ইংরেজি দৈনিকগুলোর শীর্ষে।

গত কয়েক দশক ধরে শীর্ষস্থানে থাকা দ্য ডেইলি স্টারের ২০২০ সালে করোনা মহামারির আগে ৪৪,৫০০ কপি প্রচারসংখ্যা ছিল। মহামারির কারণে ডেইলি স্টারের প্রচারসংখ্যা কমে ২৯,৪০০-এ নেমে আসে। সেসময়ে পুরো সংবাদপত্র শিল্পেই প্রচারসংখ্যায় ধস নামে এবং সবার বিক্রি নাটকীয়ভাবে কমে যায়। এই পটভূমিতে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ডিএফপি সবার প্রচারসংখ্যা পুনর্নির্ধারণ করে এবং ডেইলি স্টার শীর্ষস্থান ফিরে পায়। কিন্তু দ্য ট্রাইব্যুনালের মামলাসূত্রে আগের প্রচারসংখ্যা বহাল হয়। স্পষ্টতই এই তালিকার বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যের কোঠায় এবং এর ভিত্তিতে কম প্রচারিত পত্রিকাগুলো উচ্চমূল্যে সরকারি বিজ্ঞাপন পেয়ে লাভবান হচ্ছে, যা সরকারি অর্থের অপচয়। অন্যদিকে পাঠকপ্রিয় পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন কম পাচ্ছে, যাতে তাদের আর্থিক সংকট বাড়ছে।

অন্যান্য পত্রিকার নথি পর্যালোচনা করে পরিদর্শন প্রক্রিয়ার ত্রুটি স্পষ্ট। হকার সমিতির বিলের সঙ্গে ডিএফপির তালিকার কোনো মিল নেই। ন্যূনতম জনবল, অফিসের আয়তন ও সরঞ্জামের শর্তগুলোও তালিকাভুক্ত কাগজগুলো পূরণ করতে পারে কি না, তা প্রশ্নবিদ্ধ।

সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং নিরীক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী, ছাপার আদেশ, বিল, এজেন্টদের তালিকা, গ্রাহক খাতা ইত্যাদি নিরীক্ষার কথা বলা আছে। ২০২২ সালের নীতিমালায় এক লাখের বেশি প্রচারসংখ্যার পত্রিকার আয়কর সনদ থাকার কথা বলা হলেও তা বাংলা বা ইংরেজি কোনো পত্রিকার ক্ষেত্রেই কার্যকর নয়। এই শর্ত যথাযথভাবে মানলে ভুয়া প্রচারসংখ্যা দেখানো বন্ধ করা যেত। কিন্তু অখ্যাত অনেক পত্রিকা ভুয়া নথি তৈরি করে নিরীক্ষার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসাজশে অবাস্তব প্রচারসংখ্যা দেখিয়ে সরকারি বিজ্ঞাপন পায়। তাছাড়া এই আয়কর নথি দেখানোর বাধ্যবাধকতা এক লাখের ওপর প্রচারসংখ্যায় রাখার যৌক্তিকতা এখন অচল। ইংরেজি পত্রিকার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা এর কুড়ি ভাগের এক ভাগ হলেও অনেকেই এর আওতার বাইরে থেকে যাবে। প্রচারসংখ্যা যাই হোক না কেন, আয়কর সনদের বাধ্যবাধকতা সবার জন্য কেনো প্রযোজ্য হবে না, তা বোধগম্য নয়।

খ) সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন

দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩, যা ১৯৭৬ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে কয়েক দফা সংশোধন করা হয়েছে তা বর্তমানে সময়োপযোগী নয়। গত তিন-চার দশকে অসংখ্য নামসর্বস্ব সংবাদপত্রের উদ্ভব নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এই সমস্যা অনেকাংশেই এড়ানো যেত, যদি সরকার পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ১২ ধারার উপধারা ২-এর (ছ) অনুচ্ছেদের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিত। এই অনুচ্ছেদে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকাশকের পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে সন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ডিক্লারেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদটি তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। তথ্য অধিদপ্তরের নথিসূত্রে দেখা যায়, বর্তমানে মাত্র পাঁচ লাখ টাকার ব্যাংক স্থিতি দেখালেই পত্রিকার ডিক্লারেশন পাওয়া সম্ভব। এত স্বল্প আমানতে কোন দৈনিক পত্রিকার এক সপ্তাহের প্রকাশনা খরচেরও সংস্থান হওয়ার কথা নয়।

গ) সরকারি বিজ্ঞাপন

প্রিন্ট মিডিয়া হোক, কিংবা ডিজিটাল মাধ্যম-সব মাধ্যমের আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন। এই বিজ্ঞাপনেরও প্রধানত দুটি উৎস-সরকারি ও বেসরকারি। সরকারি বিজ্ঞাপন পত্রিকার প্রচারসংখ্যা এবং ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অস্বচ্ছতা বিদ্যমান। প্রচারসংখ্যায় যেমন অতিরঞ্জন থাকে, তেমনই ওয়েজ বোর্ড

বাস্তবায়নেও অনেক পত্রিকা সরকারকে বিভ্রান্তিকর অথবা মিথ্যা তথ্য দেয়। ওয়েজ বোর্ড মনিটরিং কমিটি নামে যে ব্যবস্থাটি এটি বাস্তবায়নের প্রত্যয়ন করে থাকে, সেখানেও অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সংবাদপত্রের সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বেসরকারি বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ এখন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল মিডিয়া ও টেলিভিশনে চলে যাচ্ছে। 'দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস'-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রায় ৭৮ শতাংশ বিজ্ঞাপনের রাজস্ব ডিজিটাল মিডিয়াতে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ বিজ্ঞাপন এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মতে, ৫০ শতাংশের কিছুটা বেশি বিজ্ঞাপন ডিজিটাল মাধ্যমে যাচ্ছে। এ কারণে সংবাদপত্রগুলো অতিমাত্রায় সরকারি বিজ্ঞাপনমুখী হয়ে উঠেছে। সরকার কিন্তু সংবাদপত্রের রাজস্ব চাহিদার প্রতি দীর্ঘদিন ধরে উদাসীনতা দেখাচ্ছে। সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্যহার খুবই কম। ২০১৪ সালের পর গত ১০ বছরে এই হার বাড়ানো হয়নি, যদিও বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ২০১৯ পর্যন্ত প্রতিবছর ৫ থেকে ৬ শতাংশ এবং ২০২০ থেকে ১০ শতাংশ ছুঁয়েছে। সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যয়ও কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। একমাত্র 'দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস' ৯ম ওয়েজ বোর্ডের আংশিক (মহার্ঘ্য ভাতা) বাস্তবায়ন করেছে। তবে নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন ছাড়াই কিছু পত্রিকার বেতন-ভাতা মোট মাসিক ব্যয়ের প্রায় ৪০ শতাংশ ছুঁয়েছে বলে পত্রিকা মালিকদের দাবি।

দেশে ইংরেজি পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা কম হলেও আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের খবরাখবর পৌঁছে দেওয়া এবং দেশের তরুণদের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রসার ঘটানোয় এসব পত্রিকা মূল্যবান ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু বাংলা পত্রিকাগুলোর সাথে একই মানদণ্ডে এর প্রচারসংখ্যা বিচার করে বিজ্ঞাপনের হার নির্ধারণ করায় ইংরেজি পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন বণ্টন ও মূল্য হারের ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়ে আছে। ইংরেজি দৈনিকের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে ইংরেজি কাগজের প্রচারসংখ্যা বাংলা ভাষার কাগজের চেয়ে কম। কিন্তু ইংরেজি কাগজের পরিচালন ব্যয় সাধারণত বাংলা কাগজের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এসব বিবেচনায় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলোর জন্য একটি পৃথক শ্রেণীকরণ করে বিজ্ঞাপনের হার পুনর্নির্ধারণ করা যৌক্তিক হলেও তা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

ঘ) আঞ্চলিক / স্থানীয় পত্রিকা

ঢাকার বাইরের আঞ্চলিক সংবাদপত্রের অবস্থাও অনেকটা ঢাকার পত্রিকা জগতের মতোই। সেখানেও পত্রিকার সংখ্যাধিক্য একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছে, যার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ যেমন আছে, তেমনই আছে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা। কিছু জেলা শহরে পাঁচ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য ৩২টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, অধিকাংশ পত্রিকারই কোনো পাঠক নেই, অন্তত পয়সা দিয়ে পত্রিকা কেনার মতো পাঠক নেই। ঢাকার বাইরে কমিশন যেসব মতবিনিময় সভা করেছে, সেখানে এমন তথ্যও উঠে এসেছে যে, নির্বাচনের সময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্রগুলোয় সাংবাদিক পরিচয়ে নিজস্ব কর্মীদের নিয়োগ দেওয়ার জন্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন থেকে অস্বাভাবিক উচ্চসংখ্যায় অ্যাক্রিডিটেশনের ব্যবস্থা করা হয় এবং এসব কর্মীদের কাজ হলো, ভোটকেন্দ্রে প্রকৃত সাংবাদিকদের বঞ্চিত করা, কারচুপিতে সহায়তা করা অথবা কারচুপি আড়াল করা। পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে, ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে সেখানে একটি রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য অর্থ দিয়েছিল এবং পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর তহবিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। তবে পত্রিকাটির নামে একটি অনলাইন পোর্টাল সেই গোয়েন্দা সংস্থা বেশ কিছুদিন চালু রেখেছিল।

সরকারি বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংবাদপত্রগুলো নানাভাবে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ক্রোড়পত্রের ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই উপেক্ষিত থাকে। অথচ মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতি এবং জনপ্রতিনিধি ও সরকারি সেবাদানকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা আদায়ে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বাংলাদেশে বেশকিছু

আঞ্চলিক/স্থানীয় দৈনিকের উল্লেখযোগ্য পাঠকপ্রিয়তা রয়েছে। বিশ্বের সর্বত্রই স্থানীয় গণতন্ত্রের জন্য আঞ্চলিক/স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্যের কিছু দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

ঙ) প্রবাসীদের বাংলা পত্রিকা

প্রবাসীদের বাংলা পত্রিকাগুলো প্রধানত সাপ্তাহিক হলেও দেশের সঙ্গে প্রবাসীদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তারা এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের ভেতরের সেন্সরশিপের কারণে যেসব তথ্য প্রকাশ করা যায় না, প্রবাসী বাংলা পত্রিকায় সেগুলো প্রকাশের পর আলোড়ন সৃষ্টির উদাহরণও রয়েছে। তবে, অনলাইনের ব্যাপক প্রসারের ফলে এখন কোনো খবর বেশিক্ষণ গোপন রাখা সম্ভব হয় না। প্রবাসে বাংলাদেশি রাজনীতিকদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, দূতাবাসগুলোর অনিয়ম-দুর্নীতি এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভালো-মন্দ খবর প্রকাশ এবং প্রবাসীদের মতামত তুলে ধরে এসব সাপ্তাহিক পত্রিকা এখনো সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী পত্রিকাগুলোর পক্ষ থেকে, প্রথমে ব্রিটেনের ব্রিটিশ-বাংলা প্রেস ক্লাব এবং পরে কানাডার পত্রিকা 'দেশ-বিদেশের' পক্ষ থেকে, প্রবাসী পত্রিকাগুলোয় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দিবসের ক্রোড়পত্র এবং যেসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের বড় অংশ প্রবাসী বাংলাদেশি, সেসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। বিমানের আন্তর্জাতিক রুটগুলোর যাত্রীদের প্রধান অংশ বাংলাদেশি হলেও তাদের উদ্দেশে বিজ্ঞাপন শুধু দেশের ভেতরে প্রচারিত হয়, বিদেশে নয়। বিভিন্ন ব্যাংকের রেমিট্যান্স সংগ্রহের প্রণোদনার বিজ্ঞাপনও প্রবাসী পত্রিকায় যায় না। তবে প্রবাসের বাংলা পত্রিকাগুলোও এখন অন্যান্য পত্রিকার মতোই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন।

চ) সরকারি নীতি সহায়তা

সরকার সংবাদপত্র খাতকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করলেও এর জন্য এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তামূলক পদক্ষেপ নেয়নি। সংবাদপত্রশিল্প সরকার থেকে কোনো রকম প্রণোদনা পায়নি। উদাহরণস্বরূপ, কোভিড মহামারিকালীনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সে সময়ে সরকার বেসরকারি খাতের সব শিল্পের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেও সংবাদপত্রশিল্প হচ্ছে একমাত্র খাত যারা ওই কঠিন পরিস্থিতিতে কোনোরকম সহায়তা পায়নি। বর্তমানে নিউজপ্রিন্টের আমদানিতে ভ্যাট, ট্যাক্স বাবদ আমদানি মূল্যের প্রায় ৩০ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে হয়। ভ্যাটের হার ১৫, আমদানি শুল্ক ৫, উৎসে অগ্রিম কর ৫ এবং অগ্রিম কর ৫ শতাংশ। নামে অগ্রিম কর হলেও তা বার্ষিক প্রযোজ্য করের সঙ্গে সমন্বয় করা হয় না। ফলে অগ্রিম কর নামে এই শিল্পে কার্যত একটি অঘোষিত কর আরোপ করা হয়েছে। যেসব পত্রিকা (কয়েকটি হাতে গোনা) সরকারকে কর দেয়, তাদের পরিচালন মুনাফার ওপর ২৭.৫% হারে করপোরেট ট্যাক্স দিতে হয়। শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত নয়-এমন কোম্পানির জন্য এটি সর্বোচ্চ করহার। ভ্যাট ও অন্যান্য কর নিয়ে সংবাদপত্র মালিক সমিতি (নোয়াব) বিভিন্ন সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বহুবার দেনদরবার করেছে; কিন্তু বিষয়গুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। অভিযোগ আছে, সাবেক স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা স্বাধীন সংবাদপত্রকে তার শত্রু গণ্য করতেন এবং এ কারণেই এই শিল্পবিরোধী নীতি গ্রহণে উৎসাহী ছিলেন। সংবাদপত্রের জন্য আরেকটি বড় বাধা বিজ্ঞাপনের বিল পরিশোধ না করা। সরকার সময়মতো বিল পরিশোধ তো দূরের কথা, বিভিন্ন উৎসব-পার্বণের সময়েও বকেয়া পরিশোধে অনীহা দেখায়।

সংবাদপত্র ও সরকারি বিজ্ঞাপন

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের আর্থিক স্বাবলম্বিতা বা সচ্ছলতা, যাই বলা হোক না কেন, অবশ্যই নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দাবি রাখে। ঐতিহাসিকভাবেই গণমাধ্যম কখনোই অর্থনৈতিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাবলম্বী ছিল না।

সংবাদপত্র এককভাবে সবচেয়ে পুরোনো ও প্রভাবশালী গণমাধ্যম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সংবাদপত্রের সংখ্যা হাতে গোনা হলেও সব সংবাদপত্র অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না।

দৈনিক ইত্তেফাক ও ইংরেজি দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার বাদে অন্য কোনো দৈনিকই আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল না। তখন বেসরকারি বিজ্ঞাপনের বাজারও খুবই সীমিত ছিল। সরকারি বিজ্ঞাপন ও শ্রেণিভুক্ত বিজ্ঞাপনই পত্রিকাগুলোর প্রধান উৎস ছিল। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর, ধীরে ধীরে সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং এর ফলে বিজ্ঞাপনের বাজারে প্রতিযোগিতাও বাড়তে থাকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে ১৯৭৬ সালে তৎকালীন সরকার তার বিজ্ঞাপন বণ্টনের জন্য একটি নীতি ঘোষণা করে। ওই বিজ্ঞাপন নীতির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সরকারের তৈরি করা মিডিয়া লিস্টে অন্তর্ভুক্ত সংবাদপত্রগুলো তাদের প্রচারসংখ্যার ভিত্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন পাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত রেটে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশন অডিটের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলোর প্রচারসংখ্যা নিরূপণ করে থাকে। তখন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো তাদের বিজ্ঞাপন নিজেরাই পত্রিকাগুলোয় বিতরণ করত।

১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক মাস পরই বিজ্ঞাপন নীতির আবার পরিবর্তন ঘটে। সেখানে সব সরকারি সংস্থার বিজ্ঞাপন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিতরণ শুরু করে। অবশ্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপন তারাই বিতরণ করবে, সেই বিধান বহাল থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সরকারি বিজ্ঞাপন বিতরণে বেশি দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

এরকম অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮২ সালে সরকারি বিজ্ঞাপন বিতরণ প্রক্রিয়া পুনরায় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। এবং এ পর্যন্ত সে বিজ্ঞাপন নীতিই বহাল আছে।

বেসরকারি বিজ্ঞাপন

বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি এককেন্দ্রিক ধারা থেকে বের হয়ে ব্যক্তি খাত হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। অর্থনীতি এখন প্রায় পুরোপুরি উন্মুক্ত। ফলে বেসরকারি খাত থেকে এক মোটা অঙ্কের বিজ্ঞাপন প্রতিবছর বিতরণ করা হয়। সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়ায় এসব বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। একসময় বাংলাদেশ টেলিভিশন ছাড়া বিজ্ঞাপনের পুরোটাই যেত সংবাদপত্রে। এখন আর সে অবস্থা নেই। বেসরকারি বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ এখন টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়া পেয়ে থাকে।

বেসরকারি বিজ্ঞাপন বিতরণে স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছতা থাকার কথা, কারণ এখানে দুর্নীতি ও যোগসাজশের পরিবর্তে প্রতিযোগিতা, প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতেই বিজ্ঞাপন বণ্টন হওয়ার কথা। তবুও বেসরকারি বিজ্ঞাপন মার্কেটিং হাতে গোণা কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ আছে। বঞ্চিত বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের হস্তক্ষেপের সুপারিশ করেছে।

বর্তমানে সংবাদপত্রের সংখ্যাধিক্য এবং বিজ্ঞাপনদাতারা ক্রমেই ডিজিটাল মিডিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ার কারণে সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপনলব্ধ আয় ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এ ধারা পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাই সংবাদপত্রগুলো তাদের অনলাইন ও মাল্টিমিডিয়া সংস্করণগুলো জোরদার করার চেষ্টা করছে।

বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্রের সংখ্যাধিক্যকে কাজে লাগাচ্ছে। এখন পত্রিকাগুলোর নির্ধারিত বিজ্ঞাপন মূল্যহার বলতে আর কিছু নেই। মোটামুটি সব পত্রিকাই বিজ্ঞাপন মূল্য হারে বেশ বড় রকমের ছাড় বা রেয়াত (ডিসকাউন্ট) দিচ্ছে। একদিকে বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কমে গেছে, অন্যদিকে রেয়াতের কারণে বিজ্ঞাপন থেকে সংবাদপত্রগুলোর আয়ে ধস নেমেছে।

পত্রিকা মুদ্রণের খরচ

স্বাভাবিকভাবে পত্রিকা মুদ্রণের খরচ ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। পত্রিকাগুলোর পরিসর বেড়েছে, উন্নত প্রযুক্তি সংযোজন ও পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৪ সালের প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্ট

অনুযায়ী, এক কপি পত্রিকা মুদ্রণ খরচ সেসময় ছিল দেড় টাকা থেকে দুই টাকা, আর ৮ পৃষ্ঠার এক কপির বিক্রয়মূল্য ছিল ১ টাকা ৪০ পয়সা। আবার সেই বিক্রয় মূল্যের শতকরা ৩৫% হকার বা কমিশন হিসেবে নিয়ে নিত। বর্তমানে একটি ১৬ পৃষ্ঠার প্রথম শ্রেণির পত্রিকার মুদ্রণ খরচ কম করে হলেও ১২ টাকা। হকারদের কমিশন বাদে বিক্রয় মূল্য দাঁড়ায় ৯ টাকা। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে হকার সমিতি পত্রিকা বিলিব্যবস্থায় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং কোনো পত্রিকাই নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কম খরচে গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর কোনো বিকল্প উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়নি।

প্রকাশনা ও বেতন-ভাতা ব্যয়

একটি প্রথম শ্রেণির পত্রিকার প্রকাশনা খরচ ও বেতন-ভাতা ব্যয় প্রায় সমান। আশির দশকে বেতন-ভাতা বাবদ গড়ে ব্যয় ছিল পরিচালন খরচের শতকরা ৪০ ভাগ। কয়েকটি পত্রিকা বাদে সব দৈনিক পত্রিকার অর্থনৈতিকভাবে ঘাটতিতে পরিচালিত হচ্ছে। অনেক পত্রিকার মালিক অন্য ব্যবসা বা তহবিল থেকে ঘাটতি পূরণ করছেন। কোনো কোনো মালিক সাংবাদিক-কর্মচারীদের বেতন ঠিকমতো পরিশোধ না করেই কোনোরকমে পত্রিকা প্রকাশ করে যাচ্ছেন। তবে নামমাত্র পত্রিকাগুলোর মালিক স্বল্পমূল্যে পত্রিকা করে নিজে সরকারি বিজ্ঞাপন বাগিয়ে মুনাফা পকেটে পুরে চলেছে।

৪.২ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল

বাংলাদেশে সম্প্রচারমাধ্যমের উদারীকরণ শুরু হয় স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা থেকে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর প্রাথমিকভাবে শুধু সংবাদ ও সাময়িক প্রসঙ্গের অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য বিদেশি টিভি ও বেতারের আকাশ উন্মুক্ত করা হয়। এর ফলে বিবিসি এবং সিএনএন-এর খবর প্রচার এবং এফএম প্রচার তরঙ্গে বিবিসি রেডিওর খবর সম্প্রচার শুরু হয়।

এরপর ১৯৯৮ সালে দেশীয় বেসরকারি টিভির জন্য আকাশ উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন প্রথম বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালন নীতি ১৯৯৮ সরকার প্রকাশ করে। সেখানে উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়, 'বাংলাদেশে টেলিভিশনের একটিমাত্র চ্যানেল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রচারকালে সীমিত প্রযুক্তির সুবিধা দিয়ে শিক্ষা, তথ্য, বিনোদন ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে, যা দর্শক-শ্রোতাদের ব্যাপক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হচ্ছে না বিধায় একাধিক টিভি চ্যানেল চালু ও বহির্বিশ্বে সম্প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।' এ বক্তব্যে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি: ১. বিটিভি একাকভাবে দর্শকদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না বলে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সুযোগ দেওয়া; এবং ২. বহির্বিশ্বে বাংলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা। সম্ভবত দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স গ্রহণের সুবিধার্থে জুড়ে দেওয়ার একটি কৌশল ছিল, যে কারণে শুরুর দিকের চ্যানেলগুলো বিদেশে অনুষ্ঠান রপ্তানির অনুমতি চেয়েছিল এবং পরবর্তীতেও প্রায় সব উদ্যোক্তা বিদেশে বাংলাদেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও উন্নয়নের গল্প প্রচারের সুযোগ চেয়েছে। তবে বাস্তবে এদের খুব কম সংখ্যক চ্যানেলই বহির্বিশ্বে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পেরেছে। উপরন্তু বেসরকারি চ্যানেলগুলোর জন্য সম্প্রচারে আপ-লিঙ্ক ও ডাউন-লিঙ্কের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করায় মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় এসব অনুষ্ঠান দেখানো যায় না।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র অনুযায়ী, ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৩টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলকে সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি চ্যানেল সম্প্রচার শুরু করলেও বর্তমানে চালু রয়েছে ৩৪টি, অর্থাৎ ৭টি চ্যানেল চালুর পর বন্ধ হয়ে গেছে। যার মধ্যে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় লাইসেন্স পাওয়া ৫টি চ্যানেল বিগত সরকার বন্ধ করে দেয়। বন্ধ হওয়া এই ৫টি চ্যানেলের একটিও বিগত সরকারের আমলে আর চালু হয়নি। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বন্ধ হয়েছে ২টি চ্যানেল। এছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকার তার মেয়াদের শেষ কয়েক বছরে আরও ১২টি চ্যানেলের অনুমোদন দিলেও সেগুলো এখনো সম্প্রচারে

আসেনি। শেখ হাসিনা তার প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স প্রদান শুরু করে মোট ৩টি চ্যানেলের অনুমোদন দেন। এগুলো হলো: এটিএন বাংলা, একুশে টিভি ও চ্যানেল আই।

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, ২০০২ সালে হাইকোর্ট একুশে টিভির টেরেস্ট্রিয়াল সম্প্রচারের লাইসেন্স প্রদান বেআইনি ঘোষণা করায় তা বন্ধ হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলে সুপ্রিম কোর্ট আপিল খারিজ করে দিলে তা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়। পরে মালিকানা পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং শুধু স্যাটেলাইট চ্যানেল হিসেবে কাজ করার শর্তে ২০০৫ সালে একুশে টিভিকে পুনরায় সম্প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়।

জোট সরকারের মেয়াদে (২০০১-২০০৬) মোট ১০টি বেসরকারি চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়। এগুলো হলো: এনটিভি, আরটিভি, বাংলাভিশন, বৈশাখী টিভি, দেশ টিভি, চ্যানেল ওয়ান, ইসলামিক টিভি, এসএনটিভি, সিএসবি ও দিগন্ত টিভি। ২০০২ সালে যমুনা টিভিকে টেরেস্ট্রিয়ালরিয়াল সম্প্রচারের লাইসেন্স প্রদান করা হলেও সেটা বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় এসব চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কারণ, এই চ্যানেলের মালিকরা প্রায় সবাই বিএনপির সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। এনটিভি ও আরটিভির মালিক ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি ও বিএনপির সংসদ সদস্য মোসাদ্দেক আলী ফালু। অন্যদিকে চ্যানেল ওয়ানের মালিক ছিলেন তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ গিয়াস উদ্দিন মামুন। আরটিভি এখন আর মোসাদ্দেক আলীর নিয়ন্ত্রণে নেই। ২০০৭ সালে মোসাদ্দেক আলী জেলে থাকার সময় এই টিভির মালিকানা পরিবর্তন হয়। বেঙ্গল গ্রুপের মোরশেদ আলম সব শেয়ার কিনে নেন। অভিযোগ রয়েছে, একটি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এসব শেয়ারের হাতবদলে ভূমিকা রাখে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর মালিকানাধীন সিএসবি টিভি, সাবেক সচিব ও বিএনপির সংসদ সদস্য মুশফিকুর রহমানকে দেওয়া হয় দেশ টিভির লাইসেন্স, খালেদা জিয়ার ভাই অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সাইদ ইস্কান্দার ইসলামিক টিভি এবং বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দিন ও নাসির উদ্দিন পিন্টুর মালিকানাধীন এসএনটিভি। অন্যদিকে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র ও বিএনপি নেতা সাদেক হোসেন খোকা, ব্যবসায়ী আব্দুল হক এবং বিএনপির কয়েকজন নেতা বাংলাভিশন চ্যানেলের পেছনে ছিলেন বলে জানা যায়। বৈশাখী টিভির কর্ণধার এওয়াইএম কামাল বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ২০০৭ সালে একটি লাইভ সংবাদ পরিবেশনের সময় সরকারবিরোধী প্রচার করা হয়েছে অভিযোগে সিএসবির লাইসেন্স বাতিল করা হয়। এরপর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনার দ্বিতীয় মেয়াদে অপপ্রচারের অভিযোগে দিগন্ত টিভি, চ্যানেল ওয়ান, ইসলামিক টিভি ও এসএন টিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আদালতের মাধ্যমে যমুনা টিভি লাইসেন্স ফিরে পেয়ে পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরুর পর হাসিনা সরকার ২০০৯ সালের নভেম্বরে তা বাতিল করে নতুনভাবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে বলে। পুনঃপ্রচারের অনুমতি চেয়ে আবার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৩ সালে স্থগিত থাকা লাইসেন্স ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

২০০৯ সালের শুরু থেকেই টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা, তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও সাংবাদিকরা একযোগে আবেদন করা শুরু করে। সে বছর একই দিনে ১০টি চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হয়। ২০০৯ সালের ১১ অক্টোবর যে ১০টি চ্যানেলের অনাপত্তিপত্র প্রদান করা হয় সেগুলো হলো: একাত্তর টিভি, বিজয় টিভি, গাজী টিভি, চ্যানেল নাইন, সময় টিভি, ইনডিপেনডেন্ট টিভি, মাছরাঙা টিভি, এটিএন নিউজ, মোহনা টিভি ও মাই টিভি। এসব চ্যানেলের বেশির ভাগ লাইসেন্স পায় আওয়ামী লীগের নিজস্ব লোকজন এবং তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক। এরপর ২০১০-এ ২টি (চ্যানেল ২৪ ও এসএ টিভি) এবং ২০১১ সালে ৩টি চ্যানেলের (এশিয়ান টিভি, গানবাংলা, দীপ্ত বাংলা) অনুমোদন দেয় সরকার। ২০১৩ সালে আবার গণহারে ১৩টি চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়। এসব লাইসেন্স যারা পেয়েছেন, তারা অধিকাংশই সরকারি দলের সদস্য, তাদের পরিবারের সদস্য বা ঘনিষ্ঠজন

ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। তাদের মধ্যে কয়েকজন সাংবাদিকও রয়েছেন। এগুলো হলোঃ ডিবিসি, দুরন্ত টিভি, নাগরিক টিভি, আনন্দ টিভি, নেক্সাস টিভি (পূর্বের নাম রংধনু), টি স্পোর্টস (পূর্বের নাম তিতাস টিভি), স্পাইস টিভি, গোবাল টিভি, গ্রিন টিভি, চ্যানেল এস, নিউজ ২৪ এবং বাংলা টিভি। বাংলা টিভি যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের টিভি হিসেবে যাত্রা শুরু করার প্রায় দুই দশক পর বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পুরোপুরি স্থানান্তর করে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হওয়ার আগে আওয়ামী লীগ সরকার আরও ১২টি চ্যানেলের অনুমোদন দিয়ে যায়। আগের মতোই এসব চ্যানেলগুলোও পেয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতা ও তাদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যাদের মধ্যে আছেন ব্যবসায়ী, রাজনীতিক ও সাংবাদিক। এই ১২টি চ্যানেল হলোঃ চ্যানেল ৫২, চ্যানেল ২১, আমার গান, উৎসব টিভি, ক্যাম্ব্রিয়ান টিভি, খেলা টিভি, আমার টিভি, সিটিজেন টিভি, প্রাইম টিভি, টিভি টুডে, স্টার নিউজ (পূর্বের নাম সাম্পান টিভি) এবং ঢাকা টিভি। ফ্রিকোয়েন্সি সুবিধা না পাওয়ার কারণে এই চ্যানেলগুলো এখনো সম্প্রচার শুরু করতে পারেনি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সাম্পান টিভির নাম পরিবর্তন করে স্টার নিউজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নথি মোতাবেক ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চ্যানেলের নাম পরিবর্তন ও প্রধান সম্প্রচার কেন্দ্র চট্টগ্রামের পরিবর্তে ঢাকায় স্থানান্তরের আবেদন করা হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৬ অক্টোবর এই আবেদন মঞ্জুর করে। এই কাজটি অনেকটা নীরবে সম্পন্ন হয় এবং পরে বিষয়টি তথ্য উপদেষ্টা ও তথ্যসচিবের গোচরীভূত হলে আগের অনুমতি স্থগিত করা হয়েছে বলে জানা যায়। ৫ আগস্ট অভ্যুত্থান-পরবর্তী গ্রিন টিভি ও গানবাংলা টিভি বন্ধ হয়েছে। সম্প্রচার সেবার বকেয়া মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারণে গত বছর ১৯ আগস্ট গ্রিন টিভি এবং ১১ ডিসেম্বর গানবাংলার সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

৪.২.১ আনুগত্য ও তোষণবাদিতা বনাম সম্প্রচার নীতিমালা

বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে অর্থনীতি ও বাজারের চাহিদা ও সক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় লাইসেন্স দিয়ে একটি নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। যদিও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪-এর ১.২.৯-এ বলা হয়েছে, ‘সম্প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠায় উন্মুক্ত ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা’। নীতিমালার শুরুতে ১.২.২-এ আরও বলা আছেঃ ‘সম্প্রচার মাধ্যমে মতপ্রকাশ ও সম্প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা এবং তথ্যের অবাধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা’ সরকারের লক্ষ্য। তবে লাইসেন্স প্রদানের প্রক্রিয়া কখনোই উন্মুক্ত প্রতিযোগিতাভিত্তিক ও স্বচ্ছ ছিল না।

টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপনের জন্য অনাপত্তিপত্র প্রদানের অধিকাংশ শর্ত সব সরকারের সময়ে অপরিবর্তিত থাকতে দেখা গেছে। তবে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে কিছু অতিরিক্ত শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, যার পেছনে স্পষ্টতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে। যেমন, ১৯৯৭ সালের ৭ জুলাই প্রথম টিভি চ্যানেল হিসেবে এটিএন বাংলাকে দেওয়া অনাপত্তিপত্রে সাধারণ কিছু শর্ত দেওয়া হয়, যেগুলো একটি চ্যানেল পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজন। কিন্তু মাস দুয়েক পরে ওই অনাপত্তিপত্রের সঙ্গে অতিরিক্ত দুটি শর্ত সংযুক্ত করা হয়। এর একটি হচ্ছেড়বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ছাড়াও সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতি, উন্নয়ন ও রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি পরিপন্থি কোনো অনুষ্ঠান রপ্তানি বা প্রচার করা যাবে না।

দ্বিতীয় শর্তটি হলো, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহ ও দিবস যেমন ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৭ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন/জাতীয় শিশু দিবসসহ ২১ ফেব্রুয়ারি, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও ধর্মীয় দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে টিভি চ্যানেলকে পালন করতে হবে। এই শর্ত দুটি শেখ হাসিনার প্রথম মেয়াদে লাইসেন্স পাওয়া চ্যানেল আই ও একুশে টিভির অনাপত্তিপত্রেও যুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার টিভি চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত দুটির মধ্যে প্রথমটি রেখে দ্বিতীয়টি বাদ দেয়। তবে বিএনপির জোট সরকার রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট নতুন কোনো শর্ত জুড়ে দেয়নি।

শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণের পর তথ্য মন্ত্রণালয় আবারও আগের শর্তটি অনাপত্তিপত্রে যুক্ত করে। এছাড়াও আওয়ামী লীগ সরকার বেশ কিছু নতুন শর্তও আরোপ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-টিভি চ্যানেলগুলোকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও নাশকতাবিরোধী প্রচারণা চালাতে হবে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে। অনাপত্তিপত্রগুলো যাচাই করে দেখা গেছে, বিগত দেড় দশকে শর্তের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে নতুন নতুন অনেক শর্ত, বিশেষ করে রাজনৈতিক শর্ত জুড়ে দিলে কোনো মিডিয়ার পক্ষে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতাচর্চা কঠিন। এমন শর্তের কারণেও অনেক চ্যানেল আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে বাধ্য হয়ে থাকতে পারে। লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে তাই এমন কোনো শর্ত জুড়ে দেওয়া উচিত না, যা তথ্যপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ করে এবং নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

সরকার প্রধানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের অঙ্গীকার

অন্যদিকে, অধিকাংশ আবেদনকারী চ্যানেল লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সরকারকে খুশি করতে তাদের পছন্দনীয় কথা আবেদনে উল্লেখ করেছেন। তাদের আবেদনপত্র ও অঙ্গীকারনামায় অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়, যা আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন ও কৌশলের সঙ্গে মিলে যায়। অর্থাৎ আবেদনপত্রেই তারা জানিয়ে দেন যে, অনুমোদন পেলে তারা সরকার ও তার রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা মেনে তা বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বা ভূমিকা রাখবে। যেমন, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি ও ব্যবসায়ী হারুন উর রশীদ এশিয়ান টিভির অনুমোদন পান। তিনি প্রথম আবেদন জমা দেন ২০০৮ সালে ১৩ অক্টোবর, যেখানে বিধিবিধান ও নিয়মকানুন মেনে চ্যানেল প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১১ সালের ৭ জুন তিনি আরেকটি আবেদনপত্র জমা দেন, যেখানে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণা বাস্তবায়নের অংশীদার হওয়ার জন্য' টিভি চ্যানেল স্থাপন করতে চান বলে উল্লেখ করেন। এমনিভাবে ইনডিপেনডেন্ট টিভির আবেদনে সালমান এফ রহমান ও নাজমুল হাসান পাপন আওয়ামী লীগ সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি দেন, বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোর্শেদুল আলমের মালিকানাধীন চ্যানেল ৫২ আবেদনে '২০২১ সালের রূপকল্প' বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয় এবং চ্যানেল ২১-এর আবেদনে 'ভিশন-২১ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কথা উল্লেখ করা হয়।

২০২২ সালে তিতাস টিভির মালিকানা বসুন্ধরা গ্রুপ কিনে নেয়। বর্তমানে এই চ্যানেলের নাম টি স্পোর্টস। তিতাস টিভির আবেদনপত্রে আবেদনকারী ধানাদ ইসলাম দীপ্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ একটি আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে' তার চ্যানেল ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমত কাদির গামা ২০২১ সালে চ্যানেল এস-এর লাইসেন্স চেয়ে যে আবেদনপত্র জমা দেন, সেখানে তিনি নিজেকে 'আওয়ামী লীগের একজন একনিষ্ঠ ত্যাগী কর্মী' হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়াও আবেদনপত্রে তিনি মুজিব শতবর্ষের লোগো ব্যবহার করেন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিরলসভাবে কাজ করে যাওয়ার কথা ঘোষণা দেন।

গ্লোবাল টিভির জন্য আবেদন করেন নোয়াখালী-৩ আসনের আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মো. মামুনুর রশীদ কিরণ। আবেদনপত্রে তিনি বলেন, 'চ্যানেলটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে উজ্জীবিত একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রচারে যেতে চায়।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, গোবাল টিভি চ্যানেলের অনুমতি দিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিনবদলের সহায়ক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে তারা অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

চ্যানেল নাইন-এর আবেদনপত্রে বলা হয়, "Our channel will highlight the development activity on the 'vision 2021', as part of pro-liberation force we will focus on the development activity of the

present government to build the digital Bangladesh.'' গ্রিন মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান সৈয়দ গোলাম দস্তগীর ২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর আবেদন করেন। আবেদনপত্রে তিনি 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়সহ ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নে গ্রিন টিভির মাধ্যমে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে চাই' বলে উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত অনেকে লাইসেন্স পেয়েছেন। অনেকে সরকারি পদে থেকেও আবেদন করে টিভি ও এফএম রেডিও চ্যানেলের লাইসেন্স পেয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতাদের পরিবারের সদস্যদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

মোট কথা, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারেন এমন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতাবানরাই চ্যানেলের লাইসেন্স পেয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন শাহরিয়ার আলম, ইসমত কাদির গামা, সালমান এফ রহমান, নাজমুল হাসান পাপন, কামাল আহমেদ মজুমদার, সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেন বাবু, আহমেদ জোবায়ের, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, হারুন-অর-রশীদ, সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ আরও অনেকে। দুরন্ত টিভির মালিক সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় এই টিভির লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছিলেন। সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী ২০১৩ সালের ২১ নভেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমাধ্যমবিষয়ক উপদেষ্টা থাকাকালীন তিনি ডিবিসি চ্যানেলের আবেদন করে মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে অনাপত্তিপত্র পেয়ে যান। একইভাবে কামাল আহমেদ মজুমদার, এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, হারুন-অর-রশীদ ও নাজমুল হাসান পাপন সংসদ সদস্য থাকার সময় আবেদন করে টেলিভিশনের লাইসেন্স পেয়েছেন। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলের আবেদন করা বিধিসম্মত না হলেও লাইসেন্স পেতে তাদের কোনো সমস্যা হয়নি। এভাবে রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মিডিয়ার মালিকানা লাভের কারণে ওই সব প্রতিষ্ঠানে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে সাংবাদিকতাচর্চার সুযোগই ছিল না। বরং তাদের মিডিয়ায় তারা নিজেদের ও সরকারের প্রচারণার কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অনেক উদাহরণ বিগত শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে দেখা গেছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় টিভির লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ম ভঙ্গ করে লাইসেন্স বিক্রির চিত্র উঠে আসে ২০১৩ সালের ২০ অক্টোবর প্রথম আলোয় প্রকাশিত এক খবরে। রাজনৈতিক বিবেচনায় চ্যানেল ৫২-এর অনুমোদন পাওয়ার কথা উল্লেখ করে ওই রিপোর্টে বলা হয়, আওয়ামী লীগের প্রয়াত নেতা আবদুল মালেক উকিলের ছেলে বাহারউদ্দিনের স্ত্রী খালেদা বাহার বিউটির নামে দেওয়া হলেও এর পেছনে ছিল বেঙ্গল গ্রুপের চেয়ারম্যান মোর্শেদুল আলম, যিনি ইতোমধ্যে মোসাদ্দেক আলীর মালিকানাধীন আরটিভি কিনে নিয়েছেন। বাহারউদ্দিন সে সময় বিটিভির উপপরিচালক (বার্তা)। এছাড়াও টিভি চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার আর্থিক সংগতি ছিল না তার । আবার সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে লাইসেন্স পেতেও পারেন না তিনি। তাই বেঙ্গল গ্রুপকে অর্থায়নকারী হিসেবে জোগাড় করেন এবং গঠন করেন 'বেঙ্গল টেলিভিশন চ্যানেল লিমিটেড' নামের একটি কোম্পানি। এই কোম্পানির নামেই চ্যানেল বায়ান্নর লাইসেন্স দেয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। মোর্শেদ আলম ও বাহারউদ্দিন উভয়ই তখন প্রথম আলোর কাছে এসব তথ্য স্বীকার করেন। রিপোর্টে আরও বলা হয়, লাইসেন্স মালিকদের বেশির ভাগেরই চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনার সক্ষমতা, এমনকি কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। অথচ হলফনামায় সবাই আর্থিক সামর্থ্য ও চ্যানেল প্রতিষ্ঠায় সক্ষমতার কথা বলেছেন। তাদের অনেকে লাইসেন্স নিয়ে পরে উচ্চমূল্যে মালিকানা বিক্রি করেছেন। আর এই পথে বিনা মূলধনে লাভবান হয়েছেন রাজনৈতিক বিবেচনায় পাওয়া অনেক টেলিভিশন চ্যানেল মালিক। অথচ বিক্রির আগে এমনকি সরকারের অনুমতিও নেননি তারা।

এভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে চ্যানেলের মালিকানা বদল, যথাসময়ে সম্প্রচারে আসতে না পারলেও লাইসেন্স বহাল থাকা এবং অর্থ উপার্জনের জন্য যার-তার কাছে শেয়ার বিক্রির কথা প্রথম আলোর কাছে স্বীকার করেন তখনকার তথ্যমন্ত্রী

হাসানুল হক ইনু। অনেক চ্যানেলের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। যেমন, মোজাম্মেল বাবু একাত্তর টিভির লাইসেন্স পাওয়ার পর অর্ধেক শেয়ার বিক্রি করে দেন মেঘনা গ্রুপের কাছে। একইভাবে আহমেদ জোবায়ের সময় টিভির লাইসেন্স বিক্রি করেন সিটি গ্রুপের কাছে। এভাবে তারা মোটা অঙ্কের মালিক হন এবং চ্যানেল স্থাপনের খরচও জোগাড় করেছেন। চ্যানেল নাইন-এর ৮৫ শতাংশ মালিকানা ২২ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয় এনটিভির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এনায়েতুর রহমানের কাছে। এই চ্যানেলের আবেদন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাঈদ শাফায়াতুল ইসলাম করলেও পরবর্তীতে এই টিভির অনাপত্তিপত্র দেওয়া হয় তার স্ত্রী সৈয়দা মাহবুবা আক্তারকে। মাহবুবা আক্তারের পাশাপাশি তার স্বামী, ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলের নামে ছিল শেয়ার। শাফায়াতুল ইসলাম আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের ভাই।

কিছুটা ভিন্নরকমের ঘটনা ঘটে বিজয় টিভির বেলায়। চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগের নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী এই টিভির লাইসেন্স নিয়েছিলেন ২০০৬ সালে। কিন্তু বিধিসম্মত না হওয়ায় মহিউদ্দিন চৌধুরীর নামে মামলা হয় গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। আওয়ামী লীগ সরকার নতুন করে লাইসেন্স দিলেও চালাতে না পেরে তিনি, তার স্ত্রী হাসিনা মহিউদ্দিন ও ছেলে চৌধুরী মহিবুল হাসানের কিছু শেয়ার টাকা ছাড়াই এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান ও তার স্ত্রী শেখ উর্মি রহমানের (ইভা রহমান) নামে লিখে দেন। অথচ মহিউদ্দিন চৌধুরী তার অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ করেন যে, নিজস্ব আয়, পরিচালকবৃন্দ ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের যৌথ বিনিয়োগ দ্বারা আর্থিক ব্যয় নির্বাহ করা হবে। তবে ২০১৩ সালে তাদের কাছ থেকে পুরো শেয়ার ফেরত নিয়ে নেয় মহিউদ্দিন চৌধুরীর পরিবার।

আর্থিক সামর্থ্য থাকার পরও বড় অঙ্কের ব্যাংক ঋণ নিয়ে চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে রয়েছে বেক্সিমকো গ্রুপ। সালমান এফ রহমানের এই কোম্পানি ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন স্থাপনে তিনশ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়েছে বলে জানা যায়। দেশ টিভির লাইসেন্স বিএনপির সাবেক কূটনীতিক ও সংসদ সদস্য মুশফিকুর রহমানের হলেও পরে সাবের হোসেন চৌধুরী ও আসাদুজ্জামান নূর এই চ্যানেলের কর্ণধার হন এবং বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়ে চ্যানেলটি স্থাপন করেন।

অনেকে আবার স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সংবাদ প্রচার ও রপ্তানির মাধ্যমে আর্থিক উপার্জন, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে পরোক্ষভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখার কথা বলেছেন, যা বাস্তবে খুব কমই ঘটেছে। কিছু চ্যানেল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্প্রচারে যেতে পারেনি, তারপরেও ওইসব চ্যানেলের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বা বিটিআরসি।

মিডিয়ার লাইসেন্স প্রদানের মধ্যে বড় ধরনের গলদ রয়েছে। একদিকে যেমন সরকার কিছু শর্ত জুড়ে দিয়ে মিডিয়াকে তার পক্ষে ব্যবহার করতে চেয়েছে, অন্যদিকে আবেদনপত্র ও অঙ্গীকারনামার নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাইসেন্সধারীরা অনেক শর্ত ভঙ্গ করেছেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বসুন্ধরা গ্রুপের নিউজ২৪, কামাল আহমেদ মজুমদারের মোহনা টিভিসহ অনেক চ্যানেলের আবেদনপত্রে তাদের সংবাদমাধ্যমে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার কথা বললেও বাস্তবে সেসব চ্যানেল বিপরীত ভূমিকা পালন করে। এভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নিজেদের প্রচারণা, বিকৃতভাবে তথ্য উপস্থাপন করে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হলেও সরকারের পক্ষ থেকে মনিটরিং করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এর পেছনের কারণ হচ্ছে, ওইসব মিডিয়ার মালিকরা সরকারের সঙ্গে যুক্ত বা আওয়ামী লীগের নেতা ও ব্যবসায়ী।

অন্যদিকে কোনো মিডিয়ার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সরকারের বিরুদ্ধে গেলে তাদেরকে নানানভাবে হেনস্তা করার খবর পাওয়া গেছে। এছাড়াও কাগজপত্রে আবেদনকারীরা মৌলিক, সৃষ্টিশীল, স্বকীয়তা বজায় রেখে সংবাদ ও অনুষ্ঠান তৈরি, শিক্ষার প্রসার, শিল্প-সাহিত্যের বিকাশসহ অনেক কথা উল্লেখ করলেও সম্প্রচারে যাওয়ার পর তা ভুলে গেছেন। বিভিন্ন চ্যানেলের আবেদনপত্র যাচাই করে দেখা গেছে, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে অনেকগুলো চ্যানেলকে লাইসেন্স প্রদান

করা হয়। আবেদনপত্রের সাথে অনেক ধরনের কাগজপত্র যেমন ট্রেড লাইসেন্স, কোম্পানির নথি, আয়কর প্রত্যয়নপত্র, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও অঙ্গীকারনামা দেওয়ার কথা। এসব নথিপত্র যাচাই করা সময় সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ৩/৪ দিনের মধ্যে অন্তত ৭টি চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়ার নজির থেকে বোঝা যায় যে, এসব আবেদনপত্র যাচাই না করে রাজনৈতিক বিবেচনায় লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বেশকিছু অঙ্গীকারনামার ভাষা প্রায় একই রকম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেগুলোয় হুবহু মিল রয়েছে।

৪.২.২ সম্প্রচার কমিশন গঠনে অনীহা

২০১৪ সালের সম্প্রচার নীতিমালায় একটি স্বাধীন সম্প্রচার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিশন অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ করবে এবং সেই নীতিমালার ভিত্তিতে সম্প্রচার কমিশন লাইসেন্স প্রদানের জন্য সরকারকে সুপারিশ করবে। তবে আওয়ামী লীগ সরকার সেই কমিশন গঠন করেনি এবং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪-এর তৃতীয় অধ্যায়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান সম্প্রচার উপশিরোনামে অনুসরণীয় মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে ৩.১.১-এ অনুসরণীয় মানদণ্ডে যে তিনটি বিষয়ের আবশ্যিকতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো: ক. সম্প্রচারিত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা; খ. পেশাগত নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা; এবং গ. সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা। পরে আরও বলা হয়েছে, ৩.২.২-এ 'আলোচনামূলক অনুষ্ঠানে কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য-উপাত্ত দেওয়া পরিহার করতে হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে সব পক্ষের যুক্তিসমূহ যথাযথভাবে উপস্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে।'

বিগত স্বৈরশাসনে সরকার তার ঘোষিত নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যেমন মনে রাখেনি, তেমনই অনুসরণীয় মানদণ্ড পুরোপুরি পরিত্যাগ করেছে। বরং দলীয় অনুগত মালিক ও সাংবাদিকদের উৎসাহিত করেছে তথ্য বিকৃতি, অপপ্রচার, ক্ষমতাসীনদের পক্ষে একতরফা প্রচার, বিরোধীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার, সমালোচনা বন্ধ এবং সরকার বিব্রত হয় বা তার বিরুদ্ধে যায় এমন খবর প্রচার বন্ধ রাখতে। এসব কাজে রাজনৈতিক চাপের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনো মৌখিক, কখনো লিখিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, ভীতি প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে সন্তুষ্ট রাখার পরিণতিতে বেসরকারি চ্যানেলগুলো তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। তবে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সমিতি অ্যাটকো কমিশনের কাছে পেশ করা বক্তব্যে বলেছে, 'সরকার ও বিরোধী দল, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর চাপের কারণে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।'

এসব চ্যানেল 'আরেকটি বিটিভি' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। দর্শকেরা বিদেশি চ্যানেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। পরিচালন ব্যয় মেটানোর জন্য রাজস্ব হিসেবে বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীলতা এতটাই বেড়েছে যে, এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় কে কার চেয়ে কম দামে বিজ্ঞাপন প্রচার করবে, সেই লড়াই চলছে। সংবাদ শিরোনাম থেকে শুরু করে খবরের বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞাপনদাতাদের স্পন্সরশিপের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে, যে প্রতিষ্ঠানের নামে সংবাদ শিরোনাম দেওয়া হয়, সেই প্রতিষ্ঠানের কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য খবরে স্থান পায় না। অথচ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪-তে বলা আছে, সংবাদ আকারে এবং কোনো অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে বিজ্ঞাপন প্রচার থেকে বিরত থাকতে হবে। খবর ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানেও বিজ্ঞাপন প্রচারের বেলায় কোনো নীতিমালা কার্যকর আছে বলে মনে হয় না। প্রতি ঘণ্টায় সাধারণভাবে ১২ মিনিটের বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার না করার নিয়ম থাকলেও তা প্রায়ই মানা হয় না। অধিকাংশ অনুষ্ঠানেই এখন বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকের লোগো বা পণ্যের নাম স্থায়ীভাবে পর্দায় স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় বেসরকারি টেলিভিশনগুলো এখন তাদের ডিজিটাল মিডিয়া থেকে আয় বাড়ানোর দিকে মনোযোগী হয়েছে।

ব্যবসায়িক দিক থেকে অনেক চ্যানেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। ভর্তুকি দিয়ে অথবা ব্যাংক ঋণের ওপর নির্ভর করে চ্যানেল পরিচালনার প্রবণতাও প্রকট। যারা ভর্তুকি দিচ্ছেন, তারা তা দিচ্ছেন হয় রাজনৈতিক স্বার্থে, নয়তো অন্য কোনো ব্যবসায়িক স্বার্থে গণমাধ্যমের ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে। বিগত দুটি নির্বাচন-নামীয় প্রহসনের

(২০১৮ ও ২০২৪) সময়ে একাধিক চ্যানেলের মালিক ব্যক্তিগত নির্বাচনী প্রচারে নিজস্ব মালিকানাধীন চ্যানেলকে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এবং নিজের পক্ষে দৃষ্টিকটু ও অসমভাবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বিপরীতে, এসব চ্যানেলের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই সাংবাদিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা অনিয়মিত। অল্পকিছু সাংবাদিক বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্বল্পবেতনে কাজ করতে বাধ্য হন। সম্প্রচারমাধ্যমের জন্য সংবাদপত্রের ওয়েজ বোর্ডের মতো কোনো আলাদা বেতন কাঠামো নেই। সবচেয়ে বেশি অভিযোগ যেটি পাওয়া গেছে, তা হলো চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং শ্রম আইনের প্রতি অবজ্ঞা। কোনো ধরনের কারণ দর্শানোর সুযোগ না দিয়ে যখন-তখন চাকরিচ্যুতি, সপ্তাহে সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টার নিয়ম না মানা, প্রশিক্ষণ ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম না দেওয়া, কর্মস্থলে নারীদের যৌন হয়রানি বন্ধ ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা না করার সমস্যার বিশদ বিবরণ মেলে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার (বিজেসি)-এর সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে দেশের টেলিভিশনগুলোয় কর্মরত ১৫০ জনের বেশি সাংবাদিককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও ৪৮ শতাংশের বেশি টেলিভিশনে চাকরিচ্যুতির সুবিধা দেওয়া হয় না। অর্ধেকেরও কম টেলিভিশন চ্যানেল তাদের কর্মীদের সময়মতো বেতন দেয়। ২০ শতাংশ টেলিভিশনে কর্মীদের বেতন দুই থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত বকেয়া রেখে (এরিয়ার) দেওয়া হয়। ৩৫ শতাংশ টেলিভিশনে বেতন অনিয়মিত এবং ভেঙে ভেঙে পরিশোধ করা হয়। ৮২ শতাংশ টেলিভিশনে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি নেই। মাত্র প্রায় ২০ শতাংশ চ্যানেলে স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা দেয়। জীবনবিমা নেই ৭২ শতাংশের। প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা প্রায় ৯০ শতাংশ টেলিভিশনেই নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে প্রায় এক-চতুর্থাংশ চ্যানেলে, আর ১০ শতাংশ চ্যানেল গ্র্যাচুইটি সুবিধা দিয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিকে অনেকে পোশাকশিল্পের শ্রমিকদের সঙ্গে তুলনা করে বলে থাকেন যে, পরিহাসের বিষয় হলো পোশাক শ্রমিকদের বেতন-ভাতা ও অধিকার আদায়ের খবর যারা প্রচার করে, তারা নিজেদের অধিকারের কথা প্রকাশ করতে পারে না।

৪.২.৩ সম্প্রচার নীতিমালা এবং সাংবাদিকতার স্বাধীনতা

২০১৪ সালের সম্প্রচার নীতিমালা কার্যত সাংবাদিকতার স্বাধীনতাকে মারাত্মকভাবে সংকুচিত করেছে এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনৈতিক আদর্শের প্রচার ও প্রসারে বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে। 'সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়' উপশিরোনামের শুরুতেই 'জাতীয় আদর্শ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কোনো প্রকার ব্যঙ্গ বা বিদ্রুপ' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যেকার সীমারেখা মুছে ফেলে সরকার সম্প্রচার নীতিমালায় 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন ধরনের সামরিক, বেসামরিক বা সরকারি তথ্য প্রচার' নিষিদ্ধ করেছে।

একইভাবে, 'কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের অনুকূলে এমন ধরনের প্রচারণা যা বাংলাদেশ ও সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে কোনো একটি বিষয়কে প্রভাবিত করতে পারে অথবা একটি বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন ধরনের প্রচারণা যার ফলে সে রাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হতে পারে এমন দৃশ্য বা বক্তব্য প্রচার করা যাবে না'-এই শর্ত আরোপের ফলে বস্তুনিষ্ঠ বিতর্ক ও ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর প্রভাবে, দেশের সীমান্তে সংঘটিত প্রাণহানির ঘটনা বা ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য প্রচার করাও বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এমনকি বিদেশি ঋণের শর্তগুলোর তুলনামূলক আলোচনাও এই বিধানে অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে।

৪.২.৪ ভৌতিক টিআরপি

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন, যা ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে সংবাদপত্রের মতো এই চ্যানেলগুলোয় সরকারি বিজ্ঞাপনের উপস্থিতি প্রায় নগণ্য। সম্পূর্ণটাই বেসরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল। বেসরকারি বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো দর্শকসংখ্যা। দর্শকসংখ্যা কেবল একটি সাধারণ সংখ্যা নয়, বরং এর মধ্যে জটিল অনেক বিষয় নিহিত। দর্শকদের বয়স, লিঙ্গ, দেখার সময়, পছন্দের অনুষ্ঠান, আঞ্চলিক জনপ্রিয়তা ইত্যাদি বিবিধ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনদাতাদের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়। দর্শকদের এই প্রবণতাগুলো শনাক্ত করে বিশ্লেষণ ও সংকলনের পদ্ধতিটিই হলো টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট বা টার্গেট রেটিং পয়েন্ট (টিআরপি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
টিভি-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moi.gov.bd

মুজিব MUJIB 100

স্মারক নম্বর-১৫.০০.০০০০.০২৪.২২.০০১.২০- ৪৮

তারিখঃ ১১ মাঘ ১৪২৮ / ২৫ জানুয়ারি ২০২১

বিষয়ঃ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিঃ (বিএসসিএল) কর্তৃক 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সেবা প্রদান সংক্রান্ত।

সূত্রঃ (১) বিএসসিএল এর ০২ নভেম্বর ২০২১ তারিখের ১৪.৩৯.০০০০.০০৩.৯৯.০৪৭(অংশ-৩).২১.৫১৯ সংখ্যকপত্র।
(২) বিএসসিএল এর ১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের ১৪.৩৯.০০০০.০০৩.৯৯.০৪৭(অংশ-৩).২১.০২৮ সংখ্যকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রদ্বয়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিঃ (বিএসসিএল) কর্তৃক 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সেবা প্রদানের বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে নিম্নোক্ত শর্তে নীতিগত সম্মতি প্রদান করা হলো:

(ক) বিএসসিএল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে টেলিভিশন কোম্পানির সাথে MoU স্বাক্ষর করবে;

(খ) MoU স্বাক্ষরের ০২(দুই) মাসের মধ্যে বিএসসিএল টিআরপি কার্যক্রম শুরু করবে;

(গ) শুরুতে ন্যূনতম ২০০০ ডিভাইস/সেটটপ বক্স দিয়ে কার্যক্রম শুরু করতে হবে, ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি করে ৬(ছয়) মাসের মধ্যে ডিভাইস/সেটটপ বক্সের সংখ্যা ৮০০০-এ উন্নীত করতে হবে;

(ঘ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে; এবং

(ঙ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সংক্রান্ত কমিটি 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সেবা প্রদান সংক্রান্ত টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্থাৎ কোন্ কোন্ criteria'র ভিত্তিতে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসমূহ রেটিং করা হবে, এর জন্য প্রয়োজ্য ফি এর পরিমাণ এবং কত মেয়াদকালের জন্য বিএসসিএল 'টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট' (টিআরপি) সেবা প্রদান করবে তা নির্ধারণ করবে।

(শেখ শামছুর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৫৫০১৭
ই-মেইলঃ tv2@moi.gov.bd

চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিঃ (বিএসসিএল)
১১৬, কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২০৫।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, আইইবি ভবন (৫, ৬ এবং ৭ ফ্লোর), রমনা, ঢাকা-১০০০।
০২। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য]।
০৩। সভাপতি, Association of TV Channel Owners (ATCO), কর্ণফুলী মিডিয়া পয়েন্ট (লেভেল-৩), ৪২, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭।
০৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য]।

F:\TV-2\letter\GLetter.docx (46)

পূর্বে বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এই টিআরপি নির্ধারণ করত। কিন্তু ২০২২ সালের জানুয়ারিতে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) টিআরপি সেবা প্রদানের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব জমা দেয়। এরপর মন্ত্রণালয় নীতিগতভাবে একটি সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করে। অংশীজনদের

প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটি সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং ওই বছরের ২৭ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় ২০২৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত টিআরপি সেবা প্রদানের প্রস্তুতির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। ৪ জানুয়ারি এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করা হয়, যেখানে ন্যূনতম ৫০০টি সেট-টপ বক্স স্থাপনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করার শর্ত দেওয়া হয়।

পরবর্তী সময়ে ২৫ জানুয়ারির আরেকটি নির্দেশনায় বলা হয়, বিএসসিএল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে টেলিভিশন কোম্পানিগুলোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের দুই মাসের মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করতে হবে। শুরুতে ন্যূনতম ২০০০টি ডিভাইস/সেট-টপ বক্স দিয়ে কাজ শুরু করতে হবে এবং ছয় মাসের মধ্যে এর সংখ্যা ৮০০০-এ উন্নীত করতে হবে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে কমিশনের অনুসন্ধানে জানা যায়, বিএসসিএল তখন পর্যন্ত মাত্র ২০০টি ডিভাইস/সেট-টপ বক্স দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলতি মার্চে সেটটপ বক্সের সংখ্যা ৩০০ হয়েছে বলে কমিশনকে জানানো হয়েছে। একুশে টিভির সঙ্গে বিএসসিএলের সম্পাদিত চুক্তির কপি পরীক্ষা করে কমিশন দেখেছে যে, ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর স্বাক্ষরিত ওই চুক্তিতে ৫০০টি ডিভাইস দিয়ে সেবাদান শুরুকে প্রথম পর্যায় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৬৮টি ডিভাইস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় কখন শুরু হবে, তা চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। স্পষ্টতই সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ৫০০টি ডিভাইস স্থাপন না করেই চুক্তিটি করা হয়েছে এবং চুক্তিতে অসত্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। টিআরপি সেবার জন্য কোম্পানিটি মাসিক ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে ফি নেবে এবং শুরুতে জামানত হিসেবে তিন মাসের ফি, অর্থাৎ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা জমা দিতে হয়েছে।

এত অল্পসংখ্যক ডিভাইসের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। উপরন্তু, বিএসসিএলের কর্মকর্তারা স্বীকার করেছেন যে এই নগণ্য সংখ্যক ডিভাইসগুলোর সব সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকে না। স্পষ্টতই রাষ্ট্রায়ত্ত একটি প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য সেবার ফলাফল এই শিল্প ও বিজ্ঞাপনদাতাদের কোনো কাজেই আসেনি। বরং যেভাবে টিভি চ্যানেলগুলোর কাছ থেকে নিম্নমানের ও অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেবাগ্রহীতাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। বর্তমানের এই ত্রুটিপূর্ণ টিআরপি ব্যবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য টিভি চ্যানেল ও বিজ্ঞাপনশিল্পের প্রতিনিধিদের কার্যকর উপায় নির্ধারণ করা জরুরি।

৪.২.৫ কেবল অপারেটর ও ডিটিএইচ ব্যবস্থা

টেলিভিশন অনুষ্ঠান দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর ভূমিকা বর্তমানে বিশেষভাবে আলোচিত। এই গোষ্ঠীটি হলো ক্যাবল অপারেটর ও ডিরেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। তারা নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে দর্শকদের কাছে টেলিভিশন অনুষ্ঠান সরবরাহ করে এবং বিনিময়ে মাসিক ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি আদায় করে। তবে, কোনো টেলিভিশন চ্যানেলই তাদের কাছ থেকে সরাসরি কোনো অর্থ পায় না। ক্যাবল ও ডিটিএইচ অপারেটররা কেবল তাদের লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়নের জন্য সরকারকে এককালীন এবং বার্ষিক নবায়ন ফি প্রদান করে থাকে। কেবল অপারেটর সমিতির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন তারা প্রায় দেড় কোটি গ্রাহককে সেবা দিচ্ছেন। আর ডিটিএইচ সেবার ক্ষেত্রে সিংহভাগ গ্রাহক হচ্ছে বেক্সিমকোর আকাশ সেটটপ বক্সের, যার সংখ্যা তাদের হিসাবে ছয় লাখ।

অনুষ্ঠান নির্মাতারা তাদের সৃজনকর্মের জন্য কোনো অর্থ পাবেন না, কিন্তু সেই সৃজনকর্ম বিতরণব্যবস্থায় জড়িত তৃতীয় পক্ষ তা বিক্রি করে শত শত কোটি টাকা আয় করবেন, এমন নজির দ্বিতীয় কোনো দেশে পাওয়া যাবে না। আবার ডিটিএইচ ব্যবসার লাইসেন্সও কোনো স্বচ্ছ ও উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে না দিয়ে, তা দেওয়া হয়েছে নেপথ্যের বোঝাপড়ায়। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে একই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মালিকানায় ডিটিএইচ সেবা এবং টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) বিবেচিত হয়নি। এই দুটি গ্রুপ হচ্ছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কিত বেক্সিমকো গ্রুপ এবং মোহাম্মদি গ্রুপ। বেক্সিমকো গ্রুপের মালিকানায় আছে ইনডিপেনডেন্ট টিভি ও আকাশ সেটটপ বক্স, আর মোহাম্মদি গ্রুপের মালিকানায় নাগরিক টিভি ও জাদু ডিজিটাল। বেক্সিমকো গ্রুপের প্রধান শেখ হাসিনার বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, আর মোহাম্মদি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা উত্তরের সাবেক মেয়র আনিসুল হক।

কেবল অপারেটররা জানিয়েছেন, অনুষ্ঠান বিতরণ ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন হলে তারা টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর দর্শকসংখ্যা ও জনপ্রিয়তার ওপর ভিত্তি করে ন্যায্য পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে প্রস্তুত। ডিটিএইচ অপারেটররাও একই মতামত প্রকাশ করেছেন। তারা ডিজিটাইজেশনের দায়িত্ব বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল)-এর ওপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করেছেন। এই প্রক্রিয়াটি মূলত তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং ভূমিকার ওপর নির্ভরশীল। তবে কিছু বিশেষজ্ঞের মত হচ্ছে, ডিটিএইচ ও কেবল অপারেটররাও নিজস্ব বিনিয়োগে ডিজিটাইজেশন করতে পারেন।

কেবল ও ডিটিএইচ অপারেটররা তাদের লাইসেন্সের কিছু শর্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। স্থানীয় পর্যায়ে পুলিশ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসনের বিভিন্ন ঘোষণা প্রচারে বাধ্যবাধকতা তাদের জন্য প্রায়শই জটিলতা সৃষ্টি করে। এছাড়া ডিটিএইচ পরিষেবা প্রদানকারী তিনটি প্রতিষ্ঠান অধিকসংখ্যক বিদেশি চ্যানেল সম্প্রচারের বাড়তি সুবিধা পাওয়ায় কেবল অপারেটররা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন।

এসব চ্যানেলের অনুষ্ঠান বিতরণব্যবস্থায় যোগ হয়েছে বিদেশি মালিকানাধীন মোবাইল ফোন অপারেটর বাংলালিংকের টফি অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে প্রায় সব চ্যানেলের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। কেবল অপারেটররা অভিযোগ করেছেন টফি অ্যাপের কারণে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। টফি অ্যাপে মোবাইলে দেশ-বিদেশের অসংখ্য চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখা যায়। তবে টফি অ্যাপের প্যাকেজ বিক্রির মাধ্যমে বাংলা লিংক বাড়তি আর্থিক সুবিধা পেলেও সরকার তা থেকে কোনো লাভ পায় না। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর অনুসন্ধানের জবাবে জানা গেছে, টফি অ্যাপের অনুমোদনের জন্য সরকারও কোনো রাজস্ব পায় না। তাছাড়া টফি অ্যাপের অনুমোদনও কোনো প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঘটেনি।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
প্লট#ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ
www.btrc.gov.bd

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১৪.৩২.০০০০.০০০.৬০০.৩২.০০০২.১৯.৩১৩

বিষয়: বাংলালিংক এর টফি অ্যাপস সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।
সূত্র: গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এর পত্র নং: ১৫.০০.০০০০.০১৯.৩১.০০১.২৪-১৪১, তারিখ: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের মাধ্যমে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের চাহিত তথ্যের বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ এর অনুকূলে OTT, VOD and Streaming Service এর জন্য Toffee প্লাটফর্ম নিম্নলিখিত শর্ত সমূহ সাপেক্ষে পরিচালনার অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছেঃ

শর্তসমূহঃ

(১) OTT, VOD and Streaming Service Toffee প্লাটফর্ম পরিচালনার ০১ (এক) বছরের জন্য অনাপত্তি প্রদান করা হলো। এই অনাপত্তি পরবর্তী নবায়নের ক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিনের পূর্বের প্রতিবেদনসহ আবেদন করতে হবে।

(২) Toffee প্লাটফর্মের সকল কনটেন্টের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/সংস্থার প্রযোজ্য নীতিমালা/নির্দেশনা/নির্দেশিকা/আইন/বিধিবিধান মেনে চলতে হবে।

(৩) Toffee প্লাটফর্মে যেন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক উস্কানিমূলক, সমাজ বা রাষ্ট্র বিরোধী কিছু না থাকে বা সমাজের অবক্ষয় হয় এমন কিছু যেন না থাকে তা বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ নিশ্চিত করবে এবং এর ব্যত্যয় হলে বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ এর সকল দায়ভার বহন করবে।

(৪) এই অনাপত্তিপত্রে উল্লেখিত শর্তাবলীসহ এ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা যখনই জারী করা হোক না কেন, তক্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার প্রতিটি শর্ত Toffee প্লাটফর্মের অনাপত্তি প্রাপ্তির তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে প্রযোজ্য হবে।

(৫) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, জনস্বাস্থ্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতীয় নিরাপত্তা, আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ইত্যাদির বলে এই অনাপত্তিপত্র কোন প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই সময়ে সময়ে প্রত্যাহার, সংশোধন, হালনাগাদকরণ, পুনর্নিরীক্ষা করার এখতিয়ার কমিশনের থাকবে।

(৬) কমিশন প্রয়োজনবোধে এই অনাপত্তিপত্র বাতিল বা এই অনাপত্তিপত্রের যেকোন শর্ত বাতিল/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন বা সংযোজন করতে পারবে।

২। বিষয়টি আপনার অবগতি ও পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

০৫-০৩-২০২৫
মোছাঃ রুবিনা খাতুন, খাতুন
সিনিয়র সহকারী পরিচালক

কমিশন প্রধান
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন, তথ্য ভবন, ১১০, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
জনাব কাজী জিয়াউল বাসেত, উপ সচিব, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন তথ্য ভবন, ১১০, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।

তারিখ: ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১৪.৩২.০০০০.০০০.৬০০.৩২.০০০২.১৯.৩১৩/১ (১)

অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (ইহা চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

০৫-০৩-২০২৫
মোছাঃ রুবিনা খাতুন, খাতুন
সিনিয়র সহকারী পরিচালক

ডিটিএইচ এবং কেবল অপারেটররা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইভস্ট্রিমিং সেবার বিষয়টিতেও দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন। এসব লাইভস্ট্রিমিং সার্ভিসের কারণে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জানিয়ে তারা বলেন যে আইএসপি সেবার নিয়ন্ত্রক হচ্ছে বিটিআরসি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়। কিন্তু ডিটিএইচ এবং কেবল অপারেটররা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত। এখানে একধরনের সমন্বয়হীনতা তৈরি হয়েছে। টিভি ও ডেটা/ ইন্টারনেট সেবা একসঙ্গে দেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত বলেও মতামত এসেছে।

৪.৩ অনলাইন নিউজ পোর্টাল

প্রযুক্তির প্রসার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সাংবাদিকতার জগতে ২০১০ সালের পর দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। পাঠক-দর্শক ক্রমশ ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সবকিছু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। ফলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে একদিকে দেশের সংবাদমাধ্যমগুলো অনলাইন সংস্করণ চালু করতে বাধ্য হয়, অন্যদিকে নতুন নতুন অনেক অনলাইনভিত্তিক নিউজ পোর্টালের আবির্ভাব ঘটে।

দেশে কত অনলাইন নিউজ পোর্টাল আছে, এর সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। তবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একটি হিসাব থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। সরকার অনলাইন পোর্টালগুলোর জন্য ২০১৭ সালে একটি নীতিমালা ঘোষণা করে, যা ২০২০ সালে পুনরায় সংশোধন করা হয়। এই নীতিমালায় অনলাইন পোর্টালসমূহের জন্য জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রতিপালনেরও বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। অনলাইন নীতিমালায় অনলাইন গণমাধ্যমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে হোস্টিংকৃত বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইন্টারনেটভিত্তিক রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র বা ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি ও লেখা বা মাল্টিমিডিয়ার অন্য কোনো রূপে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ বা সম্প্রচারকারী বাংলাদেশি নাগরিক বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে।

আইনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হিসেবে যেসব বিষয়ের উল্লেখ আছে তার মধ্যে আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা নির্দেশনার ছাপ পাওয়া যায়। এরকম একটি দফায় বলা হয়েছে, 'জনস্বার্থ, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যাতে অনলাইন গণমাধ্যম সেবাদানকারী কর্তৃক তথ্য ও উপাত্ত প্রকাশ হয় তা নিশ্চিতকরণ।' এরকম আরেকটি আরোপিত শর্ত হচ্ছে, 'সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ নির্মূল ও প্রতিরোধে সহায়তা করা।' রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের তকমা লাগানোর বহুল ব্যবহৃত রাজনৈতিক কৌশলের কারণে এই নীতি অনুসরণের বিষয়টি সরকারের উদ্দেশ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এছাড়া এই নীতিমালা প্রণয়নের অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল, 'নিবন্ধন প্রদানের মাধ্যমে সকল অনলাইন গণমাধ্যমকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় আনয়ন করা।' নিবন্ধনের কাজটি তৎকালীন সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের ওপর ন্যস্ত করার কথা বলা হলেও সেই কমিশন সরকার গঠন করেনি। বরং নিবন্ধন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের হাতে রেখে দেওয়া হয়।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অনলাইন পোর্টালের মালিক-সম্পাদকদের প্রতিনিধিরা এই নিবন্ধন প্রক্রিয়ার কিছু শর্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্রের বিষয়টি পুলিশি তদন্তের বাইরেও দেশের অন্যান্য নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্তের ওপর নির্ভরশীল করে ফেলা। এছাড়া উচ্চহারে নিবন্ধন ফি ও বার্ষিক নবায়ন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। অনল্যাইন পোর্টালের জন্য প্রতিবছর নিবন্ধন নবায়নের বাধ্যবাধকতা আরোপকেও অযৌক্তিক ও হয়রানিমূলক বলে তারা দাবি করেছেন। প্রকৃতপক্ষেই একটি পোর্টালকে কেন প্রতিবছর নিবন্ধন নবায়নের সরকারি আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হবে, তা মোটেও স্পষ্ট নয়। অনলাইন পোর্টালগুলো কোনো ধরনের সরকারি বিজ্ঞাপন বা পৃষ্ঠপোষকতা পায় না, যেমনটি সংবাদপত্র পেয়ে থাকে।

এই নীতিমালায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সংকোচনমূলক একটি নির্দেশনা হচ্ছে, আইপি টিভি ও অনলাইন রেডিওর সংবাদ প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা। যেখানে অনলাইন পোর্টালে লিখিত আকারে খবর বা প্রতিবেদন এবং সংবাদভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা যায়, সেখানে সংবাদ প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা কতটা যৌক্তিক? বিশেষত, অনলাইন পোর্টাল যখন সংবাদ, অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন প্রচারে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ অনুসরণে বাধ্য এবং সম্প্রচার কমিশন তার নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ২১৩টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও ১৯৬টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে তথ্য মন্ত্রণালয় নিবন্ধন দিয়েছে। দৈনিক পত্রিকার মধ্যে ঢাকাকেন্দ্রিক ছাড়াও কিছু আঞ্চলিক পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকেও নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের হিসাবমতে, নিবন্ধিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের অনলাইন পোর্টালের সংখ্যা ১৭টি। এছাড়াও নিবন্ধনের জন্য আরও কয়েক হাজার আবেদন জমা পড়েছে বলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

ভুয়া সংবাদ ও দেশবিরোধী প্রচারণা বন্ধের কথা বলে সরকার ২০২০ সালে অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিবন্ধন করার নিয়ম বেঁধে দেয়। মূলত গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে ২০২১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট অনিবন্ধিত সব সংবাদ পোর্টাল বন্ধের জন্য সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশনকে নির্দেশ দেয়।

২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জাতীয় সংসদে জানান, নিবন্ধনের আওতায় এনে সরকারিভাবে নজরদারি বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। দেশের অনিবন্ধিত কোনো অনলাইন সংবাদপত্র বা অনলাইনভিত্তিক পোর্টালে দেশবিরোধী সংবাদ প্রচার বা মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রচারের অভিযোগ পাওয়া গেলে তা বন্ধের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি সংসদকে জানান।

তবে অনলাইন নিউজ পোর্টালের নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও শুরু থেকে আওয়ামী লীগ সরকার অনেক অনিয়ম করেছে। এক্ষেত্রেও দলীয় বিবেচনায় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অনেকের পোর্টালকে নিবন্ধিত করা হয়। দলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ ঘরানার অনেক ব্যক্তিকে নিবন্ধন দেওয়া হলেও মূলধারার গণমাধ্যমকে বঞ্চিত করা হয়। মূলধারার কিছু মিডিয়া আবেদন করলেও এই তালিকায় তাদের নাম ছিল না, বরং নামসর্বস্ব অনেক পোর্টালের নাম দেখা যায়। তবে পরবর্তীতে মূলধারার মিডিয়ার অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোকেও নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে।

দলীয় বিবেচনায় আওয়ামী লীগের যাদের পোর্টাল নিবন্ধন দেওয়া হয় তাদের মধ্যে রয়েছেন-সাবের হোসেন চৌধুরীর দিনেরশেষে ডটকম, মহিবুল হাসান চৌধুরীর দেশেরভিউ ডটকম, বিদ্যুৎ বড়ুয়ার সারাদিন ডটনিউজ, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার স্টার সংবাদ ডটকম, ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীর মেঠোপথ ডটকম, চৌধুরী নাফিজ সরাফাতের নিউজবাংলা টোয়েন্টিফোর ডটকম, অপু উকিলের পানকৌড়িনিউজ ডটকম, মহিউদ্দিন খান আলমগীরের কারেন্টনিউজ ডটকম ও সাংবাদিক শামিমা দোলার নিউজনাউ বাংলা ডটকম, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নুহ উল আলম লেনিনের উত্তরণবার্তা ডটকম, জাতীয় প্রেস ক্লাবের তখনকার সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিনের উইমেনআই ডটকম, সাংবাদিক আব্দুল মজিদের ঢাকাডিপ্লোমেট ডটকম প্রমুখ।

ইতোমধ্যে দেশে স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি ও ইন্টারনেটের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক বেশি অনলাইনমুখী হয়েছে। সবকিছু তারা দ্রুত পড়তে চায় ও জানতে চায়, যা অনলাইন নিউজ পোর্টালের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব। প্রচলিত মূলধারার মিডিয়ার পক্ষে সে চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। একই সঙ্গে ফেসবুক ও ইউটিউব ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দৈনন্দিনের সব খবর এইসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা শুরু হয়। এসব কারণে তথ্য পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে ওঠে অনলাইন গণমাধ্যম। ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাতে থাকে অনলাইন নিউজ পোর্টাল। বর্তমানে এই সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে অনেকে মনে করেন। অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে

সংবাদ বা তথ্য পাওয়ার সুযোগ যেমন সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে ভুয়া তথ্য, অপতথ্য বা গুজব ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যের চাপে বস্তুনিষ্ঠতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখাও কঠিন হয়ে পড়ছে। তবে শুধু ওই অনলাইন পোর্টাল নয়, দেশের প্রথম সারির অনেক গণমাধ্যমের অনলাইন সংস্করণেও ফেইক নিউজ, বিভ্রান্তিকর ও ক্লিকবেইট সংবাদ প্রকাশিত হয়। অনলাইনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা বাড়তে দেখা গেছে। সরকার, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় গোষ্ঠী, সাংবাদিকসহ সমাজের প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত হচ্ছে। এ ধরনের অনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক অনলাইন পোর্টাল।

সব মিলিয়ে, অগণিত অনলাইন নিউজ পোর্টালের আবির্ভাব সৎ, নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে বড় এক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। অনলাইন সংবাদ পোর্টালে কর্মরত সংবাদকর্মীরা অভিযোগ করেছেন, তাদের চাকরি এবং বেতনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিয়মনীতির বাধ্যবাধকতা নেই। সংবাদপত্রের বেতন কাঠামো যেমন মানা হয় না, তেমনই চাকরির শর্ত বা কাজের পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রের অধিকারগুলোর প্রশ্নে শ্রম আইন একেবারেই মানা হয় না। অনলাইন পোর্টালের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বা মিলকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ এসেছে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের কাছ থেকে, যাঁরা বলেছেন, সাংবাদিকের পরিচয়পত্র বিক্রি কারো কারো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। বিনা বেতনে শিক্ষানবিশ হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কিছুদিন পরই তাদের পরিবর্তে নতুন কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিকার পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রেও তারা সবসময়ে উপেক্ষিত হন বলে অভিযোগ করেছেন। প্রস্তাব এসেছে একটি অভিন্ন সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালার, যা পত্রিকা, টিভি, রেডিও, অনলাইন সবার বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

দেশে যে কয়টি অনলাইনভিত্তিক নিউজ পোর্টাল রয়েছে তার মধ্যে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম অন্যতম। ২০০৫ সালে ওয়েবভিত্তিক বার্তা সংস্থা হিসেবে এর যাত্রা শুরু। বিডিনিউজ বাংলাদেশের প্রথম অনলাইনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম। এছাড়াও প্রথম সারির অন্য পোর্টালের মধ্যে রয়েছে ঢাকা টাইমস, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, নিউজবাংলা টোয়েন্টিফোর ডটকম, জাগোনিউজ টোয়েন্টিফোর, ঢাকা পোস্ট, বাংলা ট্রিবিউন ও রাইজিং বিডি-এর মতো কয়েকটি।

৪.৪ এফএম রেডিও

২০০৬ সালে বাংলাদেশে এফএম (ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন) রেডিওর যাত্রা শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই এই মাধ্যম ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যদিও বিগত কয়েক বছরে এই রেডিও চ্যানেলগুলোর প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণ ও আগ্রহ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিজ্ঞাপন ও শ্রোতা সংকটে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি এফএম রেডিও বন্ধ হয়ে গেছে।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন দেশের মানুষ কী ধরনের গণমাধ্যম দেখতে চায় সে বিষয়ে বছরের শুরুতে যে জাতীয় জনমত সমীক্ষা করেছে, তাতে রেডিওর শ্রোতা কমে যাওয়ার এক হতাশাজনক চিত্র উঠে এসেছে। প্রায় ৪০ হাজার মানুষের ওপর পরিচালিত জরিপে ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা রেডিও শোনেন না এবং তাদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ বলেছেন তারা রেডিও শোনার প্রয়োজন মনে করেন না।

এফএম প্রচার তরঙ্গে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার। কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ বেতারের এফএম ট্রান্সমিটারের সাহায্যে জনপ্রিয় বিদেশি গণমাধ্যম বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা এবং ডয়েচে ভেলে তাদের অনুষ্ঠান প্রচার করত। তবে শ্রোতাদের চাহিদায় ভাটা পড়ায় এসব প্রতিষ্ঠান রেডিও কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করে মাল্টিমিডিয়া প্ল্যাটফর্মে মনোযোগী হয়েছে।

দেশে সর্বপ্রথম ব্যক্তি মালিকানাধীন এফএম রেডিও স্টেশন হিসেবে অনুমোদন লাভ করে রেডিও টুডে। সে বছর থেকেই দেশের মানুষের সঙ্গে দেশীয় এফএম রেডিওর পরিচিতি ঘটে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, সরকার ২৮টি চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছে। তবে বর্তমানে ১৯টি চ্যানেল সম্প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে চারটি চ্যানেল বন্ধ হয়ে গেছে। আরও পাঁচটি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়া হলেও সেগুলোর সম্প্রচার শুরু হয়নি।

২০০৬ সালে তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে রেডিও টুডে ও রেডিও ফুর্তি নামে দুটি এফএম রেডিও চ্যানেল চালুর অনুমোদন দেওয়া হয়। রেডিও আমার ও এবিসি রেডিও নামে আরও দুটি চ্যানেল যথাক্রমে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে ১/১১ সরকারের সময় অনুমোদন লাভ করে। অবশিষ্ট ২৪টির অনুমোদন দেওয়া হয় ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। মূলত দেশের মানুষের মধ্যে এফএম রেডিওর জনপ্রিয়তা ও চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছরের মধ্যে এতগুলো এফএম চ্যানেলের আবির্ভাব ঘটে। টিভি চ্যানেলের মতো এফএম রেডিও প্রতিষ্ঠার জন্যও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একধরনের আগ্রহ দেখা যায়। শিল্পগ্রুপ বসুন্ধরা, স্কয়ার এবং প্রাণ-আরএফএলের মতো কোম্পানি ছাড়াও যারা এফএম রেডিওর চ্যানেলের অনুমোদন পেয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গী নেতা ও সমর্থক, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সংসদ সদস্য ও সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এবং অভিনেত্রী শমী কায়সার ও অভিনেতা নাদের চৌধুরী।

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, ভিন্নমত ও বৈচিত্র্যের প্রশ্নে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ যেভাবে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, সেগুলোর প্রায় সবই এফএম বেতারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার, স্বাধীন মত প্রকাশ ও গণতান্ত্রিক বিতর্ক এবং বহুত্বের প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ এসব রেডিওতে খুবই সীমিত। শ্রোতা হারালেও রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচারের ক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী সরকারের হস্তক্ষেপ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ যে বজায় ছিল, তার কিছু দৃষ্টান্তও তারা তুলে ধরেন। সাবেক সড়ক যোগাযোগ ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের একটি অনুষ্ঠানের বক্তব্য অনুষ্ঠান চলাকালেই সংবাদে কেন প্রধান শিরোনাম করা হয়নি, তার জন্য জবাবদিহি চাওয়া ও তিরস্কৃত হওয়ার ঘটনা সেরকম একটি উদাহরণ। বিপরীতে অভিযোগ রয়েছে, এফএম রেডিওতে তরুণ সম্প্রচারক, যাদের একাংশ রেডিও জকি নামে পরিচিত, তাদের অনুষ্ঠানে শালীনতা ও রুচিশীলতার নীতি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়।

আর্থিক দিক থেকে এফএম বেতার বর্তমানে খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি। অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এফএম বেতার কেন্দ্রগুলোর উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপকদের অনেকেই অসম প্রতিযোগিতার কথা বলেছেন। টেলিভিশন এবং অনলাইনে বেসরকারি বিজ্ঞাপনের জন্য যে ধরনের ছাড় দেওয়া হয়, তার কারণে বিজ্ঞাপনদাতারা রেডিও থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আবার সরকার বিভিন্ন সময়ে জনস্বার্থে বিভিন্ন ঘোষণা বিনামূল্যে প্রচারের নির্দেশনা দিলেও সরকারি কোনো বিজ্ঞাপন এসব রেডিওতে দেওয়া হয় না। লাইসেন্সগুলোর বিপরীতে সরকার যে জামানত আটকে রেখেছে, তার যৌক্তিকতা নিয়েই তারা প্রশ্ন তুলেছেন। পাশাপাশি, লাইসেন্স নবায়নের বার্ষিক ফিও এসব বিপন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪.৫ বেসরকারি সংবাদ সংস্থা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময়সাবেক পাকিস্তানের বেসরকারি বার্তা সংস্থা পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনালের (পিপিআই) ঢাকা ব্যুরো অফিস,বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (বিপিআই) নামে কাজ শুরু করার সুযোগ পায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এটি সরকারি বার্তা সংস্থা বাসসের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ আছে, স্বাধীনতার অল্প কিছুদিন আগে ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ইস্টার্ন নিউজ এজেন্সি (এনা) নামে একটি বেসরকারি বার্তা সংস্থা চালু হয়। স্বাধীনতার আগে স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য এনা পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়ে এবং সে সময়ের সামরিক সরকার এটি বন্ধ করে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় এর কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

স্বাধীনতার পর এনা পুনরায় কার্যক্রম শুরু করে। একটি বেসরকারি কোম্পানি হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়, যার পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার ছিল উদ্যোক্তার নিজের এবং বাকি পঞ্চাশ শতাংশ বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের। ছয় সদস্যের একটি পরিচালনা

পরিষদ এটি পরিচালনা করত। প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাদের আয়ের মাত্র ২০ শতাংশ আসত সংবাদপত্র থেকে, ৬০ শতাংশ রেডিও ও টেলিভিশন থেকে এবং ১০ শতাংশ সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে। বাকি ১০ শতাংশ আসত বিভিন্ন বাণিজ্যিক উদ্যোগ থেকে। এনা সরকারের কাছ থেকে কোনো ভর্তুকি পেত না। সে সময় বার্তা আদান-প্রদানের প্রধান মাধ্যম ছিল টেলিযোগাযোগব্যবস্থানির্ভর টেলিপ্রিন্টার। কিন্তু টেলিযোগাযোগ সেবার উচ্চমূল্যের কারণে তাদের ব্যবসা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়।

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের সময় প্রতিষ্ঠানটি আরও নানারকম আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত এর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তবে সেই সামরিক শাসনামলেই ১৯৮৩ সালে বেসরকারি খাতে ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)-এর যাত্রা শুরু হয়।শুরুতে ইউএনবি শুধু খবর সরবরাহ করলেওএখন তারা ভিডিও সেবার দিকে মনোযোগ দিয়েছে। ইউএনবি বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর ছবি ও খবর সরবরাহের একক স্বত্বাধিকারী। ইউএনবির গ্রাহক সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে পিআইডি, বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতার থেকে নিয়মিত রাজস্ব আসে। সব মিলিয়ে তাদের আয় এখন পরিচালন ব্যয়ের প্রায় ৫০ শতাংশ। এ কারণে তারা অন্যান্য গণমাধ্যমের মতো সরকারের সহায়তা দাবি করে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষ দিবসগুলোয় সরকার যেসব ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে, সেরকম বিশেষ আয়োজন তাদের অনলাইন পোর্টালেও দেওয়ার জন্য তারা আহ্বান জানিয়েছে।

ছোট বার্তাকক্ষ হলেও সারাদেশে তাদের সংবাদদাতাদের ভালো নেটওয়ার্ক রয়েছে। স্বল্প বাজেটে প্রতিষ্ঠানটি সচল রয়েছে এবং তারা সরকারের কাছ থেকে কোনো সহায়তা পায় না। সরকারি অর্থে পরিচালিত বার্তা সংস্থার বিপরীতে বেসরকারি খাতের এই বার্তা সংস্থার সাফল্য একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। তারা দাবি করেছে, সংবাদমাধ্যমে তাদের তৈরি খবরের প্রভাব বা কার্যকারিতা অনেক বেশি বলে তাদের সমীক্ষায় দেখা গেছে।

স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পথে সরকারের বাধার পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বাধার কথাও প্রতিষ্ঠানটির সাংবাদিকেরা বলেছেন। ইউএনবির গ্রাহক অন্য গণমাধ্যম, যার মালিকানায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রয়েছে, এরকম ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে প্রতিবেদন করা হলে চাপের মুখে পড়তে হয়। এ কারণে কিছুটা সেলফ সেন্সরশিপের ঘটনা ঘটে।

৫

গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণের আইনি কাঠামো

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে প্রচলিত কিছু আইন বাকস্বাধীনতা ও মুক্ত সংবাদমাধ্যমের পথে বাধা সৃষ্টি করে আসছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরও দেশীয় শাসকেরা নিজেদের স্বার্থে সেগুলো বহাল রেখেছেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের জন্মের পর গত ৫৪ বছরে বেশ কিছু নতুন আইন প্রণীত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি দমনমূলক। ফলস্বরূপ, স্বাধীন সাংবাদিকতা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা সরকারের রোষানলের শিকার হচ্ছেন। একদিকে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো নানা বিধিনিষেধের জালে আটকা পড়েছে, অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণে বিভিন্ন কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করছে। আড়ি পাতার প্রযুক্তি এবং নজরদারি যন্ত্রের মাধ্যমে সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর ফলে সংবাদমাধ্যম জগতে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। ভয়ভীতি ও মিথ্যা মামলার আইনি হয়রানি এড়াতে সাংবাদিকরা স্বনিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিচ্ছেন। আমাদের সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে মুক্তভাবে মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাকস্বাধীনতা' শিরোনামের এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্‌ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতারনিশ্চয়তা দান করা হইল।'

কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, 'বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক', 'শালীনতা', 'মানহানি' এবং 'আদালত অবমাননা'র মতো বিষয়গুলোর ব্যাপকতার কারণে প্রায়শই আইনের অপপ্রয়োগ ঘটতে দেখা যায়। 'আইনের দ্বারা আরোপিত' হলেই যে 'বাধানিষেধ' যুক্তিসংগত হবে, তা নয়। এগুলো ভিন্নমত দমনের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেও অপব্যবহৃত হতে পারে, যার অসংখ্য উদাহরণ ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি আইন (আইসিটি অ্যাক্ট) এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (ডিএসএ) মতো নিবর্তনমূলক আইনগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়। তাই সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের পরিবর্তন প্রয়োজন।

সুপারিশ: সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন প্রথম প্রেস কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছিল যে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি উঠতে পারে কেবল যুদ্ধাবস্থায়। স্বাভাবিক সময়ে এই নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন একই মত পোষণ করে এবং এই মর্মে সংবিধানে সংশোধনীর সুপারিশ করছে।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের সংবিধানে আলাদা ও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন, সুইজারল্যান্ডের সংবিধানে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও উৎসের গোপনীয়তা রক্ষা এবং সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন না করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সুইডেনের সংবিধানেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুরূপ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংবিধানে 'সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা'র কথা বলা হলেও এতে স্পষ্ট ব্যাখ্যার অভাব রয়েছে। এই অস্পষ্টতা দূরীকরণে সংবিধানে সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের মতো সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট বিধান যোগ করা প্রয়োজন।

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ ছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাংবাদিকতার স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করে অথবা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, এমন আইনগুলো নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো।

৫.১ পেনাল কোড (দণ্ডবিধি) ১৮৬০ (ধারা ৪৯৯, ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ মানহানি)

দণ্ডবিধির মানহানির ধারা ৪৯৯, ৫০০, ৫০১ ও ৫০২ সাংবাদিকদের হয়রানি এবং সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখানোর জন্য প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। গত পনেরো বছরে এ আইনটির অপব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এ আইনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো বিচারপূর্ব দীর্ঘ কারাবাসের আশঙ্কা। যদিও আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, শুধু মানহানির শিকার ব্যক্তিই এ আইনে মামলা দায়ের করতে পারবেন এবং একাধিক মামলা দায়ের করা যাবে না, বাস্তবে এর বিপরীত চিত্রই দেখা গেছে। 'আমার নেতার মানহানি হওয়ার কারণে আমার এবং দলের মানহানি হয়েছে'-এমন যুক্তিতে তৃতীয় পক্ষ মামলা করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মামলা দায়ের হয়েছে। বিস্ময়করভাবে আদালত এসব মামলা গ্রহণ করেছেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেফতারও হয়েছেন। সমন পেয়ে সাংবাদিক ও সম্পাদকরা দেশের বিভিন্ন জেলার আদালতে গিয়ে হাজিরা দিতে বাধ্য হয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে জামিনও মেলেনি। আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানসহ অনেক সম্পাদক, প্রকাশক ও সাংবাদিককে অসংখ্যবার এমন পরিস্থিতিতে হাজিরা দিতে হয়েছে। এর ফলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নানাভাবে সংকুচিত হয়েছে এবং স্বনিয়ন্ত্রণ বা সেলফ সেন্সরশিপের প্রবণতা বেড়েছে।

৫.২ ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের ৯৯ক এবং ৯৯খ ধারায় সরকারকে সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের (আইসিসিপিআর) পরিপন্থি।

৫.৩ আইসিটি আইন থেকে ডিএসএ এবং সিএসএ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন (আইসিটি) ২০০৬ সালে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের শেষ সময়ে করা হয়। ২০১৩ সালে শেখ হাসিনার সরকার এই আইসিটি আইনকে সংশোধনের মাধ্যমে তা আরও কঠোরতর করে। এ আইনের ৫৭ ধারায় কোনো গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই যে কাউকে আটক করা যেত। প্রধানত, ক্ষমতাসীন দলের লোকজন ফেসবুকে সরকারের সমালোচনা ও ভিন্নমত প্রকাশের কারণে কথিত মানহানি, অপপ্রচার ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের অভিযোগে মামলা দায়েরের মাধ্যমে এ আইনটির অপপ্রয়োগ করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে আইনটির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ ও তা বাতিলের দাবির মুখে ২০১৮ সালে সরকার এর পরিবর্তে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) প্রণয়ন করে।

২০১৮ সালে জারি করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে আগের আইসিটি আইনের অনেককিছুই অবিকৃত থাকে। উপরন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কিছু নতুন বিধিনিষেধ। মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর হিসাব অনুযায়ী এই আইনে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১২৯৫টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০৩ জন আসামি রাজনীতিক, ৩৫৫জন সাংবাদিক এবং ৩৫৫ জন শিক্ষার্থী। মোট মামলার ২৭.৪১ শতাংশ সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা। আইন ও সালিশ কেন্দ্র ৩৫০টি মামলার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে। এতে দেখা যায়, ১৬৫টি মামলার বাদী পুলিশ, ক্ষমতাসীন দল ও অঙ্গদলের নেতাকর্মী। অর্থাৎ মোট মামলার ৪৭ শতাংশই করেছেন তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রভাবশালীরা। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ৮, ২১, ২৫, ২৮, ২৯, ৩১ ৩২, ৪৩ ও ৫৩ ধারা সংবিধানের বাক ও গণমাধ্যমের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার পরিপন্থি ছিল। আইনটির ১৪টি ধারা ছিল জামিন অযোগ্য। আইনটি সংবাদমাধ্যমজগতে ভয়ের সৃষ্টি করে। যার ফলে সাংবাদিকরা সেলফ সেন্সরশিপ আরোপ করতে বাধ্য হন। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন আইনটির ২১ ও ২৮ ধারা বাতিল এবং ক্ষতিকর ৮টি ধারা সংশোধনের সুপারিশ করেছিল। সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিবাদের মুখে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করে

আওয়ামী লীগ সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ জারি করে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলাগুলো নতুন আইনে বিচারের বিধান রাখা হয় এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনেও আগের আইনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনেক বিষয় অবিকৃত রাখা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার অবশ্য সাইবার নিরাপত্তা আইন বাতিল করে সাইবার সুরক্ষা আইনের প্রস্তাব করেছে, যার বিভিন্ন বিধান নিয়ে অধিকারকর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ রয়ে গেছে।

৫.৪ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩

এটি একটি নিবর্তনমূলক আইন। ঔপনিবেশিক আমলের এ আইনের কয়েকটি ধারা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথে বাধা তৈরি করে। ১৯২৩ সালের সরকারি গোপনীয়তা আইনের ৩(১) ধারায় 'রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থ' কথাগুলো অনেকটাই অস্পষ্টতা রয়েছে এবং তা অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। করোনা মহামারির সময়ে স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতির অভিযোগ বিষয়ে যৌক্তিক অনুসন্ধান বন্ধ করতে এই আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়। প্রথম আলোর সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে এ আইনে মামলা দেওয়া হয় এবং অনেকদিন তাকে প্রাকবিচারিক বন্দি হিসাবে আটক রাখা হয়।

৫.৫ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪

প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪-এর উদ্দেশ্য হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকতার মান বজায় রাখা ও উন্নত করা। এই আইনের মাধ্যমে কাউন্সিলকে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের সাংবাদিকতার মান বজায় রাখার জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কোনো সংবাদ প্রকাশের কারণে কেউ সংক্ষুব্ধ হলে কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ দায়ের করলে, কাউন্সিল তা তদন্ত করে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অভিযুক্ত সংবাদপত্র/সংস্থাকে নির্দেশ দিতে পারে। এ আইনে কাউন্সিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়েও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সাংবাদিকতার মান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত, ৫৪ বছরে কাউন্সিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। কাউন্সিল ১৯৯৩ সালে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় একটি আচরণবিধি জারি করে এবং ২০০২ সালে তা একবার সংশোধন করে। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশের কারণে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়ের করা অভিযোগ তদন্ত ও শুনানি গ্রহণের মাধ্যমে বেশকিছু মামলার নিষ্পত্তি করেছে। নীতিবহির্ভূত প্রতিবেদনের শিকার ব্যক্তিদের (যেমন, গোপনীয়তা লঙ্ঘন বা মিথ্যা প্রতিবেদন) জন্য আইনি আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কার্যত কোনো কার্যকর প্রতিকার নেই। প্রেস কাউন্সিলের দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, এ ধরনের ঘটনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি।

বিগত শাসনামলে রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম দলীয়করণের ফলে প্রেস কাউন্সিল কার্যত একটি দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। একদিকে সরকার চেয়ারম্যান পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁদের বিচারিক জীবনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছে, তেমনি সদস্য পদে মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক ইউনিয়ন, বার কাউন্সিল, বাংলা একাডেমি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকেও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের মনোনয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। আর পরপর তিনবার প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীরা কার্যকর বিরোধী দলবিহীন সংসদ তৈরি করায় কমিশনে যে দুজন এমপি সদস্য হিসেবে আসন নিয়েছেন, তাঁরাও প্রতিষ্ঠানটির দলীয়করণে ভূমিকা রেখেছেন। প্রেস কাউন্সিলের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের এই প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে তার লক্ষ্য অর্জন থেকে যেমন দূরে সরিয়ে দিয়েছে, তেমনই তা কখনো কখনো ক্ষমতাসীন সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নিজামুল হক নাসিমের নেতৃত্বাধীন প্রেস কাউন্সিল ১৯৭৪ সালের আইন সংশোধনের লক্ষ্যে একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করে, যা বিতর্কের জন্য দেওয়ায় জনমত যাচাইয়ের জন্য আর প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু

কোনো আলোচনা-বিতর্ক ছাড়াই তা পাসের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে ভেটিংয়ের জন্য পাঠানো হয়। প্রস্তাবিত আইনে সাংবাদিক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের জেল এবং বিপুল অঙ্কের জরিমানার বিধানও যোগ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের খসড়াটি জনমত যাচাইয়ের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বর্তমান প্রেস কাউন্সিলের কাছে খসড়াটি চাওয়া হলে তারা তা 'লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগে ভেটিংয়ের জন্য রয়েছে' উল্লেখ করে গণমাধ্যম কমিশনের কাছে প্রকাশ করতে সম্মত হননি।

প্রেস কাউন্সিলের এখতিয়ার সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমড়অর্থাৎ, টেলিভিশন, বেতার এবং অনলাইন পোর্টালগুলোর ব্যাপক বিস্তারের প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকতার একটি বড় অংশের ওপর কাউন্সিলের কোনো প্রভাব নেই। প্রেস শব্দটি সাংবাদিকতার সব মাধ্যমে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হয়তো কাউন্সিলে আইন তৈরির সময় ছিল, যে কারণে সংবাদ সংস্থাও কাউন্সিলের আওতাভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ব্যাপক বিকাশের পটভূমিতে বর্তমান কাঠামোয় প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীন সাংবাদিকতার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনের সামর্থ্য ও ক্ষমতা রাখে না।

৫.৬ আদালত অবমাননা আইন, ১৯২৬

আদালত অবমাননার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় সংবাদমাধ্যম আদালত বা বিচার বিভাগ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে দ্বিধাবোধ করে। 'আদালতকে কলঙ্কিত করা'র অভিযোগে আদালত অবমাননার আদেশ বা এর হুমকির ঘন ঘন ব্যবহার আদালতের কার্যক্রমের প্রতিবেদন এবং রায় ও আদেশের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ওপর ভীতি সৃষ্টি করেছে। বিচারিক দুর্নীতি প্রকাশ করার কারণে আদালত অবমাননার আইন প্রয়োগ কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এমন উদাহরণ তৈরি হয়েছে, যা সাংবাদিকতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

৫.৭ বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত আইনের পর্যালোচনা

'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত' সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন সাংবাদিক এবং অন্যদের, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের বিরুদ্ধে, অপব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয়নি, সেখানেও এই আইন প্রয়োগ করে স্বাধীনতার অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

৫.৮ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯

২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন একটি উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক আইন হলেও এই আইনের কার্যকর সুফল এখনো সীমিত রয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন দলের অনুগত ব্যক্তিবর্গ ও সাবেক আমলাদের নিয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাবে এটি প্রভাবিত হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক কারণেও এর প্রায়োগিক দিক থেকে সমস্যা রয়ে গেছে। জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাংবাদিকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ আইনের সুফল সাংবাদিকেরা খুব বেশি পান না। তাছাড়া অনেক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা তথ্য প্রদানে এখনো বাধা তৈরি করেন। রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়ন প্রশ্নে তাদের যে বার্ষিক হিসাব নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হয় হয়, তা প্রকাশে নির্বাচন কমিশনের অস্বীকৃতি এর একটি বড় নজির। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে আবেদনকারী নাগরিক সংগঠন সুজন আদালতের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, যেখানে আদালত আবেদনকারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়াও জাতীয় নিরাপত্তা ও বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাখ্যায় কিছুটা অস্পষ্টতার সুযোগে অনেক প্রতিষ্ঠান তথ্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়।

৫.৯ তথ্য-উপাত্ত ব্লক বা অপসারণ করা

বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে বিটিআরসি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এনটিএমসি, অজ্ঞাতনামা সরকারি সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রকের বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে বাংলাদেশি সার্ভারে থাকা তথ্য-উপাত্ত ব্লক বা অপসারণ করার এবং এর মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করার।

৫.১০ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, ২০১৪-এর পর্যালোচনা

আইন ছাড়াও বিভিন্ন নীতিমালার মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন গণমাধ্যমের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই সম্প্রচার নীতিমালার মাধ্যমে রেডিও, টেলিভিশন এবং অনলাইন মাধ্যমে ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। 'দেশবিরোধী' কর্মকাণ্ড, 'ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুভূতিতে আঘাত' করে এমন বিজ্ঞাপন, 'বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে বিকৃত' করে এমন বিষয়বস্তু, এবং 'আইন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়' এমন অনুষ্ঠান বা বিজ্ঞাপন (অনুচ্ছেদ ৩.২.১, ৩.৬.৫, ৩.৬.৭, ৪.১.১, এবং ৫) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'দেশবিরোধী' 'ধর্মীয় বা রাজনৈতিক অনুভূতিতে আঘাত'-এর মতো বিশেষণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অপব্যবহারের অনেক নজির রয়েছে।

৫.১১ জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭-এর পর্যালোচনা

এই নীতি অনলাইন গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের অভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ প্রণয়নের বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করে (অনুচ্ছেদ ২.১.৪)। ফলে সরকার রাজনৈতিক কারণে পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অনলাইন গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে এক অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশের জন্ম দিয়েছে। 'ইতিহাস' এবং 'সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতি'র (অনুচ্ছেদ ৪.১) মতো বিস্তৃত বিষয়গুলোয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রয়োগের কথা বলে মতপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হয়েছে।

এই নীতিমালায় একটি সম্প্রচার কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে যার কার্যাবলি হলো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ (অনুচ্ছেদ ৩.১.১), সরকারের কাছে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা এবং সম্প্রচারের অনুপযুক্ত তথ্য প্রকাশের জন্য জরিমানা আরোপ করা (অনুচ্ছেদ ৩.১.৪)।

৫.১২ দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩

এই আইনটি ১৯৭৬ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে কয়েক দফা সংশোধন করা হলেও বর্তমানে সময়োপযোগী নয়। গত তিন-চার দশকে অসংখ্য নামসর্বস্ব সংবাদপত্রের উদ্ভব নানা সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এই সমস্যা অনেকাংশেই এড়ানো যেত, যদি সরকার পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত আইনের ১২ ধারার উপধারা ২ এর (ছ) অনুচ্ছেদের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিত। এই অনুচ্ছেদে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকাশকের পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা সম্পর্কে সন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, ডিক্লারেশন দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদটি তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। তথ্য অধিদফতরের সূত্রমতে, বর্তমানে মাত্র ১০ লাখ টাকার ব্যাংক স্থিতি দেখালেই পত্রিকার ডিক্লারেশন পাওয়া সম্ভব। পত্রিকা প্রকাশের জন্য কেউ আবেদন করলে তার আর্থিক সচ্ছলতা (ব্যাংক সলভেন্সি), বিনিয়োগের পরিমাণ, অর্থের উৎস এবং কর পরিশোধের প্রমাণ অবশ্যই যাচাই করা উচিত। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

৫.১৩ সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন

সাংবাদিকদের বাকস্বাধীনতা ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রকাশের চর্চার মতো সুরক্ষিত অধিকারের জন্য বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও শারীরিক আক্রমণের শিকার হতে হয়। সরকার ও বিভিন্ন অরাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী, স্বার্থতাড়িত গোষ্ঠী সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা দিতে হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন, আইনগত হয়রানি (যেমন সংবাদ প্রকাশের আগেই মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা) করে থাকে। রাষ্ট্রীয় সংস্থা, রাজনীতিকদের অনুগত কর্মী-সমর্থক এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর এসব বেআইনি কার্যক্রম স্বাধীন সাংবাদিকতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে। ক্ষমতাসীন দলের সদস্য কিংবা প্রভাবশালীদের হুমকি ও হামলার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায়ই কোনো সুরক্ষা দেয় না। আর যেখানে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সংস্থা বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য জড়িত থাকেন, সেখানে প্রশাসনও নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নেই এবং আদালতেও প্রতিকার কিংবা সুরক্ষা মেলে না। হত্যার শিকার হওয়ার সাংবাদিকদের অধিকাংশের পরিবারই

বিচার পায়নি। এক যুগেরও বেশি সময় সাগর-রুনি দম্পতির বহুল আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়ায় জনধারণা তৈরি হয়েছে যে সাংবাদিকদের মারলে কিছুই হয় না।

আওয়ামী লীগের শাসনামলের ১৫ বছরে সাংবাদিকরা তাদের অনলাইন ও অফলাইন রিপোর্টিংয়ের জন্য বিভিন্নভাবে যেমন আক্রমণের শিকার হয়েছেন, নাজেহাল হয়েছেন, তেমনই গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন। আলোকচিত্র সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল, সাংবাদিক-গবেষক মোবাশ্বের হাসান, সাংবাদিক গোলাম সারোয়ারসহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক বিভিন্ন মেয়াদে গুমের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও আড়ি পাতা প্রযুক্তির ব্যবহার ও নজরদারির কারণে সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।

সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা সৃষ্টির এসব অপচর্চা বন্ধে আইনগত সুরক্ষার বিষয়টি এখন বিশ্বের অনেক জায়গায় নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মিডিয়া ফ্রিডম অ্যাক্ট এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এ আইনে গণমাধ্যম, সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের সঙ্গে পেশাগতভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ওপর নজরদারি, বিশেষ করে গতিবিধি অনুসরণ ও একান্ত বা ব্যক্তিগত যোগাযোগে আড়ি পাতা প্রযুক্তি ব্যবহারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। শ্রীলংকায় গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সরকার যে নতুন গণমাধ্যম নীতি গ্রহণ করছে তাতে শারীরিক, যৌন, মানসিক, মৌখিক লাঞ্ছনা (গালাগাল) এবং আইনগত হয়রানি থেকে সাংবাদিকদের সুরক্ষা ও নিরাপদ পরিবেশ পাওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। পাকিস্তানে মিডিয়া ফ্রিডম প্রটেকশন অ্যাক্ট চূড়ান্ত হওয়ার পর পার্লামেন্টে পাশ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে বাংলাদেশেও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা সুরক্ষা আইন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ আইনের লক্ষ্য হবে রাষ্ট্রীয়-অরাষ্ট্রীয় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার পক্ষ থেকে সাংবাদিক/ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের পেশাগত কাজে শক্তি প্রয়োগ বা অন্য কোনো উপায়ে বাধা প্রদান, ভীতিপ্রদর্শন, শারীরিক আক্রমণ, আইন অপপ্রয়োগের মাধ্যমে হয়রানি থেকে সাংবাদিক/গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষা দেওয়া হবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সাংবাদিক / গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ব্যক্তিগত যোগাযোগে অনুপ্রবেশে নিষেধাজ্ঞা এবং সংবাদের সূত্রের পরিচয় গোপন রাখার অধিকার সুরক্ষায় এই আইনে দায় বর্তাবে সরকারি কর্তৃপক্ষের ওপর। সাংবাদিক পরিচয়ের অপব্যবহার এবং পেশাবহির্ভূত কোনো অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে অবশ্য এই সুরক্ষার সুযোগ মিলবে না।

৬

গণমাধ্যম সম্পর্কে জনমানুষের ধারণা ও প্রত্যাশা

সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষমতাসীন দলের নেতা ও সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকদের অনেকেই পেশাগত নৈতিকতা উপেক্ষা করে দলীয় প্রচারকের ভূমিকা পালন করেছেন। অন্যদিকে যারা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন, তারা বিভিন্ন ধরনের ভয়ভীতির কারণে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। এর প্রভাব জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, যেখানে গণমাধ্যমের একটি অংশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং ফলস্বরূপ, বেশকিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার আক্রমণের শিকার হয়। এই পরিস্থিতিতে, পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের মতামত জানার জন্য গণমাধ্যম কমিশন জাতীয় পর্যায়ে একটি জনমত জরিপ পরিচালনা করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত এই জরিপটি ছিল গণমাধ্যমের ব্যবহার সংক্রান্ত প্রথম জাতীয় সমীক্ষা। এই জরিপটি ১ থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের ৬৪ জেলার ৪৫,০০০ পরিবার থেকে ১০ বছরের বেশি বয়সি সদস্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৩,১৪৫ জন নারী এবং ২১,৯০০ জন পুরুষ ছিলেন। এই জরিপের মাধ্যমে গণমাধ্যমের বিস্তার, সংবাদ গ্রহণের অভ্যাসের পরিবর্তন, গণমাধ্যমের ওপর মানুষের আস্থা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে।

জরিপের ফলাফল অনুযায়ী, ৬৭.৬৭% অংশগ্রহণকারী গণমাধ্যমকে স্বাধীন দেখতে চান। নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতহীন গণমাধ্যমের প্রত্যাশা ৫৯.৯৪% মানুষের। এছাড়াও ৩২.৬৮% মানুষ সরকারি প্রভাবমুক্ত, ৩৭.৩৯% রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, ১৭.২৬% বস্তুনিষ্ঠ, ৩০.৫৭% সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণে সক্ষম, ১৬.১৬% হলুদ সাংবাদিকতামুক্ত, ৯.৩১% ব্যবসায়িক প্রভাবমুক্ত এবং ৯.৫৮% আর্থিক প্রভাবমুক্ত গণমাধ্যম চান। তবে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের ৩৮% মনে করেন, দেশের গণমাধ্যম স্বাধীন নয়। তাদের মধ্যে ১৫.৩১% মনে করেন গণমাধ্যম একেবারেই স্বাধীন নয় এবং ২৩.৬৪% মনে করেন এটি কিছুটা বা কদাচিৎ স্বাধীন। ২৪.১৮% উত্তরদাতা মনে করেন, গণমাধ্যম অনেকটাই স্বাধীন এবং ১৭.২৯% মনে করেন, এটি পুরোপুরি স্বাধীন।

দেশের গণমাধ্যম কেন স্বাধীন নয়? এই প্রশ্নের উত্তরে ৭৯.৪৬% অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন, ৭১.৫০% সরকারি হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন এবং ৫০.১৪% প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন। ৩১.৩৬% মনে করেন সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এর জন্য দায়ী। এছাড়াও ২৪.১৭% মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং ১২.৪৫% বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২.৮০% উত্তরদাতা 'জানা নেই' বলেছেন, এবং ১.৩৭% কারণ বলতে চাননি।

জরিপে ৪৭.২২% অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ৩০.৬৮% এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এর কারণ হিসেবে ৭৬.৬% রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ৬৬.৬৩% সরকারি হস্তক্ষেপ এবং ৪৬.৯৪% প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন। ২৬.৩৯% সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, ২২.৭১% মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ এবং ১২.১৫% বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ২.১৩% উত্তরদাতা কারণ বলতে চাননি।

জরিপে দেখা যায়, মানুষ মুদ্রিত সংবাদপত্রের পরিবর্তে অনলাইনে মোবাইল ফোনে সংবাদ পড়ছেন। জাতীয় দুর্যোগ বা সংকটের সময় তথ্য সংগ্রহের জন্য টেলিভিশন এখনো প্রধান মাধ্যম, তবে রেডিওর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং সরকারি ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত গণমাধ্যমের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তবে বেশির ভাগ মানুষ মনে করেন বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত।

খবর জানার মাধ্যম হিসেবে প্রচলিত গণমাধ্যমের চেয়ে মোবাইলের ওপর মানুষের নির্ভরতা বেশি। সামগ্রিকভাবে,

গণমাধ্যমের ওপর মানুষের আস্থা কমেনি, তবে রাজনৈতিক, সরকারি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের প্রধান বাধা হিসেবে দেখা হচ্ছে। জরিপে ৭৩% অংশগ্রহণকারী জানান, তারা মুদ্রিত সংবাদপত্র পড়েন না, যার প্রধান কারণ হিসেবে ৪৬% জানান তারা এর প্রয়োজন মনে করেন না। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এই হার ৫৩%, তবে ৬৫% মানুষ টেলিভিশন দেখেন। রেডিওর ব্যবহার সবচেয়ে কম, ৯৪% মানুষ এটি শোনেন না, যার মধ্যে ৫৪% মনে করেন এর প্রয়োজন নেই এবং ৩৫% রেডিও সেটের অপ্রাপ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন।

জরিপে দেখা যায়, ৫৯% মানুষ মোবাইল ফোনে অনলাইন সংবাদপত্র পড়েন, এবং ২.৫% কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা ট্যাবে পড়েন। সামগ্রিকভাবে, ৮৮% মানুষ গণমাধ্যমের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন, যেখানে কম্পিউটারের ব্যবহার ৭%। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মধ্যে ৩১% মানুষ খবরের জন্য ফেসবুক এবং ১৬.৫% ইউটিউবের ওপর নির্ভরশীল। জ্ঞানার্জনের জন্য ৪২% মানুষ শিক্ষকের ওপর আস্থা রাখেন।

৭

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম

৭.১. বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ঐতিহাসিকভাবেই বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রচারযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের শাসনামলে, বিটিভি 'সাহেব-বিবি-গোলামের বাক্স' নামে পরিচিতি পায়। এই সময় রাষ্ট্রপতিরূপে জেনারেল এরশাদ, ফার্স্ট লেডি রওশন এরশাদ এবং তাদের মন্ত্রীদের সংবাদই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সময়, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে বিটিভি ও বেতারের প্রতি জনগণের ক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে। দেশের সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত আন্দোলনের রূপরেখা, যা 'তিন জোটের রূপরেখা' নামে পরিচিত, সেখানে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গীকার করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম, বেতার ও টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের দাবি বিভিন্ন আন্দোলনে বারবার উচ্চারিত হয়েছে, যা প্রমাণ করে, সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত টেলিভিশন ও রেডিও আমাদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা।

নব্বইয়ের দশকের আগেও বেতার ও বিটিভির কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিল্পী-কলাকুশলীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, জেনারেল এরশাদের সরকার ১৯৯০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি একটি সম্প্রচার কমিশন গঠন করে। সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মুজিবুল হকের নেতৃত্বে গঠিত এই কমিশন ১৯৯১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নতুন সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়, কিন্তু তা আলোর মুখ দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে, মুজিবুল হক কমিশন গঠিত হয়েছিল সামরিক সরকারের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অধীনে রেডিও ও বিটিভিকে একত্রিত করে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ-এর ব্যর্থতার ফলস্বরূপ। ১৯৮৬ সালে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে একীভূত করার জন্য 'ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অথরিটি অর্ডিন্যান্স' জারি করা হয়।

এরশাদ সরকার অনুমান করেছিল, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারকে একই কর্তৃপক্ষের অধীনে নিয়ে এলে প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং যৌথভাবে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়বে। কিন্তু ওই সময় কর্মরত কর্মীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, একীভূত প্রতিষ্ঠানে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে বিরোধ অসহযোগিতার পর্যায়ে পৌঁছায় এবং একীভূতকরণের প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়।

সৃজনশীল খাত হিসেবে টেলিভিশনের যে নিজস্ব নিয়োগ নীতিমালা ছিল, একীভূতকরণের পর তা কার্যত পরিত্যক্ত হয়। ক্যাডার সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর্মকর্তারা রেডিওতে নিয়োগ পেতেন, কিন্তু নন-ক্যাডার সার্ভিসের নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে বিটিভিতে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু থাকায় এক ধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এছাড়াও ডেপুটেশনে ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের এই দুটি প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা হতো, যার ফলে সৃজনশীলতা ও শৈল্পিক মেধার ঘাটতি দেখা দেয়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এই ধারা এখনো অব্যাহত আছে এবং স্বায়ত্তশাসনের আলোচনায় ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তারা তাদের অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন, যা কার্যত তাদের অনীহা প্রকাশেরই নামান্তর।

১৯৯৫-৯৬ সালে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ সংসদের বিরোধী দলগুলো যখন আন্দোলন শুরু করে, তখনও বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসনের দাবি পুনরায় উচ্চারিত হয়। পরবর্তীতে, আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৯৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সাবেক সচিব আসাফউদ্দৌল্লাহর নেতৃত্বে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়।

আসাফউদ্দৌলাহ কমিশন ১৯৯৭ সালের ৩০ জুন সরকারের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে, যার পরিণতি মুজিবুল হক কমিশনের মতোই হয়। তবে, তৎকালীন সরকার এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম দুটির স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি চাপা দিলেও প্রথমবারের মতো সম্প্রচারমাধ্যমকে বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে

দেয়। কমিশনের সুপারিশমালায় বেসরকারি মালিকানায় রেডিও ও টিভি চ্যানেল চালুর অনুমতি দেওয়ার কথা ছিল। সেসময়ে তিনটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের জন্য অনুমতিও দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় দফায় সরকার গঠনের পর বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দলীয় সমর্থকদের মধ্যে যেভাবে বিতরণ করেছে, তাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্প্রচারমাধ্যমের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের সম্প্রচারেও একচেটিয়া দলীয় প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি পরিকল্পিত ছিল।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের মতামত, বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী-কলাকুশলী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এ দুটি সম্প্রচারমাধ্যমের বিষয়ে জনগণের ধারণা ও প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করেছে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রতিষ্ঠান দুটির স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে যে জাতীয় ঐকমত্য দেখা গেছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠান দুটি পরিচালনায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যেসব নীতিমালা ও বিধি অনুসরণ করে, সেগুলোও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এ পর্যালোচনায় সবচেয়ে বড় বিস্ময় এই যে, বর্তমান কমিশন বর্তমান পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যা, দুর্বলতা, ত্রুটি ও জটিলতা দেখেছে, তা ২৮ বছর আগের পরিস্থিতি থেকে খুব বেশি ভিন্ন নয়। ১৯৯৭ সালে আসাফউদ্দৌলাহ কমিশন যে প্রতিবেদন দিয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল: 'বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের বর্তমান অবস্থার যেসব কারণ কমিশন চিহ্নিত করেছে, তার মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ ও পদোন্নতি পদ্ধতি, পুরোনো যন্ত্রপাতির অভাব, প্রয়োজনীয় কারিগরি সুযোগ-সুবিধা ও ভৌত অবকাঠামোর অভাব, শিল্পী নির্বাচনে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নীতিমালা প্রয়োগ না করার ফলে অনুষ্ঠানের নিম্নমান, জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ শিল্পী-সম্মানি, অনুষ্ঠান নির্মাণের সঙ্গে জড়িত কিছু ব্যক্তির দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব, সংবাদ প্রচারে সুষ্ঠু নীতিমালা, বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার অভাব, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিবেশনায় পেশাদারি ও সৃজনশীলতা বিকাশের উপযোগী পরিবেশের অনুপস্থিতি এবং জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি।'

আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ২০০১ সালের ১৭ জুলাই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের মেয়াদ শেষের অল্প কিছুদিন আগে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১' নামে একটি আইন পাস করে। সংসদে পাস হওয়া এই আইনের বিধান অনুযায়ী, 'আইনটি বলবৎ হইবার পর সরকার যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।' সরকার গত ২৪ বছরে সংসদে পাস হওয়া আইন বলবৎকরণের সেই প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করেনি। ফলে ওই আইনের বিধান অনুযায়ী আরেকটি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ' নামে কোনো কর্তৃপক্ষও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। আইনে ওই 'কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে' বলেও উল্লেখ রয়েছে। আইনটি এখনো বাতিল করা হয়নি। তবে ২০০7 সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ওই আইনের একটি সংশোধনী জারি করে, যা পরবর্তীতে সংসদে আর উত্থাপিত হয়নি বা সংশোধনীটি তামাদি হয়ে গেছে। কিন্তু ২০০9 সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার পরও আইনটির কথা ভুলে গেছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০১ এর ধারা ৫এ কর্তৃপক্ষের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে: নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে:

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) উপ-ধারা ৬(১) অনুসারে নিযুক্ত একজন মহিলাসহ ৩ (তিন) জন সদস্য; এবং

(গ) মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে

আইনে উল্লেখ আছে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, প্রশাসন, টেলিভিশন সম্প্রচার বা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকার চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ করবে। আর ধারা ৮-এ কর্তৃপক্ষের যে কার্যাবলি নির্ধারণ করা আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বাংলাদেশ টেলিভিশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; সংবাদ প্রচার ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মান উন্নয়ন; সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন; অনুষ্ঠানের কারিগরি ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত কাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন; এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে টেলিভিশন সেটের লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা করা।

আইনের ধারাগুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, বাংলাদেশ টেলিভিশনকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার লক্ষ্যেই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা ওই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত হতো। এমনকি সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাও এই কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইন প্রণয়নের পরও তার কার্যকারিতা না দেওয়ায় বিটিভির বর্তমান ব্যবস্থাপকদের মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। মন্ত্রণালয়নির্ভরতার একটি উদাহরণ হলো, আইনে বলা আছে, 'কর্তৃপক্ষ তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে।' তবে ২০১৬ সালেও জেলা পর্যায়ে সংবাদদাতা নিয়োগের নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং তা তথ্যমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন।

৭.১.১ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম থেকে প্রচারযন্ত্র

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) একসময় দেশের একমাত্র টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে বিনোদন, শিক্ষা ও সামাজিক যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। বিটিভির যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে। স্বাধীনতার পর এটি বাংলাদেশ টেলিভিশন নাম গ্রহণ করে। এটি জাতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা ও তথ্যপ্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল।

ঢাকা টেলিভিশন তার সূচনালগ্নে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছিল। ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ সরকার একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে (বিটিভি) স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে। ১৯৯৭ সালে বেসরকারি টিভি চ্যানেল আসার পর এটি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয় এবং এর ভূমিকা স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিবর্তে সরকারনির্ভর প্রচারযন্ত্রে হিসাবে আরও বৃদ্ধি পায়।

২০০৭-০৮ এর সরকার এবং পরবর্তী সময় থেকে এটি কার্যত একদলীয় প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে ওঠে, যেখানে ভিন্ন মতাবলম্বীদের পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয় এবং দলীয় প্রচারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দলীয় প্রচারের নমুনা তুলে ধরতে গিয়ে বিটিভির একজন প্রযোজক জানান, বিটিভির অনুষ্ঠানে উন্নয়ন কার্যক্রমকে 'সরকারের উন্নয়ন' কার্যক্রম না বলে 'আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন' বলার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদমূল্য বিবেচনায় সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তের বদলে নির্দেশনা ছিল, প্রথমে প্রধানমন্ত্রী, তারপর রাষ্ট্রপতি, দলের সাধারণ সম্পাদক, স্পিকার ও তথ্যমন্ত্রীর ক্রমানুসারে খবর সাজাতে হবে। সাবেক মহাপরিচালকদের অন্যতম ম হামিদ তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, সব সরকারই খবরের বিষয়ে একই নীতি অনুসরণ করে, যা হচ্ছে, বিটিভি শুধু সরকারের খবরই প্রচার করবে। ১৯৯৭ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে বিরোধী দলীয় নেতার ছবি দেখানোর জন্য তাকে কারণ দর্শাতে হয়েছিল

- বিটিভির অর্গানোগ্রাম ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্তমান কর্মকর্তারাও মনে করেন।
- নিজস্ব অনুষ্ঠান নির্মাণে ভাটা পড়েছে এবং প্রযোজকরা অনেকটাই নিরুৎসাহিত হয়েছেন। ২০০৯ সালের আগে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা বিটিভির ব্যবস্থাপকদের হাতে ছিল, প্রযোজকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু পরে তা তৃতীয় পক্ষের কাছে চলে গেছে। জাতীয় প্রচারমাধ্যমে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রযোজকদের কাজের সুবিধা থাকা আবশ্যক হলেও সেখানে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার নীতি অনুসরণ করা হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাবে অযোগ্য লোকদের নিম্নমানের অনুষ্ঠান প্রাধান্য পেয়েছে।

- অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ও মান বিটিভির নীতিমালার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না, তা যাচাই না করেই দলীয় সমর্থকদের নির্মিত অনুষ্ঠান ও নাটক ক্রয় ও সম্প্রচারের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। সাবেক মহাপরিচালকদের মধ্যে আব্দুল মান্নান জানিয়েছেন, সাবেক এক কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান বাইরের একজনকে দেওয়ার জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। আরেকজন সাবেক মহাপরিচালক সোহরাব হাসান জানিয়েছেন, প্ল্যানার নামে বিটিভির বাইরের ৭০-৮০ জন অনুষ্ঠান করতেন, যারা সবাই দলীয় লোক এবং রাজনৈতিক চাপেই তাদের অনুষ্ঠান বরাদ্দ দেওয়া হতো। অনেক ক্ষেত্রে এসব দলীয় নির্মাতাদের বিটিভির নীতিমালার বাইরে অগ্রিম অর্থ প্রদানেও বাধ্য করা হতো।

- রাজনৈতিক চাপে অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ হয়েছে অনেক বেশি, যা ব্যয় বাড়িয়েছে। বিগত সরকারের শেষ দিনগুলোয় বিটিভির মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালনকারী মো. জাহাঙ্গীর আলম জানিয়েছেন, তিনি বিটিভিতে গিয়ে দেখেছেন ২৫০ জনের মতো লোক পোষা হচ্ছে, যাদের কোনো কারণ ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক লোকদের অনেককেই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে শুধু লুটপাটের জন্য।

- স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ প্রকট। সরকারি সেন্সরশিপ এবং চাকরিতে হয়রানির ঝুঁকির কারণে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও নাটকের ক্ষেত্রেও সৃজনশীলতা ও স্বাধীন মতপ্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন কারণে অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগ ও পেশার কথিত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার অভিযোগের কথাও এক্ষেত্রে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতির নিয়ম এক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

- বেসরকারি টেলিভিশনের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রেই অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ছে বিটিভি। বিশেষত টক-শো, শিল্পীদের পারিশ্রমিক এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে।

- তালিকাভুক্ত শিল্পীদের সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা ছিল না। শিল্পীদের সংগঠন ও আন্দোলনের কারণে হয়রানি ও বঞ্চিত করা হতো। আট বছর ধরে চলা 'স্মৃতিময় গানগুলো' অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে শিল্পীদের পক্ষ থেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

- শিল্পী সম্মানি জীবনযাত্রার মানের তুলনায় অনেক কম এবং বেসরকারি চ্যানেলের সমতুল্য না হওয়ায় গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং পেশাদার শিল্পীদের অনেকেই সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। ২০১২ সালের পর এই সম্মানি আর বাড়ানো হয়নি।

- রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানে শিল্পীদের কালো তালিকা করার চর্চা জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- প্রশিক্ষণ, বিশেষত বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ ক্যাডার সার্ভিসের কর্মকর্তাদের মধ্যেই সীমিত রাখার চেষ্টা চলে, যার ফলে নিজস্ব শিল্পী ও কলাকুশলীদের দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয় না।

- শিল্পীদের শিল্পচর্চা সার্বক্ষণিক পেশা হলেও চুক্তিভিত্তিক কাজের কারণে তারা অবসর জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। শিল্পীদের অবসর ভাতা বা পেনশন বা এককালীন অনুদানের ব্যবস্থা না থাকায় তারা সৃজনশীলতায় মনোযোগ হারান। শিল্পীদের সম্মানি থেকে অগ্রিম আয়কর আদায়ের ফলে শিল্পীদের অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

- অনুষ্ঠান বাজেটে যে টাকা শিল্পীদের জন্য বরাদ্দ থাকে, এর একটি বড় অংশ প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী অশিল্পী কর্মী, যেমন মালী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রাঁধুনি, গাড়িচালক, দপ্তর সহকারীদের জন্য ব্যয় করা হয়।

- বেসরকারি টেলিভিশন যে পরিমাণে মূল্যছাড় দিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করে, বিটিভি সরকারি আইনের কারণে তা কখনোই করতে পারে না। ফলে বিজ্ঞাপনের আয় কমে গেছে।

- দুই যুগেও পদোন্নতি না হওয়ার রেকর্ড রয়েছে। ফলে সৃজনশীল কাজে অনুপ্রেরণা থাকার কথা নয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের দুটি পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র এবং ১৪টি রিলে কেন্দ্র রয়েছে। ২০০৪ সালে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারের জন্য চালু করা হয় বিটিভি ওয়ার্ল্ড। গত ডিসেম্বরে এটি বিটিভি নিউজ নামে ২৪ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেলে রূপান্তরিত হয়েছে। এছাড়া সংসদ টিভি নামে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি চ্যানেল রয়েছে, যাতে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

বিটিভি ২টি কেন্দ্র ও ১৪টি উপকেন্দ্র থেকে টেরেস্ট্রিরিয়ালে ১৮ ঘণ্টা এবং স্যাটেলাইটে ২৪ ঘণ্টা সম্প্রচার করছে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকলেও সিগন্যালের উপযোগী না হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বিভিন্ন স্পট থেকে সম্প্রচারের জন্য বিটিভি বিদেশি স্যাটেলাইট ব্যবহার করে থাকে। বিটিভির মাত্র চারটি ওবি ভ্যান ছিল, কিন্তু তার যন্ত্রপাতি ব্যবহার অনুপযোগী হওয়া এবং ২০২৪ সালের ১৮ জুলাইয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন আর কোনোটিই সচল নেই। বিটিভিতে বর্তমানে অনুমোদিত পদসংখ্যা ১৯০৮ জন, যার বিপরীতে কর্মরত আছেন ১০৮৩ জন। এর মধ্যে বার্তা বিভাগে অনুমোদিত পদসংখ্যা ৪৮ হলেও কর্মরত আছেন ২৬ জন। অস্থায়ী শিল্পী সম্মানির ভিত্তিতে অতিথি প্রযোজক/ অনুবাদক/ মনিটর হিসাবে আছেন ৩৯ জন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিটিভির মোট পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ৩২০.৮৮ কোটি এবং সংশোধিত বাজেটে ক্ষয়ক্ষতিজনিত কারণে ৬০.০০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দসহ ৩৭৭.৩০২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

টেলিভিশনের লাইসেন্স ফি বাদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয় করেছে ১ কোটি ৩৯ লাখ ৯১ হাজার ৩০১ টাকা , আর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৬০ লাখ ৮৯ হাজার ৯৯৬ টাকা। কেবল অপারেটরদের কাছ থেকে লাইসেন্স ফি বাবদ ২০২৩-২৪ সালে আয় ছিল ৭ কোটি ৭০ লাখ ৯৯ হাজার ৯৬০ টাকা মাত্র এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তা দাঁড়িয়েছে ৮ কোটি ৮৬ লাখ ৬৪ হাজার ৯৫৮ টাকা। বিজ্ঞাপন বাবদ বিটিভির ২০২৩-২৪ সালের আয় ছিল ১১ কোটি ৯৯ লাখ ৬১ হাজার ৭৪৭ টাকা।

৭.১.২ আমলাতান্ত্রিক প্রভাব

সরকারি নীতি অনুসরণে বিভিন্ন আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে বিটিভির কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। মহাপরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকদের আর্থিক ব্যয়ের স্বাধীনতা এতটাই সীমিত যে, কোনো অনুষ্ঠান বা সম্প্রচারের জরুরি প্রয়োজনেও তারা চাহিদামতো অর্থ ছাড় করতে পারেন না। বিটিভির ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ক্রয়, সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভ্রাম্যমাণ ইউনিট তৈরি, প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাড়ির ব্যবস্থাড়সবই মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল। এমনকি জেলা পর্যায়ে সংবাদদাতা নিয়োগের নীতিমালাও বিটিভির বার্তা বিভাগ পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারেন না। ২০১৬ সালে তথ্যমন্ত্রী এই নীতিমালা অনুমোদন করেন।

বিটিভির বার্তাকক্ষের বর্তমান চিত্র দেখলে মনে হয় এটি যেন গত শতাব্দীর কোনো অংশ। বেসরকারি টিভি চ্যানেল বা সংবাদপত্রগুলোতে যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কভিত্তিক আধুনিক কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চালু রয়েছে, বিটিভিতে তা অনুপস্থিত। প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরঞ্জাম ও যানবাহনের অভাবে বিটিভি তাদের খবর প্রচারে বেসরকারি চ্যানেলের ফুটেজ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে বলে প্রযোজকদের সঙ্গে কমিশনের মতবিনিময় সভায় জানানো হয়। বার্তাকক্ষের সময়োপযোগী আধুনিকায়নের বিষয়টি তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল, যে পরিস্থিতিতে পেশাদারির সঙ্গে সংবাদকক্ষ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব।

৭.১.৩ দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাব

দুর্নীতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাব বিটিভির কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ যদিও পুরোনো, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলীয় মনোনয়ন, যেখানে মেধার মূল্যায়ন হয় না। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার অভাবে সৃজনশীল ও মেধাবীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিটিভি পিছিয়ে পড়ছে। বিটিভির কর্মকর্তাদের একটি বড় অংশই সরকারি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ পান, কিন্তু তাদের সমসাময়িক যারা প্রশাসনে যোগ দেন, তারা দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে আর্থিক ও সামাজিকভাবে যতটা এগিয়ে যেতে পারেন, বিটিভিতে কর্মরতদের সেই সুযোগ একেবারেই কম। এটি পেশাগত উন্নতির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৭.২ পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টারের ধারণা থেকে বাংলাদেশ বেতার

রাষ্ট্রীয় বেতার সংস্থা বাংলাদেশ বেতারের যাত্রা শুরু ১৯৩৯ সালে পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' নামে। পরে পাকিস্তান আমলে এটি রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের নবযাত্রা শুরু হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে পরিচালিত হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার অস্থায়ী অবস্থান থেকে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর এটি বাংলাদেশ বেতার হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অবশ্য এটি রেডিও বাংলাদেশ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার ১৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে। এএম ও এফএম প্রচারতরঙ্গে এর অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচারিত হয়।

জনস্বার্থ ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে তথ্য সরবরাহ এবং শিক্ষা ও জাতীয় সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে সম্প্রচারমাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত বাংলাদেশ বেতারের জনসেবামূলক সম্প্রচারমাধ্যম বা পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার হিসেবে ভূমিকা পালন করার কথা। তবে বাংলাদেশ বেতারের ঘোষিত রূপকল্পে (ভিশন) বলা হয়েছে, 'সরকারের নীতি, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে শ্রোতাদের অবহিত করা এবং জাতীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।' এই রূপকল্পে কার্যত বেতারকে সরকারি প্রচারযন্ত্র হিসেবে গণ্য করার মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। বহুমত ও বৈচিত্র্য, যা গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য শর্ত, তার কোনো স্বীকৃতি বাংলাদেশ বেতারের রূপকল্পে নেই। অবশ্য অভিলক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছে, 'শ্রোতাদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নীতকরণের জন্য শিক্ষা দান এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে বিনোদন দেওয়া।'

গুরুত্বপূর্ণ জনসেবার দিক থেকে অবশ্য বাংলাদেশ বেতার এখনো আবহাওয়া বার্তা, কৃষি তথ্য সম্প্রচার এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্যবার্তা প্রচারের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও ট্রাফিক বার্তা, সরকারি বিভিন্ন সেবা সংস্থার ঘোষণাও বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। তবে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিষয়সমূহে ভিন্নমত, সরকারবিরোধীদের অবস্থান প্রচারে ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ না হওয়ায় বেতারের প্রতি শ্রোতার আস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও বৈচিত্র্যের অভাব ও একঘেঁয়েমির ছাপ দেখা যায়, যার প্রধান কারণ নিয়োগ নীতিমালা, শিল্পী নির্বাচনে অস্বচ্ছতা ও দুর্নীতি, সম্মানজনক পারিশ্রমিক না দেওয়া এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ।

পারিশ্রমিক সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়, বেতারে দিনের একটি ঘটনার নিউজের জন্য ৩০০ টাকা, প্যাকেজের জন্য ৪০০ টাকা; ১০টি প্যাকেজ পাঠানো বাধ্যতামূলক, নইলে দিনের ঘটনার জন্য মাসিক মাত্র ১২ হাজার টাকা পাবেন। একজন সংবাদদাতা মাসে যতগুলো নিউজই পাঠান না কেন, তিনি সর্বোচ্চ ৬২টি নিউজের বিল পাবেন। কোনো যাতায়াত ভাতা (কনভেন্স অ্যালাউন্স) দেওয়া হয় না। বেতার ও বিটিভিতে কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মকর্তারা কমিশনের কাছে এসব বিষয় জানিয়েছেন। তদুপরি এই সামান্য সম্মানি থেকে অগ্রিম আয়কর কর্তনে তাদের প্রাপ্য অনেক কমে যায়।

৭.২.১ বেতারের স্বায়ত্তশাসন আইন নিয়ে প্রহসন

বাংলাদেশ বেতারকে বিটিভির সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি একক কর্তৃপক্ষের অধীনে পরিচালনার পরীক্ষামূলক উদ্যোগে জেনারেল এরশাদের সামরিক সরকার যে ব্যর্থ হয়েছিল, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ওই উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার কারণ যে নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং তাতে সৃজনশীল ও শৈল্পিক মাধ্যম হিসেবে বেতার-টিভির বৈশিষ্ট্য অনুধাবনে তৎকালীন সরকারের অক্ষমতা, তা নিয়ে খুব একটা ভিন্নমত নেই।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের মতোই ২০০১ সালের ১৭ জুলাই তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তাদের মেয়াদ শেষের দিকে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইন ২০০১ সংসদে পাস করে। সংসদে পাস হওয়া আইনটিতে বলা আছে, 'আইনটি বলবৎ হইবার পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।' সরকার গত ২৪ বছরে সংসদে পাস হওয়া আইন বলবৎকরণের সেই প্রজ্ঞাপন গেজেটে প্রকাশ করেনি। ফলে, ওই আইনের বিধান অনুযায়ী আরেকটি গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ' নামে কোনো কর্তৃপক্ষও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। আইনে ওই 'কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে' বলেও উল্লেখ রয়েছে। আইনটি বাতিলও করা হয়নি। সম্ভবত সংসদের প্রণীত আইন সংসদ ছাড়া বাতিল করার সুযোগও ছিল না। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার পরও আইনটির কথা ভুলে গেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০১-এর মতোই বাংলাদেশ বেতার কর্তৃপক্ষ আইনে ধারা ৫-এ কর্তৃপক্ষের গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণ সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে:

(ক) চেয়ারম্যান;
(খ) উপ-ধারা ৬(১) অনুসারে নিযুক্ত একজন মহিলাসহ ৩ (তিন) জন সদস্য; এবং
(গ) মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে

আইনে বলা আছে, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, প্রশাসন, টেলিভিশন সম্প্রচার বা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকার চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিয়োগ করবে। আর ধারা ৮-এ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর তালিকায় আছে বাংলাদেশ বেতারের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; সংবাদ প্রচার ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচারে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা অনুসরণ ও বাস্তবায়ন; অনুষ্ঠানের কারিগরি ও গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন; এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বেতার গ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্স ফি নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা করা।

আইনের ধারাগুলো থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, বাংলাদেশ বেতারকে বিধিবদ্ধ সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার লক্ষ্যেই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করা ও অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা ওই কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত হতো। এমনকি সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে ঋণ গ্রহণের ক্ষমতাও এই কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেতার কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে তা পরিচালনার সুযোগ পেলে তার ফল কেমন হতো, সেই প্রশ্ন অবশ্য এখন অর্থহীন।

বাংলাদেশ বেতার ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। মোট ১২টি ইউনিটের মাধ্যমে বেতার বাণিজ্যিক কার্যক্রম, কৃষি সার্ভিস, ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল, বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের মতো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বেতারে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে দৈনিক মোট ৮২টি সংবাদ বুলেটিন প্রচারিত হয়। বেতারের অনুমোদিত জনবল ১৭০৮ জন, যার মধ্যে কর্মরত আছেন ৮৩৩ জন। এছাড়া চুক্তি ভিত্তিতে অনিয়মিত শিল্পী ও সংবাদদাতা আছেন ৭৬৫ জন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ বেতারের বাজেট ২০৯,৩৫,০০,০০০.০০ এবং সর্বশেষ সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ হলো ২০৫,৩৮,৫০,০০০.০০ টাকা।

৭.২.২ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বাংলাদেশ বেতারের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ও শিল্পী-কুশলীদের সঙ্গে যে মতবিনিময় সভাগুলো করেছে, তাতেও নিয়োগ প্রক্রিয়ার ত্রুটি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। সৃষ্টিশীল কাজ ওপরের নির্দেশ অনুসারে কাঙ্ক্ষিত ফল দেয় না বলে সাধারণভাবে মতামত উঠে এসেছে। বাংলাদেশ বেতারের সব কাজই মন্ত্রণালয় নির্দেশিত বলে মনে হয়। প্রযোজকরা অনুষ্ঠান নির্মাণের বিষয়ে স্বাধীন নন। বার্তাকক্ষও সম্পাদকীয় বিবেচনায় পরিচালিত হওয়ার সুযোগ খুব কম পায়।

রাজনৈতিক সরকারের সময়ে সংবাদমূল্যের গুরুত্বের বদলে সরকারের ক্ষমতাধর পদাধিকারীদের পদমর্যাদা অনুসারে খবর সাজানোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হতো। বাংলাদেশ বেতারের সংবাদকক্ষ বেসরকারি খাতের কোনো গণমাধ্যমের বার্তাকক্ষের মতো উপযোগী নয়। সংবাদদাতা নিয়োগের পদ্ধতি অনেকটাই রাজনৈতিক প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল। সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীদের সুপারিশে এসব নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে। আবার তাদের নিয়োগ পুরোটাই চুক্তিভিত্তিক, যেখানে সম্মানি তাদের কাজের ওপর নির্ভর করে। প্রতি রিপোর্টের জন্য যে সম্মানি দেওয়া হয়, তা অনেক সময় যাতায়াত খরচের জন্যও যথেষ্ট নয়। বেতারের সাবেক মহাপরিচালকদের সভায় যৌথ সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের অধীনে বিটিভি ও বেতার পরিচালনার মত এসেছে।

বিগত ১৫ বছরের শাসনামলে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এর কয়েকটি উদাহরণ রীতিমতো হতবাক করার মতো। সরকারি চাকরিতে জীবন-জীবিকার ঝুঁকি অনেককে আপস করতে বাধ্য করেছে এবং স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ সবার মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' দেশাত্মবোধক গান প্রচারের জন্য একজন প্রযোজককে সাময়িক বরখাস্ত ও সাত থেকে আটজন কর্মচারীকে বিভিন্নরকম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একজন কর্মকর্তা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। বাংলাদেশ বেতারেও অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো বিটিভির সমস্যাগুলোর মতোই। শিল্পীদের বরাদ্দে অফিস সহকারী, মালী, পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মাসিক বেতন হয়। শিল্পীদের অডিশন-গ্রেডেশনের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ। এমনকি বিশেষ নির্দেশেও অডিশন নেওয়া হয়। শিল্পী সম্মানি খুবই কম। শিল্পীদের স্বার্থ সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। স্টাফ-আর্টিস্টরাও উপেক্ষিত হয়ে থাকেন। মাসিক চুক্তিবদ্ধ শিল্পীরাও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

বেতার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারকে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করতে হয়েছে আড়াই বছর ধরে। কমিশন সদস্যরা আঞ্চলিক পর্যায়ে গণমাধ্যমের অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন, সেটি বিক্ষুব্ধ জনতার রোষের শিকার হয়ে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানকে দেবতুল্য হিসেবে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বেতারের খুলনা কেন্দ্রের সামনের আঙিনায় একটি অ্যাম্পিথিয়েটার প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার অংশে ছিল তার একটি ২০ ফুট লম্বা ভাস্কর্য এবং মঞ্চ ঘিরে অন্তত পাঁচটি আবক্ষ মূর্তি। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ ছিল ১২ কোটি টাকার বেশি, যা খুলনা আঞ্চলিক কেন্দ্রের বার্ষিক বরাদ্দের ১০ গুণ।

বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের অংশ হিসাবে বর্তমানে পাঁচটি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। এই কার্যক্রমের অধীনে ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, নেপালি এবং বাংলায় সংবাদ, সংবাদ পর্যালোচনা ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মতো বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এসব অনুষ্ঠান শর্টওয়েভ এবং ঢাকা ও তার আশপাশে এফএম প্রচারতরঙ্গে প্রচারিত হয়। যদিও সারা বিশ্বেই এখন আর শর্টওয়েভ প্রচার তরঙ্গের শ্রোতা নেই। নতুন শ্রোতা আকর্ষণের জন্য বেতার বিশেষ অ্যাপের প্রবর্তন করলেও সেই অ্যাপ কতজন ব্যবহার করছেন, তার কোনো হিসাব পাওয়া যায়নি। বহির্বিশ্বে এই অ্যাপের কথা কেউ শুনেছে কি না, তাও নিশ্চিত নয়। বেতারের এই বহির্বিশ্ব কার্যক্রমের আর আদৌ কোনো উপযোগিতা আছে কি না, তা পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত।

বাংলাদেশ বেতারের একটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে, তাদের অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুষ্ঠানমালা। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান ছাড়াও বেতার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যা আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ বুলেটিন প্রচার করে

থাকে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি নিয়ে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোয় কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বেতার এসব অনুষ্ঠান সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভস্ট্রিমিং করায় তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

৭.৩ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন পর ১৯৭২ সালের ১ জানুয়ারি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) ঢাকা ব্যুরোকে নতুন রাষ্ট্রের জাতীয় সংবাদ সংস্থায় রূপান্তর করা হয়। নতুন এই সংস্থার নাম হয় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা-বাসস। এপিপি ছাড়াও পাকিস্তানের বেসরকারি মালিকানাধীন আরেকটি সংবাদ সংস্থা ছিল, যার নাম ছিল পাকিস্তান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন; যা পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (পিপিআই) নাম গ্রহণ করে। সেই পিপিআই-এর ঢাকা ব্যুরোকেও বাংলাদেশ প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (বিপিআই) নামে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিপিআই-কেও বাসসের সঙ্গে একীভূত করা হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করে, তার মাধ্যমেই এটি পরিচালিত হতে থাকে। প্রায় এক দশক এভাবে চলার পর ১৯৭৯ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাসসকে একটি করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়, যার জন্য সরকার ১১ সদস্যের একটি পরিচালনা পরিষদ গঠন করে। (তবে ১৯৮৩ সালের প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাসসের বোর্ড গঠনের অধ্যাদেশটি জারি হয়েছিল ১৯৮২ সালে)। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮-তে অধ্যাদেশটি ১৯৭৯ সালের অধ্যাদেশ হিসাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য বাসসের সেবাগ্রহণকারী সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদক, তথ্য, অর্থ ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই বোর্ডটি গঠন করা হয়। পরিচালনা পরিষদে বিনা পারিশ্রমিকে সরকার একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করত। প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান হতেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যিনি একই সঙ্গে প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। পরিচালনা পরিষদ সংস্থাটির নীতিনির্ধারণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ছিল।

প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৮৩ সালে সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের জন্য বাসসে ঢাকায় একজন প্রধান বার্তা-সম্পাদক, তিনজন বার্তা-সম্পাদক, তিনজন শিফট-ইন-চার্জ ও নয়জন সহ-সম্পাদক এবং তিনজন বিশেষ সংবাদদাতা ও ১১ জন রিপোর্টার ছিল। এর বাইরে চট্টগ্রামে একটি ব্যুরো এবং সারা দেশে তিনজন রিপোর্টার এবং প্রায় ৪০ জন সংবাদদাতা নিয়োগ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় এবং স্থানীয় খবর ছাড়াও বাসস আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন করত। আন্তর্জাতিক সংবাদের প্রধান উৎস ছিল রয়টার্স, এএফপি, ইউপিআই, পিটিআইসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় বার্তা সংস্থার খবর, যা বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। এছাড়াও দিল্লিতে বাসসের একজন নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন। তখন টেলিপ্রিন্টার এবং টেলিযোগাযোগের মাধ্যমেই বার্তা আদান-প্রদানের কাজ চলত।

সত্তর ও আশির দশকে সংবাদপত্র ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা বাসসের গ্রাহক ছিল। বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাসসের সেবা গ্রহণ করত। ঢাকাস্থ কয়েকটি বিদেশি দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থাও তাদের সেবাগ্রহীতা ছিল। বিপরীতে বর্তমানে এএফপি ছাড়া বাসসের অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থার সাথে সেবা বিনিময়ের চুক্তি নেই। এমনকি ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সঙ্গেও বাসসের চুক্তি তামাদি হয়ে গেছে কয়েক বছর আগেই।

বাসসের স্থানীয় গ্রাহকের সংখ্যা বর্তমানে মাত্র ৪৫, যার সবই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান। প্রধানত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সশস্ত্রবাহিনী এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সরকারি ভাষ্য নির্ভুলভাবে পাওয়ার জন্য স্থানীয় টিভি-রেডিও ও পত্রিকাগুলো বাসসের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য এ দায়িত্ব অনেকাংশে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের তথ্য/জনসংযোগ কর্মকর্তারা করে থাকেন। কার্যত সরকারি হ্যান্ডআউট/প্রেসনোট পুনর্লিখন ছাড়া বাসসের তরফে মূল্যসংযোজন তেমন একটা ঘটে না। তবে সারা দেশে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বাসসের সংবাদদাতাদের নেটওয়ার্ক আছে। দিল্লিতেও বাসসের একজন সংবাদদাতার পদ আছে। যেসব সংবাদপত্র সারা দেশে স্থানীয় সংবাদদাতা

নিয়োগ করেনি বা করতে সক্ষম নয়, তাদের জন্য বাসসের মূল্যবান সেবা প্রদানের সুযোগ থাকলেও প্রত্যাশা পূরণে প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য সামান্যই।

স্বৈরশাসন অবসানের পর বাসসের কার্যক্রমে কিছুটা গতি আনার চেষ্টা চলছে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের কোনো উদ্যোগের কথা এখনো জানা যায়নি। চলতি অর্থবছরে বাসসের জন্য সরকারের বরাদ্দ ৩৮ কোটি টাকা। বিপরীতে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব আয় আনুমানিক ৬০ থেকে ৭০ লাখ টাকা। বাসসের অবশ্য দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় একটি ভবন আছে, যার সম্পদমূল্য শতকোটি টাকারও বেশি হতে পারে এবং সেখানে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ীভাবে লাভজনক করা সম্ভব বলে সাবেক ও বর্তমান ব্যবস্থাপকদের দাবি।

৭.৩.১ বাসসে অসাংবাদিক বেশি

বাসসের সেবাগ্রহীতার সংখ্যা আশানুরূপভাবে না বাড়লেও অ-অনুমোদিত জনবল বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানিয়েছেন, অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৪৫ জন হলেও বর্তমানে সেখানে কর্মরত আছেন এর দ্বিগুণেরও বেশি। তবে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানিয়েছেন, অনুমোদিত জনবল ১৯৯ জন, যার মধ্যে ৯৯ জন সাংবাদিক এবং ১০০ জন অসাংবাদিক। তার মতে, প্রতিষ্ঠানটিতে রিপোর্টার, সাব-এডিটর খুঁজে পাওয়া যায় না, কেননা অধিকাংশই বিশেষ সংবাদদাতা বা বিশেষ গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত। একে তিনি 'উল্টো-পিরামিডের' মতো প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

অধিকাংশই তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াকেই বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী বলে মন্তব্য করেছেন। পরিচালনা বোর্ডের হাতে নিয়োগবিধি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণের কথা থাকলেও তা মূলত মন্ত্রণালয়ের কথামতো এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের একক কর্তৃত্বে হয়ে থাকে। একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতে, সরকারের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাংবাদিক ইউনিয়নগুলো বাসসকে তাদের মতাদর্শের সাংবাদিকদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বলে মনে করে। নেতাদের আত্মীয়স্বজনের কর্মসংস্থানেরও একটি উর্বর ক্ষেত্র হিসেবে এটি গণ্য হয়ে থাকে। সাবেক দুজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেছেন, মন্ত্রী-এমপিদের চাপে লোক নিয়োগ দিতে হয়। তাদের একজন জানিয়েছেন, সাবেক এক তথ্যমন্ত্রী ১৩ জনের নিয়োগের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

গণমাধ্যম সাংবাদকর্মীদের মধ্যে বহুলপ্রচলিত একটি ধারণা হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হওয়ায় বাসসে সরকার ঘোষিত ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা শতভাগ। ফলে অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বাসসে চাকরির জন্য ইউনিয়নের ভেতরে একধরনের চাপ তৈরি হয়।

প্রধান সম্পাদক বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কোনো যোগ্যতার মাপকাঠি অনুসৃত হয় না-এমন মতামত কর্মরত সাংবাদিক ও সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের কথায়ও উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নেতৃত্ব এবং ব্যবস্থাপনার দায়-এই দুইয়ের মিশ্রণ সম্পাদকীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে বলেও ধারণা পাওয়া যায়। একজন সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ভাষায়, গণতন্ত্রের সময়েও বিরোধী দলের বক্তব্য সরকার যতটুকু সহ্য করবে, বাসস ঠিক ততটুকুই প্রচার করতে পেরেছে। তবে গণতন্ত্রহীনতাই সামগ্রিকভাবে স্বাধীন সাংবাদিকতায় বড় বাধা তৈরি করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন।

সরকারের কার্যক্রমের খবরের বাইরে বাসসের সাংবাদিকতায় ব্যতিক্রমী সৃজনশীলতার তেমন একটা প্রতিফলন দেখা যায় না। বাসসে কর্মরত সাংবাদিকদের মধ্য থেকেই কমিশনকে বলা হয়েছে যে, জনদুর্ভোগ বা কোনো সেবা সংস্থা বা সরকারি দপ্তরের প্রশাসনিক ব্যর্থতা বা দুর্বলতার বিষয়ে রিপোর্ট করলে সরকার বিব্রত হবে-এমন ধারণার কারণে একধরনের সেলফ-সেন্সরশিপ কাজ করে। জনদুর্ভোগ, দুর্নীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের নানা অসংগতির বিষয়গুলো নিয়ে কোনো গভীর অনুসন্ধান অথবা শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি কিংবা খেলাধুলার বিষয়ে সংবাদ ও বিশ্লেষণে বিশেষত্ব অর্জনেও প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়ে আছে।

সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট বা পিআইডির বিজ্ঞপ্তি পুনর্লিখন করে প্রচার করাই যেন বাসসের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে পর্যবেক্ষণ এসেছে প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত সাংবাদিক এবং সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে। ভিন্নমতকে স্থান দেওয়ার চেয়ে এড়িয়ে যাওয়াই প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদকীয় রীতিতে পরিণত হয়েছে। সাবেক একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালকের ভাষায়, প্রতিষ্ঠানটির সবার ধারণা-সরকারের ইচ্ছার বাইরে যাওয়া যাবে না।

৭.৩.২ নতুন চ্যালেঞ্জ

গণমাধ্যমজগতে নতুন প্রযুক্তির কারণে যে রূপান্তর ঘটছে, তার আলোকে যুগোপযোগী একটি সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠানটিতে বড় ধরনের সংস্কার প্রয়োজন। বাসসের বর্তমান ও সাবেক ব্যবস্থাপক এবং সাংবাদিকদের মতে, প্রতিষ্ঠানটিতে যোগ্যতা ও দক্ষতার ঘাটতি প্রকট। সরকার তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভরশীল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সেই কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন কার্যত অসম্ভব। বাসস বর্তমানে তার গ্রাহকদের জন্য একান্ত সেবা দেওয়ার পাশাপাশি সর্বসাধারণের জন্য একটি সংবাদ পোর্টাল চালু করেছে। এই সংবাদ পোর্টালকে মাল্টিমিডিয়া পোর্টালে রূপান্তরের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তারা গ্রাহক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভিডিও প্রতিবেদন/ফুটেজ সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অডিও-ভিজুয়াল ইউনিট প্রতিষ্ঠার প্রকল্প নিয়েছে। ৪২ কোটি টাকার প্রকল্পটি বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২৪ ঘণ্টার টেলিভিশন ও অনলাইন সংবাদের নাটকীয় উত্থানের যুগে বার্তা সংস্থাগুলোর প্রথাগত বৈশিষ্ট্য এখন কার্যত অচল। দৈনিক পত্রিকার খবরের ওপর নির্ভরতার যুগে দ্রুততম সময়ে বা তাৎক্ষণিকভাবে খবর চারিদিকে পৌঁছে দেওয়ার যে দায়িত্ব বার্তা সংস্থাগুলোর ছিল। এখন এর আর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮'র ৫ ধারায় এ সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যাবলি যা বলা হয়েছে, তাতেও 'আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ দেশ-বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করে গণমাধ্যমের সাহায্যে তা প্রচার' এবং 'জাতীয় সংবাদ বহির্বিশ্বে সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের' কথাই বলা আছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কিছুই অনন্য নয় বা অন্যান্য গণমাধ্যমের থেকে আলাদা নয়।

দেশের একমাত্র বেসরকারি বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) একই ধরনের সেবা তাদের গ্রাহকদের প্রদান করছে। তারাও গ্রাহকদের জন্য একান্ত সেবার পাশাপাশি সর্বসাধারণের জন্য সংবাদ পোর্টাল চালু করেছে। ইউএনবির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বলেছেন, তারা কোনো ধরনের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পান না। তাদের লোকবল ও ব্যয় বাসসের বাজেটের এক দশমাংশও নয়।

৭.৩.৩ অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা

বিশ্বে খুব অল্পসংখ্যক দেশেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জাতীয় বার্তা সংস্থা আছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের বেশির ভাগ দেশে মুক্তবাজার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সংবাদমাধ্যমের ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক পরিসরে শীর্ষস্থানীয় বার্তা সংস্থা হিসাবে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কয়েকটি দেশের জাতীয় পরিচয় অবধারিতভাবে উচ্চারিত হয়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) যুক্তরাষ্ট্রের, রয়টার্স বৃটিশ এবং এএফপি ফরাসি জাতীয় পরিচয় বহন করে।

ভারতেও প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন না হয়েও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায় বলে মনে হয়। পিটিআইয়ের ট্রাস্ট পরিচালনা করেন ট্রাস্টের সদস্য ভারতের সংবাদপত্রগুলোর প্রতিনিধিরা। পিটিআই জাতীয় পরিসরে সব রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দেশের রাজধানীতে তাদের প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে খবর সংগ্রহ ও গ্রাহকদের মধ্যে তা বিতরণ করে। এত বিপুলসংখ্যক সংবাদদাতা নিয়োগের সামর্থ্য অনেক সংবাদপত্রের আলাদাভাবে নেই বলেই এই সম্মিলিত বিনিয়োগের সুবাদে তাঁদের সবার চাহিদা পূরণ হয়। ব্রিটেনেও জাতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর সংগ্রহ ও বিতরণের জন্য রয়েছে প্রেস অ্যাসোসিয়েশন।

বাসসকে সরকারের ওপর নির্ভরশীল একটি অদক্ষ, স্বজনতোষী ও দলীয় রাজনীতিপীড়িত প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাধীন ও শক্তিশালী যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা জরুরি। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন ২০১৮-তে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পরিষদ যেভাবে গঠনের কথা বলা আছে, তাতে প্রতিষ্ঠানটি সরকারের ওপর যেমন আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তেমনই সরকারের নিয়ন্ত্রণও বাড়বে। তাই আইন পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপনের মান, অপব্যবহার ও বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

গণমাধ্যমের আয়ের প্রধান উৎস বিজ্ঞাপন। আগে সংবাদপত্র আর রাস্তার হোর্ডিংই ছিল বিজ্ঞাপনের একমাত্র মাধ্যম। এরপর রেডিও-টেলিভিশনও বিজ্ঞাপনের জগতে যোগ দেয়। ক্রমশ, ঘরে ঘরে রেডিও-টেলিভিশন পৌঁছাতে থাকায় বিজ্ঞাপনের বাজারে এই দুটি মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। রেডিও-টেলিভিশনের মধ্যে টেলিভিশনের ছবি দেখানোর ক্ষমতা থাকায় বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। কিন্তু এখন ডিজিটাল মাধ্যম বা অনলাইন এসব পুরোনো মাধ্যমকে ছাড়িয়ে গেছে এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারা অব্যাহত থাকবে। ফলে সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনের বাজার ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে অনেক গণমাধ্যম থাকায় বাজারে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞাপন পাওয়ার আশায় অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগীদের তুলনায় কম দামে বিজ্ঞাপন নিচ্ছে। শুধু দাম কমানোর প্রতিযোগিতাই নয়, বিজ্ঞাপনদাতা ও তাদের এজেন্টদের চাপে পড়ে গণমাধ্যমগুলো নিয়ম ভেঙে পত্রিকার পাতা, রেডিও-টেলিভিশনের সময় এবং অনলাইন পোর্টালে দর্শকদের অতিরিক্ত বিজ্ঞাপন দেখতে বাধ্য করছে। সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য রাখার মূল নিয়ম উপেক্ষা করে খবরেও পণ্য বা ব্র্যান্ডের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। খবর আর বিজ্ঞাপনের মধ্যে পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়েছে। টেলিভিশন ও অনলাইনে বিজ্ঞাপন ছাড়া এক লাইন লেখাও পড়া বা এক সেকেন্ডের ভিডিও দেখাও সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনদাতা ও তাদের এজেন্টদের এসব শর্ত মেনেও খুব কম গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানই আর্থিক দিক থেকে সফল হচ্ছে। সরকারি নীতিমালায় পত্রিকার পাতায় সংবাদ ও বিজ্ঞাপনের অনুপাত ৬০: ৪০ হওয়ার কথা থাকলেও তা অনুসৃত হয় না। টেলিভিশনে এ অনুপাত হওয়ার কথা প্রতি ঘণ্টায় মোট ১২ মিনিট। সেখানেও অনেক সময় তা উপেক্ষিত হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন বণ্টন ব্যবস্থায় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এখানে গোপন সমঝোতা এবং একচেটিয়া আধিপত্যের মতো গুরুতর অভিযোগও শোনা যায়, যা উপেক্ষা করার মতো নয়। জনসংযোগ (পিআর), বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়া বায়িং সব যেন একাকার হয়ে গেছে। অভিযোগ আছে, একটি বহুজাতিক কোম্পানি শুধু গোপন সমঝোতার মাধ্যমে তাদের নির্ধারিত বিজ্ঞাপন মূল্য চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। অতীতে বিজ্ঞাপন শিল্পে এজেন্সিগুলো কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করলেও, বর্তমানে তারা নির্দিষ্ট ফির ভিত্তিতে চুক্তি করে। ফলে তারা গণমাধ্যমের ওপর কম খরচে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য চাপ প্রয়োগ করে। কমিশনভিত্তিক সম্পর্ক থাকলে তারা এভাবে চাপ প্রয়োগের সুযোগ পেত না।

পিআর এজেন্সিগুলোর প্রতিনিধি, বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলোর সমিতির নেতারা এবং বৃহৎ বিজ্ঞাপনী সংস্থা এশিয়াটিক থ্রি সিক্সটির লিখিত বক্তব্য থেকে এই শিল্পের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বিজ্ঞাপন খাতের মান উন্নয়ন এবং সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এই শিল্পের জন্য প্রযোজ্য একটি আচরণবিধি বা কোড অব কন্ডাক্ট নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া পিআর এজেন্সির ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট অ্যাডভাইস নীতিমালার প্রয়োজনীয়তার কথাও এখানে উঠে এসেছে।

গণমাধ্যমে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশে বাধা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য বড় ধরনের বাধা। ব্যাংকিং খাতসহ আর্থিক খাতের অনিয়মের অনেক প্রতিবেদন এই ধরনের হুমকির কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে খবর প্রকাশের আগে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার পরপরই দেখা যায় সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পিআর এজেন্সি বা বিজ্ঞাপন এজেন্সি থেকে প্রথমে অনুরোধ, তারপর তদবির এবং শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন বন্ধের হুমকি দেওয়া হয়। আবার পালটা অভিযোগও পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞাপনের জন্য ব্ল্যাকমেইলিং করা হয়, যা সাধারণত অখ্যাত বা স্বল্পপরিচিত প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি ঘটে থাকে।

ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বিজ্ঞাপনগুলো দেশের বাইরে থেকে অফশোরের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে, ছোট উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন প্রবাসীদের মাধ্যমে

প্রচারের ব্যবস্থা করায় হুন্ডির মাধ্যমে টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে অথবা রেমিট্যান্স হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা কম আসছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় এজেন্ট নিয়োগ করতে এবং সরকারি চ্যানেলের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতে বাধ্য করার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

কোথায়, কখন, কী ধরনের বিজ্ঞাপন সবচেয়ে বেশি কার্যকর ফল দেবে, তা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও গবেষণার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। টেলিভিশনের রেটিং পয়েন্ট বা টিআরপি ব্যবস্থার নামে যা চালু আছে, তা এতটাই ত্রুটিপূর্ণ যে ওই রেটিংয়ের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান বিএসসিএল-এর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা পর্যন্ত হতে পারে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশনের নিরীক্ষিত প্রচার সংখ্যা ডিএফপির মিডিয়া লিস্টে দেখানো হলেও এর বেশির ভাগই আসলে ভুয়া।

বিদেশি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনমুক্ত বা ক্লিনফিড নীতি কার্যকর করা হয়নি। সরকার অতীতে এই বিষয়ে সম্মত হলেও, এটি পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। ক্লিনফিড নীতি অনুসরণ করা হলে দেশীয় বিজ্ঞাপন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপকৃত হতে পারে।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আরও দেখা গেছে যে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রধানত ভারতে তৈরি করা বিজ্ঞাপন বাংলায় ডাবিং করে প্রচার করছে। এটি স্থানীয় মেধা, শিল্প এবং সংস্কৃতির জন্য মোটেও সহায়ক নয়, বরং এর প্রভাব নেতিবাচক। এই ধরনের ব্যবসায়িক কৌশল অনুসরণ করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া উচিত।

সরকারের পাশাপাশি করপোরেট সংস্থাগুলোও সংবাদ ও মতামতকে প্রভাবিত করার জন্য তাদের আর্থিক ক্ষমতা ব্যবহার করে সংবাদমাধ্যম মালিকদের জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। অসংখ্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার্থে এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষতি করার জন্য নিজস্ব সংবাদপত্র, টিভি ও অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে। গোষ্ঠীগত বা বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত এসব গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিছু ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে এমন তথ্য প্রকাশ না করার জন্য বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। দুর্ভাগ্যবশত, জনগণের কাছে ক্ষমতাবানদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার কথা থাকলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যম সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়।

সরকারি বিজ্ঞাপন সবসময়ই আনুগত্যকে পুরস্কৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। গত দেড় দশকে তা আরও বেড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি। বিগত সরকারগুলোর সময় বিজ্ঞাপন বণ্টনে রাজনৈতিক নেতাদের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ শোনা যায়নি। এছাড়াও ২০১৩ সাল থেকে সরকার বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে (অফিসিয়ালি না হলেও) কিছু সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আসছে। সরকারের দুর্নীতি উন্মোচন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবেদন প্রকাশের কারণে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এর মতো বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রগুলো এ নিষেধাজ্ঞার প্রধান শিকার হয়েছে। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে বেসরকারি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ উঠেছে। দুঃখজনকভাবে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোও সরকারের এই বেআইনি নির্দেশ মেনে চলছে, যদিও আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় এমন কোনো কাজে সহায়তা না করার অঙ্গীকার রয়েছে।

৯

গণমাধ্যমে ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা

গণমাধ্যম আরও যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, যা দেশের কঠোর দমনমূলক আইনগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রথম আলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন গড়ে তিনজনের বিরুদ্ধে এই আইনে মামলা করা হয়েছে।

মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর তথ্য অনুযায়ী, কোভিড মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে কমপক্ষে ৮০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়েছেন এবং অন্তত ৫ জনকে বিভিন্ন সময়ে জোরপূর্বক নিখোঁজ করা হয়েছে। এছাড়াও কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধানী সাংবাদিক রোজিনা ইসলামের বিরুদ্ধে শত বছরের পুরোনো অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ব্যবহার করেছে। আলোকচিত্রী সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ৫৩ দিন নিখোঁজ থাকার পর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। একইভাবে চট্টগ্রামের সাংবাদিক গোলাম সারোয়ার গুম হন। শুধু ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরাই নন, জনপ্রশাসনের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারাও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অনেক সাংবাদিককে হয়রানি করেছেন। তাদের মধ্যে কুড়িগ্রামের সাংবাদিক আরিফুল ইসলাম রিগ্যানের ওপর ভয়াবহ নির্যাতনের ঘটনা সারাদেশে ক্ষোভের জন্ম দেয়। জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীনের নির্দেশে, রাতে মোবাইল কোর্টের নামে তার বাড়ির দরজা ভেঙে তাকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হয়।

অনেক বার্তা সম্পাদক জানিয়েছেন, তারা সবচেয়ে বেশি ভয় পান 'অফিসিয়াল নয়' এমন পরামর্শকে, যা তাদের ফোনে দেওয়া হয়। অতীতের লিখিত নির্দেশের চেয়ে এটি বেশি ভীতিকর, কারণ এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে না এসে গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে আসে এবং এর কোনো লিখিত প্রমাণ থাকে না। ফলে আদালতে এটিকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ থাকে না। অথচ এই নির্দেশ অমান্য করলে হয়রানি, ব্যবসায় বাধা এবং এমনকি ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

স্বৈরশাসনে শারীরিক ক্ষতির হুমকিও অনেক বেড়ে যায়। মিডিয়া, মানবাধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী উন্নয়ন পর্যবেক্ষণকারী আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ফ্রিডম হাউস তাদের ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে, '২০২০ সালজুড়ে সাংবাদিকদের পোশাকধারী নিরাপত্তা বাহিনী মারধর, জোরপূর্বক গুম অথবা মানহানির মামলা করেছে। ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচন এবং ২০১৯ সালের স্থানীয় নির্বাচনের সময় ১৯৭১ সালের যুদ্ধ এবং নির্বাচনি অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিবেদন করার জন্য সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়েছে অথবা তাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় দায়মুক্তির সংস্কৃতি এখনো বিদ্যমান।'

দেশে ভয়ের পরিবেশ বিরাজ করায় গণমাধ্যমে স্ব-সেন্সরশিপ একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম অধিকার সংস্থা, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস তাদের ২০২১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে, 'সম্পাদকরা কারাদণ্ড বা তাদের গণমাধ্যম বন্ধের ঝুঁকি নিতে চান না, তাই স্ব-সেন্সরশিপ অভূতপূর্ব পর্যায়ে পৌঁছেছে।' স্ব-সেন্সরশিপের কারণ ব্যাখ্যা করে তারা আরও উল্লেখ করেছে, 'সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও বেসামরিক নাগরিকদের সহিংসতার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সরকার এখন সমস্যা সৃষ্টিকারী' সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করার জন্য একটি বিশেষ বিচারিক অস্ত্র তৈরি করেছেড়২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, যার অধীনে 'নেতিবাচক প্রচার'-এর জন্য ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাসহ প্রভাবশালী মহল এবং সরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলো গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ও সরকারের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, কয়েকটি একতরফা ও বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা যতই স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছেন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ ততই বাধাগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে বাংলাদেশে সাংবাদিকতাচর্চা বা গণমাধ্যমের ভূমিকাকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. সবচেয়ে বড় অংশটি ছিল যারা সরাসরি সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সরকারের পক্ষে ও সরকারবিরোধীদের বিপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। মূলত এটাই ছিল এসব গণমাধ্যমের প্রধান কাজ, যা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে।

২. অনেক গণমাধ্যম অনিচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন চাপ ও ভয়ের কারণে এই কাজটি করতে বাধ্য হয়েছে। এ দুই ধরনের গণমাধ্যমে হাসিনা সরকারের তথাকথিত উন্নয়নের বয়ান ফলাও করে প্রচার করা হলেও চলমান অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি, গুম, খুন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে অথবা শুধু সরকার ও তার বাহিনীর ভাষ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গণমাধ্যমের এমন ভূমিকার কারণে একদিকে যেমন সত্য গোপন করা হয়েছে, অন্যদিকে এসব অন্যায় ও অপরাধ বৈধতা পেয়েছে।

৩. এ দুই শ্রেণির বাইরে অল্পসংখ্যক গণমাধ্যম সব চাপ ও ভয় মোকাবিলা করে স্বাধীন সাংবাদিকতা করার চেষ্টা চালিয়েছে। মূলত এদের কারণেই বাংলাদেশে সাংবাদিকতা টিকে ছিল এবং জনগণ হাসিনা সরকারের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পেরেছে।

তবে যে বিষয়টি সব গণমাধ্যম চর্চা করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে, তা হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের সেলফ-সেন্সরশিপ। অর্থাৎ, যেসব তথ্যের সংবাদমূল্য আছে এবং যেগুলো জনগণের জানার অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে তথ্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলো প্রকাশ না করা।

অনেক গণমাধ্যম ইচ্ছাকৃতভাবে, আবার অনেকে ভয়ে ও সরকারের রোষানল এড়াতে অতিরিক্ত স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে দেশে অনেক গণমাধ্যম থাকলেও সঠিক তথ্য পাওয়া বা সত্য জানা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকে। সেদিন বিকাল থেকে দেশের সব গণমাধ্যম আবার স্বৈরাচারের কবল থেকে মুক্ত হয়, যা স্বাধীন সাংবাদিকতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের সুযোগ তৈরি করে।

১০

গণমাধ্যমের স্বাবলম্বিতা কীভাবে সম্ভব?

যে সময়ে সংবাদপত্র ছিল সংবাদের প্রধান বা মূল মাধ্যম, সেই যুগে সরকার সরকারি কারখানায় উৎপাদিত নিউজপ্রিন্ট ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহ করত। তাছাড়া ডাক, বিমান ও রেলপথে পত্রিকা পরিবহণে ভর্তুকি দেওয়া হতো এবং সংবাদ প্রেরণে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের মাশুলে ছাড় প্রদান করা হতো। কিন্তু সংবাদপত্র সেই যুগ পেরিয়ে এসেছে। প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশনা, সরবরাহ এবং পরিবেশন ব্যবস্থায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। বেসরকারি খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছে। ট্রাস্টের মালিকানাধীন এবং সরকারি অর্থে প্রকাশিত দুটি বা তিনটি দৈনিক এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সরকারের উপস্থিতি বলতে শুধু একটি টেলিভিশন চ্যানেল, একটি রেডিও স্টেশন এবং একটি সংবাদ সংস্থাকেই বোঝায়।

বিশ্বজুড়েই গণমাধ্যম এখন অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে। মুদ্রিত সংবাদপত্রের পাঠক কমছে, অনলাইনে পাঠক বাড়লেও সাবস্ক্রিপশন থেকে প্রত্যাশিত আয় বাড়ছে না। রেডিও ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর আয়ের মূল উৎস দর্শক বা শ্রোতা নয়। বিজ্ঞাপনের যে আয়ের ওপর ভর করে গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেছিল, সেটি এখন হুমকির মুখে। সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোয় বেসরকারি বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ চলে যাচ্ছে। সুনামির মতো এই আঘাতে বাংলাদেশের গণমাধ্যমও বিপর্যস্ত। আয় কোথা থেকে আসবে, ব্যয় সামলে কীভাবে টিকে থাকা যাবে, কারা বিনিয়োগ করবে এবং কীভাবে সেই বিনিয়োগ ব্যবসাসফল হবেড়এ বিষয়গুলো নিয়ে গণমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিকরা সংস্কার কমিশনের কাছে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা টিকে থাকার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং একটি উপযুক্ত ব্যবসায়িক মডেল খুঁজে বের করার ওপর জোর দিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে সরকারি সহায়তার প্রয়োজনীয়তাও তারা তুলে ধরেছেন।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া কঠিন। এর প্রধান কারণ, তাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্যের অভাব। যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যায়, অধিকাংশ গণমাধ্যমই লোকসান গুনছে। অর্থাৎ, খুব অল্পসংখ্যক গণমাধ্যমই মুনাফা অর্জন করে।

১০.১ লাভ-ক্ষতির চিত্র

রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ থেকে প্রাপ্ত মিডিয়া কোম্পানিগুলোর রেকর্ড থেকে জানা যায়, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই তাদের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী নিয়মিত জমা দেয় না। আবার যারা জমা দেয়, তাদের মধ্যেও অনেকের আয়, ব্যয় এবং লাভ-ক্ষতির বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্য উল্লেখ থাকে না। কোম্পানি আইন অনুযায়ী, প্রতিটি নিবন্ধিত কোম্পানির আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত বার্ষিক হিসাব জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং আইন অমান্য করলে জরিমানা বা পরিচালক পদ থেকে অপসারণের বিধান রয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। অনেকের আর্থিক বিবরণীতে মৌলিক তথ্য অনুপস্থিত থাকায় তাদের বার্ষিক মোট আয়, মোট খরচ ও নিট আয়ের প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায়নি। কিছু আর্থিক বিবরণী দেখলেই বোঝা যায়, সেগুলো নিজেদের সুবিধামতো তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে আসল তথ্য গোপন করার প্রবণতা দেখা যায়। কিছু গণমাধ্যমের সম্পদের পরিমাণ ও অন্যান্য আর্থিক বিষয়ে শুধু ভুলই নয়, বরং তাদের বার্ষিক টার্নওভারের চেয়ে মোট মুনাফা বেশি দেখা যায়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিট মুনাফা মোট মুনাফার চেয়েও বেশি। ব্যবসায় লাভ-ক্ষতির হিসাবে এমন ঘটনা অস্বাভাবিক। তবে কয়েকটি গণমাধ্যম পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করেছে, যা থেকে তাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা পাওয়া যায়। রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজের দপ্তরে জমা পড়া নিরীক্ষাকৃত হিসাব থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এখনো লাভজনক বলে দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে:

রেডিও	সংবাদপত্র	টেলিভিশন
রেডিও ধ্বনি	দৈনিক ইত্তেফাক	চ্যানেল ২৪
রেডিও ভূমি	সমকাল	মোহনা টিভি
রেডিও আমার	প্রথম আলো	দুরন্ত টিভি
জাগো এফএম	দৈনিক কালবেলা	গাজী টিভি
ঢাকা এফএম		চ্যানেল ৯
		মাছরাঙা টিভি
		সময় টিভি
		বাংলাভিশন
		চ্যানেল আই
		একুশে টিভি

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন লিমিটেডের ২০২২ সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পত্রিকাটির সে বছর মুনাফা ছিল ৬ লাখ ৬৭ হাজার টাকা। অন্যদিকে টাইমস মিডিয়ার সমকাল এবং চ্যানেল টুয়েন্টিফোর ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৬ কোটি ৬৩ লাখ টাকা মুনাফা অর্জন করেছে। একই অর্থবছরে, সময় টিভি ৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা এবং মাছরাঙা টিভি ২ কোটি ৪৪ লাখ টাকা মুনাফা লাভ করে। তবে প্রথম আলোর ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী, তাদের মুনাফা ছিল ৩২ কোটি টাকা। এদিকে দ্য ডেইলি স্টার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ কোটি ৮৯ লাখ টাকার কিছু বেশি লোকসান দেয়, যদিও তাদের করপূর্ব মুনাফা ছিল ৩২ হাজার টাকা। এর মানে হলো, প্রতিষ্ঠানটি আয় করলেও কর দেওয়ার পর বড় অঙ্কের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া প্রোডাকশন লিমিটেডের তথ্য অনুসারে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে এটিএন বাংলাসহ প্রতিষ্ঠানটি ১ কোটি ৯০ লাখ টাকার বেশি লোকসান করে। এফএম রেডিওর মধ্যে, রেডিও ধ্বনি ২০১৮ সালে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা, রেডিও ভূমি ২০১২ সালে ৬ লাখ ৩ হাজার টাকা, ঢাকা এফএম ২০১৬ সালে ৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা এবং রেডিও আমার ২০১৯ সালে ২ লাখ টাকা লাভ করে। এর মধ্যে 'রেডিও আমার'-এর নিট আয় মোট আয়ের চেয়ে বেশি, যা অস্বাভাবিক। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, অনেক গণমাধ্যম বছরের পর বছর লোকসান করা সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি। কেউ কেউ প্রতিবছর বড় ধরনের লোকসান করছে। ব্যবসায়ী হিসেবে, এমন লোকসান হওয়ার পরেও ব্যবসা চালু রাখার কথা নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, গণমাধ্যমের মালিকরা কেন দীর্ঘ সময় ধরে আর্থিক ক্ষতি সহ্য করছেন? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, এর পেছনে কি তাদের বিশেষ কোনো স্বার্থ বা উদ্দেশ্য রয়েছে? লোকসান হওয়ার পরও যদি অন্য কোনো লাভ বা সুবিধা পাওয়া যায়, তবে মিডিয়া চালু রাখাটাই স্বাভাবিক।

বেশকিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের কথা জানা যায়, যারা কয়েক বছর ধরে, এমনকি এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রতিমাসে কোটি টাকারও বেশি লোকসান গুনছে। কিন্তু তারা তাদের মিডিয়া চালু রেখেছেন। বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, যারা একাধিক গণমাধ্যমের মালিক, তারাও বছরের পর বছর লোকসান করছে, কিন্তু এসব গণমাধ্যম বন্ধ হয়নি এবং অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কোনো উদ্যোগও চোখে পড়ে না। যেমন, সবচেয়ে বেশি লোকসান করে বসুন্ধরার ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, এই গ্রুপ প্রায় সাড়ে ২৫ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। এস আলমের নেক্সাস টিভিও বড় ধরনের লোকসান গুনেছে। ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, এই চ্যানেল ৯ কোটি টাকা লোকসান করে। লোকসান করার পরও গণমাধ্যমগুলো চালু রাখার পেছনে কিছু কারণ কাজ করে। একটি গণমাধ্যম থাকার প্রথম সুবিধা হলো, এটি মালিকের (তার নিজের, পরিবারের ও ব্যবসার) রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে, নিজের, পরিবারের ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রচারণার কাজে লাগে, অবৈধ সুবিধা আদায় করা যায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে কর ফাঁকি দেওয়া সহজ হয়। এছাড়াও, মিডিয়া থাকলে সহজে কেউ ঘাঁটাতে আসে না, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা যায় এবং এটি হুমকির কাজেও ব্যবহার করা যায়। এমন অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে।

১০.২ রাজনৈতিক প্রভাব ও গোষ্ঠীস্বার্থ

গত তিন দশকে গণমাধ্যমের যে ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, তা মূলত বেসরকারি খাতের মাধ্যমেই হয়েছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও রেডিওতে পুঁজির বিনিয়োগ হয়েছে এবং গণমাধ্যমে আধুনিকায়ন ঘটেছে। তবে গণমাধ্যমে বিনিয়োগের উৎস নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন তোলা হয়নি। যে অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে, তার ওপর কর পরিশোধ করা হয়েছে কি না, অথবা ঋণখেলাপির দায়ে অভিযুক্ত কেউ ব্যাংক থেকে নতুন ঋণ নিয়ে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করছেন কি নাড়এসব প্রশ্নের উত্তর সরকার যেমন জানতে চায়নি, তেমনই বিনিয়োগকারীরাও বিষয়টি স্পষ্ট করেননি। অথচ বিশ্বজুড়ে এখন গণমাধ্যমের মালিক কারা, এই প্রশ্ন নাগরিকরা বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নে গণমাধ্যমের মালিকানার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে লাইসেন্স বা অনুমতি দেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি হয়েছে পর্দার আড়ালে, রাজনৈতিক যোগসাজশের মাধ্যমে।

ফলস্বরূপ, গণমাধ্যমে প্রবলভাবে রাজনৈতিক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে, গত দেড় দশকে ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্যে বাজারের চাহিদা যাচাই না করেই টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্রেও করপোরেট বিনিয়োগ এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, অনেক ব্যবসায়ী গোষ্ঠী নিজেদের ব্যবসাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য গণমাধ্যমকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং সরকারি দলের সমর্থনে সংবাদ পরিবেশনের জন্য সম্পাদকীয় নীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছেন। একই গোষ্ঠীর মালিকানায় একাধিক সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইন পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে গণমাধ্যমে গোষ্ঠীগত প্রভাব কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। এতে গণমাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা কমেছে এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ভিত্তিও দুর্বল হয়েছে। মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীরা এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন। তারা আরও বলেছেন, বাংলাদেশে গণমাধ্যম জগতে কেউ কেউ উন্নতি করলেও সামগ্রিকভাবে স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশ ঘটেনি। অতীতের কোনো সরকারই সুস্থ ধারার গণমাধ্যমের বিকাশের পথ সুগম করেনি, তবে গত দেড় দশকে বিচ্যুতির মাত্রা অনেক বেশি বেড়েছে।

১০.৩ উত্তরণের উপায় কী

গণমাধ্যমের উত্তরণের উপায় হিসেবে সবচেয়ে জোরদার পরামর্শটি হলো, গণমাধ্যমকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে চলার পথ খুঁজে পাবে। এর জন্য সরকারের নীতিগত সহায়তা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন মালিকানার স্বচ্ছতা। গণমাধ্যমের মালিকানা থেকে সম্পাদকীয় নীতিকে আলাদা করা জরুরি। মালিকরা আর্থিক সংস্থানের নিশ্চয়তা দেবেন, কিন্তু দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। একইভাবে, প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা মতামতে মালিকের ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকলে তার স্পষ্ট ঘোষণা থাকা প্রয়োজন। যার টাকা আছে একমাত্র তারই গণমাধ্যমে বিনিয়োগ করা উচিত, বিষয়টি এতটা সরল নয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনকল্যাণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচ্ছন্ন টাকার বিনিয়োগ এবং স্বচ্ছতা প্রয়োজন। বিনিয়োগ ও উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে গণমাধ্যমের ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ হবে এবং অসৎ উদ্যোক্তারা নিজেরাই বিদায় নেবেন। এতে গণমাধ্যমে সরকার ও মালিকের হস্তক্ষেপ অনেকাংশে কমবে। বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতা বিকশিত হবে, গণমাধ্যম শক্তিশালী হবে এবং প্রতিষ্ঠান টেকসই হবে।

অন্তত তিনজন মালিক-সম্পাদক-প্রকাশক এক্ষেত্রে একক মালিকানার চেয়ে যৌথ মালিকানার সুফলের কথা জানিয়েছেন। তাদের মতে, এর মাধ্যমে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বজায় থাকে, যা তাদের সাফল্যের মূল কারণ। এছাড়া অংশীজনদের পক্ষ থেকে আরও কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

- ⇨ স্টক মার্কেটে নিবন্ধন উৎসাহিত করা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো উদ্যোক্তা পরিচালকদের শেয়ার ধারণের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির কারণে উদ্যোক্তা মালিকদের ব্যবসা পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে।

- ইন্দোনেশিয়ার মতো সব গণমাধ্যম কোম্পানিতে সাংবাদিক-সংবাদকর্মীদের মালিকানার অংশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা।
- নতুন উদ্যোগের ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বদলে একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর যৌথ উদ্যোগকে অগ্রাধিকার।
- ব্যাংকসহ বিভিন্ন শিল্প ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় নন-প্রফিট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন।
- মালিক কোম্পানি, প্রকাশক, সম্পাদক ও সাংবাদিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টীকরণ।
- সংবাদপত্র সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়া ।
- ব্যাংক ঋণ সহজলভ্য করা।
- সহজ শর্তে কম সুদের ঋণ, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ স্কিমের আওতায় বিভিন্ন শিল্প ও সেবা খাত পেয়ে থাকে
- এই শিল্পে বিনিয়োগে কর রেয়াত দেওয়া।
- সরকারি বিজ্ঞাপনের হার অন্তত ১০ গুণ বাড়ানো।
- ফ্যাক্ট চেকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য তাদের সহায়তা প্রয়োজন।

১১

প্রস্তাবিত জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন

১১.১ বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা, মানোন্নয়ন এবং সাংবাদিকতার নীতিমালার লঙ্ঘন বা বিচ্যুতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রতিকারের জন্য রয়েছে প্রেস কাউন্সিল অব বাংলাদেশ। ১৯৭৪ সালের প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত। সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন প্রদান কিংবা বাতিলের বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির ক্ষমতাও প্রেস কাউন্সিলের রয়েছে। প্রিন্টিং প্রেসেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টের সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেস কাউন্সিলকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়। অন্যদিকে, সম্প্রচারমাধ্যমের ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করার কথা সম্প্রচার কমিশনের, যা গঠনে সরকারের অনাগ্রহ দেখা যায়।

১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কার্যকারিতা নিয়ে সব মহলেই অসন্তোষ বিদ্যমান। মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মানোন্নয়নের কথা ঘোষিত লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানুষের তথ্য জানার অধিকার, সাংবাদিকদের সুরক্ষা এবং প্রকাশিত সংবাদের কারণে মানহানির অভিযোগের প্রতিকারে তেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। কমিশনের জিজ্ঞাসার জবাবে বর্তমান কাউন্সিল জানিয়েছে, এ পর্যন্ত তারা ৪১০টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে এবং বর্তমানে ৯টি মামলা চলমান রয়েছে।

প্রেস কাউন্সিলের আইনগত ক্ষমতা অপ্রতুল এবং কার্যত 'ভর্ৎসনা' করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বারবার অপরাধ করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা কাউন্সিলের নেই। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রেস কাউন্সিল সারাদেশে কর্মরত সাংবাদিকদের ডেটাবেস তৈরির উদ্যোগ নেয় এবং অনলাইন নিবন্ধনের ঘোষণা দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। বিজ্ঞপ্তিতে সাংবাদিকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতাও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। তবে ২০২৩-২৪ সালের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে এ পর্যন্ত কতজন নিবন্ধিত হয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। মতবিনিময় সভায় মাঠ পর্যায়ের সাংবাদিক, প্রশাসনের কর্মকর্তা, এমনকি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও সারাদেশে কর্মরত সাংবাদিকদের একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্রীয় ডেটাবেসের জোর দাবি জানিয়েছেন। প্রেস কাউন্সিল মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের জন্য একটি 'কোড অব এথিক্স' বা আচরণবিধিও প্রণয়ন করেছিল, যদিও এর বাস্তবায়ন তারা নিশ্চিত করতে পারেনি।

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন ঢাকা ও বিভাগীয় কেন্দ্রগুলোতে যেসব মতবিনিময় সভা করেছে, সেখানে স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে গণমাধ্যম যাতে নিজেদের জবাবদিহি ও দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করে, এমন মতামত উঠে এসেছে। সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের কারণে গত দেড় দশকে প্রেস কাউন্সিল কার্যত একটি দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষাপটে একটি প্রকৃত স্বাধীন তদারকি বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আলোচিত হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সাংবাদিকতার মানের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসূত্র না থাকলেও প্রেস কাউন্সিল বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে কুমিল্লা ও গোপালগঞ্জে সেমিনার আয়োজন এবং ২২টি জেলায় প্রেস ক্লাবে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বই প্রদানের কর্মসূচি পালন করেছে।

গণমাধ্যমের একটি বিরাট অংশ সম্প্রচারমাধ্যম ও অনলাইন প্রেস কাউন্সিলের আইনগত এখতিয়ারের বাইরে থাকায়, সব গণমাধ্যমের সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের একটি অভিন্ন তদারকি ব্যবস্থার অধীনে আনার প্রস্তাব এসেছে। এই অভিন্ন তদারকি প্রতিষ্ঠান একদিকে মুক্ত সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে, অন্যদিকে পেশাজীবীদের জবাবদিহির একটি কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যেখানে একটি 'কোড অব এথিক্স' বা আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তা অনুসরণ সংক্রান্ত বিচ্যুতি বা ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনের প্রতিকার করা হবে।

১১.১.১ সম্প্রচার নীতিমালা ও কর্তৃপক্ষ

বেসরকারি খাতে টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল উন্মুক্ত করার পর দেশে ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের দ্রুত প্রসার ঘটে। এক্ষেত্রেও চাহিদা ও বিজ্ঞাপনের বাজার বিবেচনা না করে রাজনৈতিক প্রভাবে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে লাইসেন্স দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে একদিকে টেলিভিশন ও রেডিওগুলোর বেশির ভাগই বাণিজ্যিকভাবে যেমন সফল হতে পারেনি, তেমনই কিছু টেলিভিশন চ্যানেলের বিরুদ্ধে একপেশে দলীয় প্রচারযন্ত্রের ভূমিকা পালনের অভিযোগও উঠেছে।

গণ-অভ্যুত্থানের পর কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল গণরোষের শিকার হয়েছে। আন্দোলন চলাকালে সরকারি মালিকানার বিটিভি'র প্রধান কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একাধিক বেসরকারি চ্যানেলের কার্যালয় ও স্টুডিও আক্রান্ত হয়েছে। বেসরকারি খাতের এফএম রেডিওগুলো শুরুর কয়েক বছর ভালো করলেও বর্তমানে অনেকটাই প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেছে। সম্প্রচার নীতিমালায় সম্প্রচার কমিশনের কথা বলা হলেও তা এখনো গঠিত হয়নি। নীতিমালায় বহুমত প্রকাশসহ বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতার শর্ত থাকলেও ইলেকট্রনিকমাধ্যমগুলোয় তার যথাযথ চর্চা হয়নি।

১১.১.২ গণমাধ্যমের দায় ও বিধিবিধান: বৈশ্বিক উত্তম চর্চার নমুনা

আন্তর্জাতিক আইন ও উন্নত গণতন্ত্রের দেশগুলোতে সংবাদমাধ্যমে যেকোনো তদারকি বা নিয়ন্ত্রণকেই সন্দেহের চোখে দেখা হয়, বিশেষ করে যদি তাতে সরকারের কোনো ভূমিকা থাকে। কারণ, এর মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের একটি পথ তৈরি হয়। সেই ঝুঁকি সত্ত্বেও বাংলাদেশের মতো দীর্ঘদিন কর্তৃত্ববাদী বা স্বৈরাচারী শাসন থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলোয় নিবন্ধনের যৌক্তিকতা এখনো রয়েছে। কারণ, এসব দেশে পশ্চিমা দেশগুলোর মতো স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার বিকাশ এখনো হয়নি। সেজন্য বিদ্যমান আইনি কাঠামো সংস্কার করে সুস্থ ধারার সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনার যোগ্য।

ইউরোপিয়ান মিডিয়া ফ্রিডম অ্যাক্ট

ইউরোপীয় ইউনিয়ন নতুন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে সদস্য দেশগুলোয় গণমাধ্যমের বহুত্ববাদ এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কিছু নতুন নিয়ম চালু করেছে। গত বছরের ৭ মে এই আইনটি কার্যকর হয়েছে এবং চলতি বছরের ৮ মে থেকে এর সম্পূর্ণ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে। ইউরোপীয় মিডিয়া ফ্রিডম অ্যাক্ট ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলোর সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যম যেন সীমান্ত পেরিয়ে অবাধে কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করা ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিষয় নিশ্চিত করবে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- সম্পাদকীয় স্বাধীনতা রক্ষা করা;
- সাংবাদিকদের ওপর আড়ি পাতা বা নজরদারির প্রযুক্তি (স্পাইওয়্যার) ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের তথ্যের উৎসের গোপনীয়তার অধিকার নিশ্চিত করা;
- পাবলিক সার্ভিস মিডিয়ার কার্যকর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা;
- গণমাধ্যমের মালিকানার স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা;
- বৃহৎ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক অযৌক্তিকভাবে অনলাইন থেকে কোনো সংবাদ সরিয়ে দেওয়া বা কনটেন্ট অপসারণের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমকে সুরক্ষা দেওয়া;
- গণমাধ্যম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপনে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা দেওয়া;
- সদস্য রাষ্ট্রগুলো মূল গণমাধ্যমের বাজারে কেন্দ্রীকরণ মিডিয়ার বহুত্ববাদ এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতার ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, তার মূল্যায়ন করা; এবং
- মিডিয়া পরিষেবা প্রদানকারী এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য দর্শক পরিমাপে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা।

এই আইনে সদস্য দেশগুলোর জাতীয় মিডিয়া নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি নতুন স্বাধীন ইউরোপীয় মিডিয়া সার্ভিসেস বোর্ড গঠনের কথা বলা হয়েছে, যা গত ফেব্রুয়ারিতে কাজ শুরু করেছে।

ভারত

ভারতের প্রেস কাউন্সিল সরকারি অর্থের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৮-এর ১৬ ধারায় অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে বলা হয়েছে। ওই ধারায় নিবন্ধিত সংবাদপত্র এবং বার্তা সংস্থাগুলোর কাছ থেকে তাদের প্রচারসংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত হারে লেভি আদায় করা হয়। এছাড়াও, কাউন্সিল তার বিভিন্ন সেবার জন্য যেসব ফি পায়, সেই অর্থও তাদের তহবিলে যোগ হয়। সরকার, অবশ্য, পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে বার্ষিক অনুদান দিয়ে থাকে। ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের এই আর্থিক স্বনির্ভরতা তার স্বাধীনতাকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক মনোনীত হন না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের স্পিকার এবং প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন কাউন্সিল সদস্য মিলে চেয়ারম্যান নির্বাচন করেন।

ইন্দোনেশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে জাতীয় পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচিত সম্মানিত সাংবাদিকদের সমন্বয়ে ২০১৬ সালে 'ইনডিপেনডেন্ট প্রেস কাউন্সিল অব ইন্দোনেশিয়া' গঠিত হয়েছে। দেশটির স্বাধীন প্রেস কাউন্সিল আইন অনুযায়ী, এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত সব সংবাদমাধ্যম মানতে বাধ্য। ইন্দোনেশিয়ার প্রেস কাউন্সিল গণমাধ্যম সংক্রান্ত বেশির ভাগ আপত্তিই আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করতে সক্ষম। ১৯৯৯ সালে প্রণীত প্রেস অ্যাক্টের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এই কাউন্সিল গঠিত হয়েছে সাংবাদিক, গণমাধ্যম কোম্পানির কর্মকর্তা ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে, যাদের মধ্য থেকে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই আইনে 'কোড অব এথিক্স', অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি, অভিযোগের জবাব লেখার নিয়ম এবং সাংবাদিকদের আইনি সুরক্ষার রূপরেখা দেওয়া আছে। পরবর্তীতে ২০২৪ সালে 'স্টুডেন্ট জার্নালিস্ট' ও তাদের প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট মানহানির অভিযোগ নিষ্পত্তির দায়িত্বও প্রেস কাউন্সিল গ্রহণ করে, যাতে এ ধরনের অভিযোগ পুলিশ বা আদালতে পাঠানোর প্রয়োজন না হয়।

স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য আর্থিক স্বাধীনতা প্রয়োজন, যার নিশ্চয়তা রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার প্রেস কাউন্সিল আইনে। এতে বলা হয়েছে, প্রেস কাউন্সিলে অর্থায়ন করবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও করপোরেট মালিক (প্রেস করপোরেশন)। তবে সরকার ও অন্যান্য সংস্থা থেকেও শর্তহীন অনুদান নেওয়া যাবে। প্রেস কাউন্সিলের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে: অন্যদের হস্তক্ষেপ থেকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা করা, গণমাধ্যমের স্থায়িত্ব ও পেশাদারি মানের উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা, সাংবাদিকতার আচরণবিধি প্রণয়ন ও তার প্রতিপালন তদারকি করা, প্রকাশিত সংবাদ নিয়ে মানুষের অভিযোগ নিষ্পত্তি করা এবং মালিক প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেস তৈরি করা। প্রেস অ্যাক্টে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব প্রেস)-এর পরিধি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের নীতিমালার ভিত্তিতে মানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাকে দেখা হয়েছে। এই আইনে জাতীয় গণমাধ্যমে কোনো ধরনের সেন্সরশিপ, সংবাদ প্রচারে বিধিনিষেধ আরোপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে তথ্যের উৎস/সূত্র গোপন রাখার (রাইট অব রিফিউজাল) অধিকার যেমন রক্ষা করা হয়েছে, তেমনই প্রকাশিত তথ্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবাব বা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রত্যাখ্যানের অধিকারও (রাইট অব রিপ্লাই) সংরক্ষিত রয়েছে। প্রকাশিত তথ্যের ভুল সংবাদমাধ্যমের নিজ দায়িত্বে সংশোধন করার বাধ্যবাধকতাও এতে আরোপ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমের কাজের পরিধিও বিশদভাবে উল্লেখ করে এই আইনে বলা হয়েছে, তথ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমগুলো একেকটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন) হিসেবেও কাজ করবে। (ক্যামব্রিজ ডিকশনারির ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ইকোনমিক ইনস্টিটিউশন বলতে এমন একটি কোম্পানি বা সংস্থাকে বোঝায়, যা একটি অর্থনীতিতে অর্থ নিয়ে কারবার করে অথবা টাকা, পণ্য অথবা

সেবা বিতরণব্যবস্থায় নিয়োজিত।) মানুষের জানার অধিকার পূরণ করার পাশাপাশি সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে জনমত তৈরি, জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশ্লেষণ, সমালোচনা ও সমাধানের পরামর্শও দেবে গণমাধ্যম। সাংবাদিকদের কোড অব এথিক্স মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। আর প্রত্যেক সাংবাদিকের পছন্দমতো পেশাগত সংগঠনে যোগ দেওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে এ আইনে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেস আইনে, দেশটির যেকোনো নাগরিক একটি গণমাধ্যম কোম্পানি গঠন করতে পারে, যা প্রেস করপোরেশন হিসেবে দেশটির আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত হবে। তবে প্রেস করপোরেশনে সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মীদের মালিকানা (শেয়ার) ও মুনাফার অংশ প্রদানসহ অন্যান্য উপায়ে প্রণোদনা দিতে হবে। এই আইনে গণমাধ্যম কোম্পানিতে বিদেশি বিনিয়োগ আনার পথও খোলা রাখা হয়েছে, তবে তা হতে হবে স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে।

শ্রীলঙ্কা

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ শ্রীলঙ্কার গণমাধ্যমের পরিস্থিতির সঙ্গে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের যথেষ্ট মিল রয়েছে। সেই দেশটিতেও সরকারি দলের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠী সম্প্রচার লাইসেন্স পেয়ে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করেছে, যা স্বাধীন সাংবাদিকতার পথকে রুদ্ধ করেছে। একই গোষ্ঠীর হাতে একাধিক সংবাদমাধ্যমের মালিকানা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সরকারি দলের রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থ দেশটির সংবাদমাধ্যমে প্রাধান্য পেয়েছে। এর ফলে জনগণের বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতমুক্ত খবর পাওয়ার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

২০১৫ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে দশকব্যাপী কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের পর, দেশটির গণমাধ্যমকে স্বাধীন, বহুত্ববাদী ও বৈচিত্র্যময় করে তোলার উপায় বের করতে গঠিত 'মিডিয়া রিফর্ম সেক্রেটারিয়েট' একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেছে। 'রি বিল্ডিং পাবলিক ট্রাস্ট' নামক প্রতিবেদনে দেশটির নীতি, আইন ও কাঠামোগত সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো, মূলধারার গণমাধ্যম যেন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে টিকে থাকার মতো ব্যবসায়িক মডেল তৈরি করতে পারে, ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহি করে এবং জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতহীন তথ্য উপস্থাপন করে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করতে পারে। একই সঙ্গে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীর সুরক্ষা, প্রচলিত ধারার গণমাধ্যমের সঙ্গে নতুন করে বিকাশমান ডিজিটাল ও ওয়েবভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়সহ নানা বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেকাংশেই প্রাসঙ্গিক।

সম্প্রচার মাধ্যমের লাইসেন্স প্রদান ও তদারকির জন্য আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে, যা সংসদের মাধ্যমে দেশটির জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে। সংস্থাটি যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সঙ্গে চলতে পারে, সেজন্য স্পষ্ট আইনি কাঠামো তৈরির কথা বলা হয়েছে। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সংস্থা না থাকায়, দেশটির মিডিয়া মন্ত্রণালয়ের হাতেই রয়ে গেছে ব্রডকাস্ট মিডিয়ার নীতিনির্ধারণ, নিয়ন্ত্রণ এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্র মালিকানার সম্প্রচারমাধ্যমগুলোর পরিচালনার ভার। বহুত্ববাদী মতপ্রকাশে উৎসাহিত করার কোনো দায়ও ছিল না মন্ত্রণালয়টির। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমগুলোকে সত্যিকার অর্থে জনসেবামূলক সম্প্রচারকারী (পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার) হিসেবে রূপান্তরের যে দাবি নাগরিক সমাজ ও অধিকারকর্মীরা করে আসছিলেন, তা উপেক্ষিত ছিল দেশটিতে।

সামগ্রিকভাবে, গণমাধ্যমের জন্য স্বাধীন মিডিয়া কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পরামর্শ শ্রীলঙ্কায়ও উচ্চারিত হয়েছে। এই সংস্থাটির দায়িত্ব হবে সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা। এতে পেশাদারি মূল্যবোধের ভিত্তিতে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব জবাবদিহি ব্যবস্থা তৈরি ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। সম্পাদকীয় নীতিতে স্পষ্টভাবে সম্পাদকীয় ও ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে আলাদা রাখার ঘোষণা রাখতে হবে।

শ্রীলঙ্কায় আরও আগে থেকেই মানহানিকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা বন্ধ হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম। দেশটির মিডিয়া মিনিস্ট্রি গণমাধ্যমের জন্য 'কোড অব এথিক্স' তৈরি করে দিলেও পরে সেটি বাতিল করা হয়। দেশটির সম্পাদকদের সংগঠন থেকে 'কোড অব প্রোফেশনাল প্র্যাকটিস' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এখন কার্যকর রয়েছে।

জবাবদিহিতা ও স্বনিয়ন্ত্রণ

ইউরোপে আইনকানুনের কড়াকড়ির চেয়ে পেশার ভেতর থেকেই জবাবদিহিতার উত্তম চর্চা নিশ্চিত করার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এখন গুরুত্ব পাচ্ছে গণমাধ্যমের আত্মসমালোচনা। সাংবাদিকরাই সাংবাদিকদের কাজের সমালোচনা করেন, এক মিডিয়া অন্য মিডিয়ার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অন্যকে শুধরে দিয়ে নিজেদের মধ্যে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানো। এককথায়, নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। এতে যদিও পেশাদারি দিকটা দেখা হয়, তবুও যেসব দেশের মিডিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব বেশি, সেখানে সাংবাদিকরা অন্য সাংবাদিকদের কাজের প্রকাশ্য সমালোচনা করতে চান না। কারণ, এটিকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে এবং এর ভিন্ন অর্থ দাঁড় করানো হবে। আমাদের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে এখানে মিল পাওয়া যায়। পেশাগত পরিচয়ের চেয়ে রাজনৈতিক পরিচয়ই অনেক ক্ষেত্রে বড় করে তোলা হয়। ফলে, গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে নির্মোহ পেশাদারি সমালোচনা এখানে তেমন দেখা যায় না। অথচ বিরুদ্ধ সময়ে, বিশেষ করে নানারকম মাধ্যমের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মিডিয়ার আত্মসমালোচনাকে কোনো কোনো গবেষক 'ফিফথ এস্টেট' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অনলাইনে পাঠক-দর্শকদের সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়াকে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে গণমাধ্যম পেশায়। বিশেষ করে তরুণ সাংবাদিক এবং যারা অনলাইন বা ডিজিটাল মিডিয়ায় কাজ করে, তারা খোলামনে এসব সমালোচনা গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে ফেসবুক, এক্স-এ অপমানজনক মন্তব্যও আসে। তবুও, এসব ফিডব্যাক থেকে দর্শকদের পছন্দ-অপছন্দ যাচাই করা যায়, যা কনটেন্ট পরিকল্পনায় কাজে লাগে। অন্যদিকে, মূলধারার সংবাদমাধ্যম এবং প্রথাগত তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোও এ ধরনের কঠিন অনলাইন সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু হয়। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, ইতালিতে এই প্রবণতা দেখা যায়। তবে ফিনল্যান্ডে এ ধরনের সমালোচনা কম, কারণ দেশটিতে প্রতিষ্ঠিত পুরোনো গণমাধ্যমের ওপর মানুষের যথেষ্ট আস্থা রয়েছে।

প্রেস কাউন্সিল এমনিতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা ও সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য দেখাতে পারে নি। আবার সংবাদপত্রের ভুলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও সংক্ষুব্ধ কারো প্রতিকার পাওয়ার প্রতিষ্ঠান হিসাবে জন আস্থা অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু বর্তমানে বিকাশমান ইলেকট্রনিক মাধ্যম টেলিভিশন, বেতার ও অনলাইনের সাংবাদিকতাও তাদের এখতিয়ারভুক্ত নয়। এসব মাধ্যমের জন্য বিগত সরকার সম্প্রচার কমিশন করার কথা বললেও তা করেনি। এই বাস্তবতায় প্রেস কাউন্সিল ও সম্প্রচার কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সম্মিলন একটি স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশন করার কথা অংশীজনদের আলোচনায় উঠে এসেছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি কাযর্কর বিকল্প হতে পারে। তবে তা হবে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

১২

গণমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক হওয়ার যোগ্যতা

বাংলাদেশে গণমাধ্যমের অভূতপূর্ব ও বিশৃঙ্খল বিকাশের কারণে সাংবাদিকতার গুণগত মান ক্রমশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে চলেছে। নীতি-নৈতিকতা, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারের অভাব, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ এবং অতি-রাজনীতিকরণের কারণে সাধারণভাবে সাংবাদিকতার মান নিম্নমুখী হয়ে আছে। এর সঙ্গে বিদ্বেষতাড়িত প্রতিশোধপরায়ণতার কারণে অপসাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমের অপব্যবহার সাংবাদিকতা পেশাকে কিছুটা হলেও কলুষিত করেছে। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব মতবিনিময় সভা করেছে, প্রায় সব জায়গায় পেশার মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আকুতি শোনা গেছে। প্রকাশক, সম্পাদক এবং সাংবাদিকদের যোগ্যতা নির্ধারণের দাবি উঠেছে, পেশার পরিচয়ের অপব্যবহার রোধে জাতীয় ভিত্তিতে সাংবাদিকদের একটি রেজিস্টার বা ডেটাবেইস তৈরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্টে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিতদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ছিল, যা এখনো প্রাসঙ্গিক হতে পারে। এতে বলা হয়েছে, সাংবাদিকদের বিশেষ সমীহের চোখে দেখার একটা প্রবণতা সমাজে লক্ষ করা যায়। তবে সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদ পরিবেশনায় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার ব্যর্থতার কারণে মানুষের উঁচু প্রত্যাশার স্তরে পৌঁছাতে পারেন না। এজন্য সামগ্রিকভাবে মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি দায়ী। অভিযোগ রয়েছে, একবার গণমাধ্যমে জায়গা করে নিতে পারলেই সাংবাদিকরা মনে করেন, তারা যথেষ্ট দায়িত্বশীল আছেন, তাদের নতুন করে দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দিতে হবে না। ইউরোপের সাংবাদিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের পেশাগত শৃঙ্খলাবোধের তুলনা দিয়ে ওই রিপোর্টে বলা হয়, উন্নত দেশে কোনো অবস্থাতেই, তা যত জরুরি সংবাদ সংগ্রহের জন্যই হোক না কেন, তাদের কোনো ধরনের অনিয়ম মেনে নেওয়া হয় না। তবে এখানে সাংবাদিকরা নিয়ম ভেঙে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। সংবিধানে সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ মর্যাদা বা অগ্রাধিকারের বিধান নেই। সাংবাদিকদের বিশেষ খাতির দেখানোর প্রবণতা বরং এখানকার সামাজিক ব্যবস্থার দুর্বলতারই পরিচায়ক। সাংবাদিকরা তাদের সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই প্রশংসা অর্জন করবেনড় এমনটাই বলা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

এই পেশার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রাখা উচিত এবং কোনো আপস ছাড়াই তা অর্জনে সচেষ্ট থাকার কথা বলেছে ১৯৮৪-এর প্রেস কমিশন রিপোর্টে, যা মূলত মুদ্রিত সংবাদমাধ্যমের কথা মাথায় রেখেই করা। তবে মৌলিক বিষয়গুলোতে সব গণমাধ্যমের জন্যই এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, সাংবাদিকতা পেশার লক্ষ্য হলো এমন একটা নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় অবদান রাখা, যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার বিরাজ করবে। ওই কমিশনের মতে, সমাজের কল্যাণে মতপ্রকাশ ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার চর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত দায়িত্বশীলতার চর্চা।

১২.১ সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠান

আধুনিক সংবাদপত্রে উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের পেছনে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন যেমন রয়েছে, তেমনই ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদকীয় নীতির সম্পর্ক নির্ধারণ করে সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, মালিক বা প্রতিষ্ঠাতার অধিকার রয়েছে তাঁর সংবাদপত্রে তাঁর চিন্তা-আদর্শের প্রতিফলন দেখার। তবে তার অর্থ এই নয় যে, সম্পাদক আক্ষরিক অর্থেই মালিক বা উদ্যোক্তার এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। সংবাদপত্রের নীতি ও আদর্শ রক্ষার দায় অবশ্যই সম্পাদকের ওপর থাকবে। সম্পাদকের নিয়োগপত্র বা চুক্তিপত্রে পত্রিকার সাধারণ নীতির উল্লেখ থাকবে, যাতে সম্পাদকের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে। চুক্তিপত্রে নেই এমন কোনো নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা সম্পাদকের থাকতে হবে। মতবিরোধ দেখা দিলে বা নিয়োগের অবসানের

পরিস্থিতির উদ্ভব হলে উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের কাছে সুরাহার জন্য যাওয়ার বিধান থাকা দরকার চুক্তি বা নিয়োগপত্রে। এতে সম্পাদকের যখন তখন চাকরিচ্যুতির একটি সম্মানজনক সমাধানের পথনির্দেশনা থাকে।

ওই কমিশন স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, সম্পাদকের পেশা একটি সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। যা কিছু ছাপা বা প্রকাশিত হবে, তার পুরো দায় তার। একই সঙ্গে পুরো প্রতিষ্ঠানের ওপর একচ্ছত্র কর্তৃত্বও তার থাকবে। যদি তিনি পূর্ণ সময় দিতে না পারেন, তাহলে তার সরে যাওয়া শ্রেয়। স্বাধীন অবস্থান ধরে রাখার জন্য দায়িত্ব পালনকালে তাকে সব ধরনের পক্ষপাত বা পূর্বধারণা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। পত্রিকা মালিকের সম্পাদক হওয়ার প্রশ্নে ওই কমিশনের মত ছিল, তিনি যদি সার্বক্ষণিক সময়ের জন্য সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন, কেবল তখনই তিনি সেই দায়িত্ব নিতে পারেন। ব্যবসায়ীদের খণ্ডকালীন বা নামমাত্র সম্পাদক হওয়ার যে প্রবণতা এখনো দেখা যায়, তা মোটেও কাম্য নয়।

এদেশে সংবাদপত্রের বিকাশের শুরুতে সাংবাদিক নিয়োগে সুসংগঠিত কোনো মানদণ্ড ছিল না। সংশ্লিষ্ট কাজে দীর্ঘসময়ের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তবে সময়ের বিবর্তনে সংবাদপত্রে নিয়োগ নীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগও প্রসারিত হতে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৮৪ সালের প্রেস কমিশন বিস্তারিত নিয়োগ নীতি প্রণয়নে গুরুত্ব দিয়েছিল। ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে না পারলেও মানসম্মত সাংবাদিকতার জন্য উচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এটিও বলা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, পেশাগত ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলেই কেউ ভালো সাংবাদিক হয়ে যাবেন, এমন নয়। কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতি, একাগ্রতা, মর্যাদাবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই যোগ্য সাংবাদিক গড়ে উঠতে পারে।

তবে সামগ্রিকভাবে সাংবাদিকতা পেশার কাজের ধরন, দায়িত্ববোধ বিবেচনা করে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, উচ্চপর্যায়ের শিক্ষার শক্ত ভিত্তি ও পেশাগত প্রশিক্ষণ আছেএমন ব্যক্তিদেরই এই পেশার জন্য বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করেছে প্রেস কমিশন। পাশাপাশি এই পেশার জন্য নিয়মানুবর্তিতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণেরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তবু কোনো মানদণ্ড নির্দিষ্ট করে না দিয়ে প্রথম প্রেস কমিশন সরকার, পেশাগত সংগঠন, সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকদের সংগঠন, প্রশিক্ষণ সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে সাংবাদিক নিয়োগ নীতি প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিল। নিয়োগের জন্য যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার কথাও বলেছিল কমিশন।

১২.২ সাংবাদিকদের যোগ্যতার প্রশ্ন

স্পষ্টতই কোনো সরকারই এ ধরনের নিয়োগ নীতি প্রণয়ন করেনি। সম্পাদকদের সংগঠনও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি এবং সাংবাদিকতা পেশার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করে কোনো জাতীয়ভিত্তিক নীতি তৈরির চেষ্টাও করা হয়নি। সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকেও এ ধরনের কোনো দাবি ওঠেনি। কার্যত প্রতিটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান নিজস্ব নীতি বা নিয়মে সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মীদের নিয়োগ করে থাকে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে কঠিন বাছাই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মেধার প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হয়, আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া হচ্ছে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভাগিয়ে নিয়ে আসা অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই লোক নিয়োগ করা। যাচাই-বাছাই ছাড়া লোক নিয়োগের পেছনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, তারা কাজ শুরু করলে সবকিছু শিখে নিতে পারবে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই কোনো প্রশিক্ষণ কর্মসূচি থাকে না। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষানবিশ কর্মীরা হয়তো ভুল থেকে শিক্ষা নেন, কিন্তু প্রকাশনা বা সম্প্রচারে সাংবাদিকতার মান মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

সংবাদপত্রের সংখ্যাধিক্য, মানের ক্রমাবনতি ও সংবাদমাধ্যমের অনুমতিপত্র বা লাইসেন্সের অপব্যবহার, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক ও অবৈধ আর্থিক সুবিধা নেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রবল অভিযোগের প্রেক্ষাপটে কারা গণমাধ্যমের

মালিক, সম্পাদক ও সাংবাদিক হতে পারবেন, তার একটি গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত নীতিমালা নির্ধারণের পরামর্শ উঠে এসেছে অংশীজনদের কাছ থেকে। বিশেষ করে, রাজধানী ঢাকার বাইরে কর্মরত গণমাধ্যম সাংবাদিকদের কাছ থেকে এই পরামর্শ জোরালোভাবে এসেছে। তারা বলেছেন, কোনো রকম পেশাগত যোগ্যতা ছাড়াই অনেকে সাংবাদিক বনে যাচ্ছেন। তাদের অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। শুধু সংবাদমাধ্যমের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রে প্রভাব বিস্তার করে অনৈতিক আর্থিক সুবিধা নিচ্ছেন, এমন অভিযোগ প্রায় সব বিভাগীয় ও মাঠ পর্যায়ের বৈঠকে এসেছে। কোনো নিয়োগপত্র বা বেতনের নিশ্চয়তা ছাড়া পরিচয়পত্র দেওয়ার বেশি অভিযোগ বেসরকারি টেলিভিশন ও অনলাইন পোর্টালের বিরুদ্ধে।

তাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ে প্রভাব খাটিয়ে মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা ও নিজেদের অনৈতিক আর্থিক লাভের অভিযোগ উঠেছে। এতে সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যমের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। তাঁরা বলেছেন, অনেক আয়োজকরা এখন কোনো অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানাতে ভয় পান, কারণ অসংখ্য অনলাইনভিত্তিক 'সাংবাদিক' পরিচয় দানকারীসহ যেকোনো অনুষ্ঠানে অনাহূত সাংবাদিকদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয় তাদের। একই রকমের মতামত দিয়েছেন জেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। প্রেস কাউন্সিল ২০২২ সালে সাংবাদিকদের নিবন্ধনের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, তাতে সাংবাদিকদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে স্নাতক ডিগ্রির কথা বলা হয়েছিল। এটি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উনীত করার প্রস্তাব এসেছে। তবে ঢাকার বাইরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি করে সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহীর সংখ্যাও খুব নগণ্য।

১২.৩ যুক্তিযুক্ত যোগ্যতায় সম্পাদক?

সরকারের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি ও নিরীক্ষা নীতিমালা ২০২২-এ সম্পাদকের যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে, যেখানে বলা হয়েছে, ধারাবাহিকভাবে অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ব্যবহারকারী সাংবাদিক হিসেবে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। সাংবাদিক হিসেবে পাঁচ বছর অ্যাক্রিডিটেশন কার্ডের ব্যবহার সম্পাদক হওয়ার যোগ্যতার একমাত্র পূর্বশর্ত কীভাবে নির্ধারিত হতে পারে, তা বোঝা কঠিন। বিশেষত, এই কার্ডের অপব্যবহারের যে গুরুতর অনিয়মের কথা সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, তাতে সাংবাদিকতা না করেও যে অতীতে এই কার্ড অনেকে পেয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আর প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্টে সম্পাদকের যোগ্যতার ক্ষেত্রে 'যুক্তিযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী অথবা সাংবাদিকতায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক বছরের অভিজ্ঞতা'র কথা বলা রয়েছে। আপাত উদার এই আইন যদিও সংবাদপত্র প্রকাশনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, এর অপব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে।

১২.৪ গণমাধ্যমের মালিকানার শর্ত

সংবাদপত্র বা অনলাইনের প্রকাশক অথবা সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো পূর্বযোগ্যতার বিষয়টি একেবারেই অস্পষ্ট। এসব বিষয়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমবিষয়ক আইনকানুন খুবই উদার বলে মনে হয়। সংবাদপত্রের প্রকাশক হওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অ্যাক্টে বলা হয়েছে, নাবালক নন, আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত নন, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দণ্ডিত নন এবং নিয়মিত প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান আছে-এমন যে কেউ সংবাদপত্রের প্রকাশক, মুদ্রাকর ও স্বত্বাধিকারী হতে পারবেন। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এরকম কোনো শর্তের কথা নেই।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, গণমাধ্যমের মালিক হওয়া মূলত নির্ভর করে গোয়েন্দা সংস্থার তদন্ত প্রতিবেদন ও আর্থিক সক্ষমতার ওপর। কার্যত, অলিখিত এই দুটি শর্তের ক্ষেত্রেই বড় ধরনের গলদ রয়েছে। যে কারণে গণমাধ্যমে বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে ধোঁয়াশা রেখেই লাইসেন্স মিলেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্সের আবেদনে উদ্যোক্তারা লিখেছেন, নিজস্ব সম্পদ ও ব্যাংক ঋণ থেকে তারা প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবেন। তাদের ওই নিজস্ব সম্পদ কর পরিশোধিত আয় থেকে অর্জিত কি না, তার কোনো ঘোষণা তাদের দিতে হয়নি এবং কর পরিশোধের সনদও দাখিল করতে হয়নি। ঋণখেলাপি হিসেবে এখন যাদের কথা সবার মুখে মুখে

আলোচিত হচ্ছে, তারাও কথিত নিজস্ব সম্পদ (যা আত্মসাৎকৃত ব্যাংক ঋণ সূত্রেও অর্জিত হতে পারে) এবং নতুন ব্যাংক ঋণের কথা বলেছেন।

সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কোনো উৎস জানানোর বাধ্যবাধকতা নেই। শুধু ব্যাংকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আমানত থাকার প্রমাণ দিতে হয়। সরকারের নীতিমালায় আছে, সরকার সময়ে সময়ে এই আমানতের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে। সরকারি নথিতে দেখা যায়, ১৯৮৪ সালের ২৯ জুলাই একটি এসআরও জারি করে সর্বশেষ এটি নির্ধারিত হয়েছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিকের ক্ষেত্রে পাঁচ লাখ টাকা এবং অন্যান্য শহর থেকে দুই লাখ টাকা। বলাই বাহুল্য, শুধু বর্তমান বাজার নয়, তখনকার দিনেও ওই টাকায় কোনো দৈনিক পত্রিকার তিন মাসের প্রকাশনা ও পরিচালন ব্যয়ের সংস্থান হতো না। আর্থিক দায়ের দিক থেকে এত সহজ শর্তে দৈনিক পত্রিকা বের করা সম্ভব হওয়ায় শত শত দৈনিকের আবির্ভাব ঘটেছে, যাদের অধিকাংশের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বিজ্ঞাপনে ভাগ বসানো। গত কয়েক দশকে বেশ হাঁকডাক দিয়ে এমন কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যারা সম্ভাবনাময় ও সৃষ্টিশীল তরুণদের সাংবাদিকতা পেশায় আকৃষ্ট করে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেকারত্বের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

অনলাইন সংবাদ পোর্টালের ক্ষেত্রেও এখন এই প্রবণতা প্রকট হয়েছে। অনলাইন পোর্টালের উদ্যোক্তা, সম্পাদক ও সাংবাদিকরা অনেকেই এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা একটি কার্যকর নীতিমালা ও তদারকি/নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের কথা বলেছেন। সরকার অনলাইন নীতিমালা ও তার সংশোধিত নীতিমালায় আর্থিক সংগতির কথা বললেও, তাতে অস্পষ্টতা রয়েছে। কোনো নির্দিষ্ট অঙ্কের বিনিয়োগের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়নি।

নতুন ধারার উদ্যোগ

মূলধারার (মেইনস্ট্রিম) বা পুরোনো (লিগ্যাসি) গণমাধ্যমের পাশাপাশি নতুন ধারার কিছু উদ্যোগ অবশ্য এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যার মূল উদ্দেশ্য জনস্বার্থে (পাবলিক ইন্টারেস্ট) সাংবাদিকতা। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা (আল-জাজিরা) এবং বিশেষত, কয়েকটি ব্যতিক্রমী গণমাধ্যম, যাকে অনেকে 'এক্সাইল মিডিয়া' অভিহিত করে থাকেন (যেমন নেত্র নিউজ), তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এ ধরনের নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। গণচাঁদার ওপর নির্ভরশীল এই মডেল থেকে প্রতিবেশী ভারতে একাধিক গণমাধ্যম (ক্যারাভান, দ্য প্রিন্ট, ওয়্যার) জনস্বার্থের ব্যতিক্রমী সাংবাদিকতার নজির তৈরি করেছে। তবে, এখনো তা মূলধারার বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি।

বিভিন্ন পর্যায়ে মতবিনিময় সভায় পরামর্শ ও বৈশ্বিক উত্তম চর্চার আলোকে কিছু প্রস্তাব উঠে এসেছে, যা গণমাধ্যম কমিশন করতে পারে-

- ⇨ ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত এবং ঋণখেলাপি প্রকাশক ও সম্পাদকের অযোগ্য হবেন।
- ⇨ সম্পাদক হওয়ার জন্য মূলধারার সংবাদপত্রে অন্তত ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- ⇨ সাংবাদিকতার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকে নির্ধারণ
- ⇨ পেশায় শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগদানের পর নিয়োগকর্তা প্রতিষ্ঠান তার পেশাগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে ।
- ⇨ সারাদেশে কর্মরত সাংবাদিকদের একটা কেন্দ্রীয় ডেটাবেস গণমাধ্যম কমিশন সংরক্ষণ করবে।

১৩

সরকারি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

১৩.১ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রথিতযশা সম্পাদকদের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ প্রেস কমিশনের (১৯৮৪) রিপোর্টে সাংবাদিকদের পেশাগত উৎকর্ষসাধনের বিষয়ে বলা হয়েছে, গণমাধ্যমের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব কেবল সার্বিক পেশাগত উৎকর্ষের মধ্য দিয়ে, যার ভিত্তি বস্তুনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সংবাদ ও মন্তব্য-বিশ্লেষণের পরিবেশন। এটি নির্ভর করে সাংবাদিকদের উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও যথাযথ পেশাগত প্রশিক্ষণের ওপর, তা সে দেশে বা বিদেশে, কাজ শুরুর আগে বা পরে যেভাবেই অর্জিত হোক। সেসময়ে একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ (১৯৬২ থেকে) এবং প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত) থেকে নিয়মিত সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, ডিপ্লোমা ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অনেক সাংবাদিক অবশ্য আরও আগে থেকেই যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর পাশাপাশি ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কাসহ বিভিন্ন দেশ থেকেও সাংবাদিকতা ও ফটোগ্রাফির প্রশিক্ষণ নিয়ে আসতেন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশে এসেও বিদেশিরা প্রশিক্ষণ দিয়ে যেতেন। ১৯৮৪ সালের কমিশন রিপোর্টে সাংবাদিকতা পেশায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির জন্য দেশে উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল। এই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি এখনো প্রাসঙ্গিক বললে বস্তুত কম বলা হবে। বরং, দক্ষতার অভাব ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি বর্তমানে প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে।

বাংলাদেশে গত দুই-তিন দশকে গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব বিস্তার, প্রসার ও রূপান্তর ঘটেছে, তা অনেকটা অপরিকল্পিত। বিশ্ব বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলানোর একটি অসংগঠিত প্রয়াস, যা স্বৈরশাসকের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও দূরভিসন্ধির কারণে কলুষিত হয়েছে। দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। সাংবাদিকতার গুণগত মানের উন্নতি না হয়ে বরং ক্রমাগত অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং গুণগত দিক থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) অন্যতম।

পিআইবি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতা বিষয়ে গবেষণা, প্রকাশনা এবং দেশব্যাপী সাংবাদিকদের পেশাগত মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করাই পিআইবির প্রধান কাজ। ১৯৭৬ সালের ১৮ই আগস্ট একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে পিআইবি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন ২০১৮ জাতীয় সংসদে পাস হয়ে ২৯ জুলাই, ২০১৮ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন ২০১৮-তে প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'সাংবাদিকতা বিষয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা, গবেষণা ও প্রকাশনা, সম্মাননা প্রদান এবং সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।' তবে, আইনে সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পেশাগত মানোন্নয়নের কথা বলা হলেও তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে সরকারের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং গণযোগাযোগ কর্মীদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটে তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

- ⇨ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগে কর্মরত জনসংযোগ কর্মকর্তা বা কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত সাংবাদিক, তথ্য ও গণমাধ্যমকর্মী বা উন্নয়ন ও যোগাযোগ কর্মী এবং গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান।
- ⇨ সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট প্রদান।

- ⇨ সাংবাদিকতা বিষয়ে সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য ডিগ্রি কোর্স পরিচালনা এবং সনদ প্রদান।
- ⇨ প্রশিক্ষণ, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি কোর্স পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কোর্স ডিজাইন, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়ন করা।
- ⇨ প্রশিক্ষণ বা কোর্স পরিচালনা, গবেষণা ও প্রকাশনা এবং সাংবাদিকতা পেশার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলাসহ প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- ⇨ সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য কোনো ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান।
- ⇨ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্যে গঠিত তথ্যায়নভিত্তিক ইউনিটসহ ইন্টারঅ্যাকটিভ ওয়েবসাইট, ডিজিটাল মিউজিয়াম, ডিজিটাল আর্কাইভ, লাইব্রেরি ও পাঠাগার স্থাপন এবং গণমাধ্যম রেফারেন্স ও তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা।
- ⇨ সংবাদপত্র, বার্তা সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন, তথ্যকেন্দ্র এবং গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা ও পরামর্শক সেবা প্রদান।
- ⇨ গণমাধ্যম সম্পর্কিত সাংবাদিকতা বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকার কিংবা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের অনুকূলে মতামত বা পরামর্শ প্রদান করা।
- ⇨ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিকতা, গণযোগাযোগ ও গণমাধ্যম সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং তৎসম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত এবং প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ।
- ⇨ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস ও পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্য বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত ও অনুমোদিত হারে ফিস্ধ গ্রহণ করা।
- ⇨ ইনস্টিটিউটের কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা।
- ⇨ ইনস্টিটিউটের কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও সম্মেলনের আয়োজন ও পরিচালনা করা।
- ⇨ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, ইনস্টিটিউটের উপর অর্পিত অন্য যে কোনো দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করা।

প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার সময় দেশের প্রথিতযশা সম্পাদকবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির নেতৃত্বে ছিলেন, যাদের মধ্যে আবদুস সালাম, তোয়াব খান, এবিএম মূসা, শহীদুল হক, আমানউল্লাহ ও আহমেদ হুমায়ূনের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে বিভিন্ন সময়ে সরকারি কর্মকর্তারাও প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষপদে আসীন হয়েছেন। সম্ভবত, সে কারণেই প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাসূচি বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সাংবাদিকতা পেশার পাশাপাশি সরকারের তথ্য কর্মকর্তাদের জনসংযোগ কৌশলও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গণমাধ্যমশিল্পে ঠিক কী ধরনের প্রশিক্ষণের চাহিদা বেশি এবং কোন ধরনের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির কোনো জরিপ বা গবেষণা আছে কি না তা জানা যায়নি। তবে মাঠ পর্যায়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভাগুলোয় প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সুলভ করা ও সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত ঢাকাকেন্দ্রিক হওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার চাহিদা পূরণে এর সামর্থ্য অপ্রতুল।

পিআইবির ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকদের জন্য মোট ১৭৮২টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজিত হয়েছে। অর্থাৎ, বছরে গড়ে ৩৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। চলতি শতাব্দীর শুরু থেকে পিআইবি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি ই-লার্নিং কোর্সও চালু রয়েছে। 'নিরীক্ষা' নামের একটি সাময়িকী প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে, যার এ পর্যন্ত ২৪৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। একসময়ে দেশের সকল জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং কিছু আঞ্চলিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠানটিতে আর্কাইভ করা হতো। তবে গত দশকে তা সংকুচিত হয়ে দেশি-বিদেশি মিলিয়ে মাত্র ২৪টি দৈনিক পত্রিকা ও ১০টি সাময়িকী সংরক্ষণে নেমে এসেছে। পিআইবির লাইব্রেরিতে গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা, গণযোগাযোগ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রায় ১৪ হাজার বইয়ের সংগ্রহ রয়েছে।

পিআইবির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সিংহভাগ সময় নবাগত ও মধ্যম পর্যায়ের সাংবাদিকদের জন্য ব্যয় হয়। নবাগতদের মৌলিক প্রশিক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া যৌক্তিক হলেও বার্তা কক্ষের ব্যবস্থাপক এবং সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনকারীদের জন্য সংবাদজগতের দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন করা এবং পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম করে তোলার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সংবাদমাধ্যমের কার্যক্রমের নিয়মিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়নেও প্রতিষ্ঠানটি ভূমিকা রাখতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় সকল গণমাধ্যমের নেতৃস্থানীয়দের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে এই খাতের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার যে আবশ্যকতা রয়েছে, সেখানেও প্রতিষ্ঠানটি তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি, বিধিবদ্ধ ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর মতোই পিআইবিতেও দলীয় রাজনীতির প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। রাজনৈতিক কারণে দলীয় আদর্শের অনুসারীদের নিয়োগ এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদের পদচ্যুতি একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও প্রতিষ্ঠানটির মনোযোগ ও সম্পদ ব্যয় হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৪৯ সাল থেকে সংবাদপত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য, বিবৃতি ও কাজ সম্পর্কিত খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, মতামতের সংকলন প্রকাশের জন্য একটি আলাদা প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু সপ্তম খণ্ড: ১৯৭০' প্রকাশিত হয়েছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির ২৫ বছর পূর্তিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন' দুই খণ্ডে ছাপা হয়েছে।

১৩.২ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (নিমকো)

ইউএনডিপি, ইউনেস্কো এবং আইটিইউ-এর সহায়তায় বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রকল্প হিসেবে ১৯৮০ সালে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের (নিমকো, সাবেক জাতীয় সম্প্রচার একাডেমি) যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশে তথ্য পরিষেবা ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের একমাত্র সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এই ইনস্টিটিউট বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান এবং প্রকৌশলবিষয়ক ও তথ্য সার্ভিসের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

নিমকোর সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত কর্মশালাসহ ১৪৫৭টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, যেখানে মোট ২৮,৪৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাত্র ১৮টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়েছে, যাতে ৩৭৫ জন অংশগ্রহণ করেন। একই প্রতিবেদনে ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের এক-তৃতীয়াংশ ছিল নারী। প্রতিবেদনে প্রকাশিত প্রশিক্ষণ কোর্সের তালিকা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, এর কিছু বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যা শুধু সরকারি তথ্য কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য। এই ধরনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণকেন্দ্রের জন্য এটি কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে সম্প্রচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষকদের আদৌ কোনো উপযোগিতা আছে কি না, তা বিবেচ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নিমকো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য কমিশন প্রতিষ্ঠানটির শীর্ষ কর্তাদের মতবিনিময় সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। কিন্তু, তারা সময় দিয়েও নির্ধারিত দিনে উপস্থিত হননি এবং তাদের কর্মসূচি রক্ষায় অক্ষম হওয়ার কারণও কমিশনকে জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। স্পষ্টতই, এটি ছিল গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের কাজে অসহযোগিতার এক ব্যতিক্রমী নিদর্শন।

ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইটে উল্লেখ আছে, বেসরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি যারা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত, তারা এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারেন। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কর্মরত সম্প্রচার ও যোগাযোগ কর্মীদের দক্ষতা ও কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে সম্প্রচার, চলচ্চিত্র ও গণযোগাযোগ কর্মকাণ্ডের উন্নতি সাধন জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণ ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের সময়োপযোগী উন্নয়ন এই ইনস্টিটিউটের প্রধান দায়িত্ব। উন্নয়ন যোগাযোগকে আরও গতিশীল ও বস্তুনিষ্ঠ করে তোলা এর অন্যতম কর্তব্য।

ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, বিভিন্ন বেসরকারি টিভি ও বেতার চ্যানেলও ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু, কয়টি বেসরকারি টিভি ও রেডিও নিমকোর কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে, অথবা বেসরকারি খাতের সম্প্রচার মাধ্যমের কতজন সংবাদকর্মী ও কলাকুশলী প্রতিষ্ঠানটি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তার কোনো নির্দিষ্ট তথ্য তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে নেই।

প্রতিষ্ঠানটি তাদের কার্যক্রমের যে বিবরণ দিয়েছে, তা হলো:

ক. অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও সংবাদকর্মীদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার সম্প্রচার কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়ন।

খ. উন্নয়ন সম্প্রচার, উন্নয়ন যোগাযোগ, বেতার ও টেলিভিশনসহ চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ. ইলেকট্রনিক মাধ্যম ও চলচ্চিত্র বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং উপাত্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

ঘ. বেতার, টেলিভিশন এবং গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে পরামর্শ, উপদেশ ও সেবা প্রদান।

ঙ. উন্নয়ন সম্প্রচার ও যোগাযোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত আলোচনাসভা, কর্মশালা এবং উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা।

চ. ইউনিসেফসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে উন্নয়ন-যোগাযোগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পাঠ্যধারার আয়োজন ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেওয়া।

ছ. সমধর্মী কার্যক্রম পরিচালনায় অন্যান্য সংস্থার (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) সঙ্গে সম্পর্ক এবং সমন্বয়সাধন।

জ. ভিডিও এবং অডিও টেপ এবং নির্দেশিকাসামগ্রী সমৃদ্ধ তথ্যব্যাংক স্থাপন করা।

ঝ. বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং জনসংযোগের মাধ্যমে উন্নয়ন যোগাযোগ ও উন্নয়ন-সম্প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো পরামর্শ ও সেবা প্রদান।

ঞ. বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক ও চলচ্চিত্র মাধ্যমের আদর্শ মানোন্নয়নের সহায়ক অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

ট. দর্শক-শ্রোতা গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঠ. বেসরকারি সংগঠন, ব্যক্তি এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা প্রদান।

১৩.৩ নিমকোর কর্মপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা, পরিবেশনা, নির্মাণ ও প্রকৌশল ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট পাঠ্যধারার ব্যবস্থা রয়েছে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, তথ্য অধিদপ্তর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এর অন্যতম দায়িত্ব। এই পাঠ্যধারাসমূহ তিন পর্যায়ের কর্মীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা অনুযায়ী বিন্যস্ত; যারা-

১. তত্ত্বাবধায়কের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন (স্তর-১)

২. তত্ত্বাবধান ব্যতীত দায়িত্ব পালন করেন (স্তর-২)

৩. নিজেরাই তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কাজ করেন (স্তর-৩)

নিমকোর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে:

বেতার ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান, বেতার ও টেলিভিশন প্রকৌশল, টেলিভিশনের জন্য ইএনজি/ইএফপি, উন্নয়ন সম্প্রচার, বেতার ও টেলিভিশন মাধ্যম শিক্ষা সম্প্রচার, বেতার ও টেলিভিশনের জন্য অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, বেতার ও টেলিভিশন নাটক, বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে কৃষিবিষয়ক প্রামাণ্য অনুষ্ঠান ও প্রামাণ্যচিত্র, বেতার ও টেলিভিশনের জন্য পাণ্ডুলিপি লিখন, বেতার ও টেলিভিশনে জনসংখ্যা যোগাযোগ অনুষ্ঠান, টেলিভিশন শিল্প নির্দেশনা ও গ্রাফিক্স, ক্যামেরা চালনা ও আলোকসম্পাত, ডিজিটাল ফটো সাংবাদিকতা, তথ্য ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, প্রমিত বাংলা উচ্চারণ ও বানান, মাঠ সম্প্রচার, মিডিয়া ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গণযোগাযোগ ও আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, চলচ্চিত্র (পাণ্ডুলিপি, পরিচালনা, চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ), সম্প্রচার ব্যবস্থাপনা, দর্শক-শ্রোতা গবেষণা ও অনুষ্ঠান মূল্যায়ন, নন-লিনিয়ার এডিটিং, ভিডিও অনুষ্ঠান প্রযোজনা কৌশল, ডিজিটাল পদ্ধতি, গ্রামীণ মহিলাদের জন্য সম্প্রচার, সংবাদ প্রতিবেদন লিখন, পঠন ও সম্পাদনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ কৌশল, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন যোগাযোগ, প্রশিক্ষণের ফলাফল যাচাই ও মূল্যায়ন, ইংরেজি ভাষাঃ কথন, লিখন রীতি ও পেশাগত ব্যবহার ও অপব্যবহার।

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউ এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম ছাড়াও এআইবিডি, এসকাপ, ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, আরটিআই, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় অথবা যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘ হলেও নিমকোর বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে যেসব কার্যক্রমের বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে বেসরকারি খাতের সম্প্রচার মাধ্যমের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষাক্রম নির্ধারণের সামঞ্জস্য আছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বেসরকারি খাতের দক্ষতার ঘাটতি কোন পর্যায়ে এবং তা পূরণে বিশেষ কী কী কার্যক্রম নেওয়া প্রয়োজন, সে ধরনের কোনো চাহিদা যাচাই বা জরিপ কখনো করা হয়েছে বলে জানা যায় না। বেসরকারি খাতের সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে টেলিভিশন ও বেতারের অনুষ্ঠান/আধেয় নির্মাণে যে দৈন্য বা সংকট দেখা যায়, তা অনেকটাই লাঘব হতো।

১৩.৪ নিমকোর গবেষণা কার্যক্রম

নিমকোর সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে গবেষণা কার্যক্রমের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে বলা হয়েছে, 'দর্শক-শ্রোতার মতামতের ভিত্তিতে সম্প্রচার যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে এ পর্যন্ত গবেষণা সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবছর ২টি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।' তবে প্রকাশিত গবেষণার যে তালিকা নিমকোর ওয়েবসাইটে আছে, তাতে মাত্র তিনটি গবেষণা প্রতিবেদন রয়েছে এবং সেগুলো যে খুব সমৃদ্ধ, সে কথা বলা যাবে না।

১৩.৫ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই) গণমাধ্যম শিল্পের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার একটি সাম্প্রতিক উদ্যোগ। ২০১৩ সালের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইনের মাধ্যমে ২০১৭ সালে এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনে প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণে দক্ষ ও যোগ্য নির্মাতা এবং কলাকুশলী সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ডিগ্রি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা' করা প্রয়োজন।

এই ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য স্পষ্টতই চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের নির্মাতা ও কলাকুশলীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের যোগ্য করে তোলা, বিশেষ করে ভিজ্যুয়াল বা দৃশ্যধারণ/নির্মাণের বিভিন্ন কলাকৌশল, সম্পাদনা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে। টেলিভিশন এবং অনলাইন মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকতায় এই ভিজ্যুয়াল দিকটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তবে প্রথাগত চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সংবাদ প্রতিবেদন তৈরির মধ্যে একটি বড় পার্থক্য থাকায় প্রশিক্ষণ চাহিদাতেও ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক। সেদিক থেকে, সাংবাদিকতায় নিয়োজিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের

সঙ্গে বিসিটিআই-এর যোগসূত্র অনেকটাই সীমিত। ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব ও কার্যাবলির তালিকায়ও সাংবাদিকতার কোনো উল্লেখ নেই।

আইনে বলা আছে, 'ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে'। তবে এর পরিচালনা বোর্ডের গঠন সম্পর্কে যে বিধান রয়েছে, তাতে এটি কার্যত তথ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অধিদপ্তর বা বিভাগের মতোই একটি অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। ফলে সরকারের ইচ্ছা ও নির্দেশনার বাইরে স্বাধীন গণমাধ্যমের বিকাশ ও তাকে শক্তিশালীকরণে বিসিটিআই-এর ভূমিকা রাখার সুযোগ সীমিত।

১৪

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা ও শ্রম আইন

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিক মতবিনিময় সভাগুলোর সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। তাদের মতে, সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না গেলে সৎ, সাহসী, বস্তুনিষ্ঠ এবং স্বাধীন সাংবাদিকতা সম্ভব নয়। এছাড়া কমিশনের ওয়েবসাইটে দেশজুড়ে আসা পরামর্শগুলোতেও বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা মূলত তাদের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের গত পাঁচ দশকের গণমাধ্যম বিকাশে সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তার দিকে তেমন নজর দেওয়া হয়নি। বর্তমানে অধিকাংশ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তি বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন। তবে তাদের মধ্যে খুব কমই সাংবাদিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা এবং সুযোগ-সুবিধার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দিয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী সব পেশার শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও পেশাগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা থাকলেও গত ৫৪ বছরে গণমাধ্যমকর্মীদের ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এর মূল কারণ, অন্যান্য পেশায় শ্রম আইন যতটা প্রয়োগ হয়েছে, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তা একেবারেই অপ্রতুল। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন্স অব সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়নি। এছাড়া প্রেস কাউন্সিলকেও সাংবাদিকদের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার বিষয়ে কোনো ভূমিকা বা এখতিয়ার দেওয়া হয়নি।

সাংবাদিক-কর্মচারীদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সময় ওয়েজ বোর্ড গঠিত হলেও এর বাস্তবায়নে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। কিছু পত্রিকা এখনো পঞ্চম ওয়েজ বোর্ডের বেতন কাঠামো অনুসরণ করে, আবার কিছু প্রথম সারির পত্রিকা নির্ধারিত কাঠামোর চেয়ে বেশি সুবিধা দেয়। নবম ওয়েজ বোর্ড ঘোষিত হলেও তা শুধু বাসসে পূর্ণভাবে ও ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসে আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে, অন্য কোথাও নয়। সংবাদপত্র মালিক সমিতির মামলায় এর বাস্তবায়ন গত ছয় বছর ধরে আটকে আছে। এছাড়া মালিকদের সংগঠন (নোয়াব) ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে দুর্নীতির কারণে অসম প্রতিযোগিতার অভিযোগ এনেছে।

THE BANGLADESH GAZETTE, EXTRA., SEPTEMBER 28, 1986 10655

B. Modified Pay Scales for Newspaper and News Agency Employees:

Category.	Grades.	Scales of Pay.
Category 'A' ..	Special Grade	4500—200—5900
	Grade I	3700—150—5200.
	Grade II	2700—125—3325—EB—150—4075
	Grade III	1700—100—2300—EB—125—3050
	Grade IV	1400—80—1880—EB—100—2480
	Grade V	1200—60—1560—EB—80—2040
	Grade VI	1000—50—1350—EB—60—1770
	Grade VII	800—40—1080—EB—50—1430
Category 'B' ..	Special Grade	3700—150—5200
	Grade I	2700—125—3325—150—4075
	Grade II	1700—100—2300—EB—125—3050
	Grade III	1400—80—1880—EB—100—2480
	Grade IV	1200—60—1560—EB—80—2040
	Grade V	1000—50—1350—EB—60—1770
	Grade VI	800—40—1080—EB—50—1430
	Grade VII	700—40—980—EB—50—1330

C. Gradation of Newspaper and News Agency Employees :

(a) Gradation of Journalists :

(i) Newspapers and Periodicals :

Grade.	Posts to be included in the Grade.
Special Grade Editor	
Grade I	Executive Editor, News Editor, Assistant Editor, Feature Editor, Leader Writer, Managing Editor, Special Correspondent, Senior Cartoonist.
Grade II	Joint News Editor, Chief Reporter, Chief Sub-Editor, Senior Sub-Editor, Senior Reporter, Senior Correspondent, Bureau Chief, Chief Photographer, Senior News Photographer, Senior Artist, Cartoonist, Sports Editor, Film Editor, Commerce Editor, Muffussil Editor, Editorial Assistant, Reader-in-charge/Chief Reader.
Grade III	Sub-Editor, Staff Reporter, Phtographer, Staff Correspondent, Artist, Senior Reader.
Grade IV	Apprentice Sub-Editor, Apprentice Staff Reporter/Correspondent, Reader.

অষ্টম ওয়েজ বোর্ড কাগজে-কলমে বাস্তবায়িত হলেও অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকার বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এসেছে। এক্ষেত্রে অষ্টম ওয়েজ বোর্ডের বেতন ব্যাংকিং চ্যানেলে দিয়ে পরবর্তী কর্মদিবসে এর একটি অংশ (৩০-৪০ শতাংশ) নগদে ফেরত নেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। সরকারি বিজ্ঞাপনে বাড়তি অর্থ লাভের জন্য যোগসাজশে ওয়েজ বোর্ড

বাস্তবায়নের মিথ্যা প্রত্যয়নপত্র তৈরি হচ্ছে, কিন্তু এর সুবিধা সাংবাদিক-কর্মচারীরা পাচ্ছেন না। ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ডিএফপি কর্মকর্তা, মালিকপক্ষ এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের কিছু ব্যক্তি জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা ওয়েজ বোর্ডে উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ করেছেন।

সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও চাকরির সুরক্ষার বিষয়টি শুধু গত ৫৪ বছরে করা যায়নি, তা নয়। স্বাধীনতার আগে পাকিস্তান আমলেও সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ছিল না। ১৯৫৯ সালে পাকিস্তান প্রেস কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে বলা হয়েছে যে (মহকুমা, জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে কর্মরত সাংবাদিক) মফস্বল সাংবাদিকদের যে শ্রেণি রয়েছে, তাদের খুবই কম পরিমাণে বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও অনেক প্রথম সারির সংবাদপত্র তাদের মফস্বল সাংবাদিকদের কোনো ওয়েজ বোর্ড দিত না বলে উঠে এসেছে বাংলাদেশের প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্টে। সেই সময়ের ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী, একজন জেলা সংবাদদাতা মাসে মাত্র ১৫০ টাকা সম্মানি পেতেন। পত্রিকায় ছাপা নিউজের প্রতি কলাম লাইনে দেওয়া হতো মাত্র ৪০ পয়সা। অবশ্য সে সময়ে মফস্বল সংবাদদাতাদের খণ্ডকালীন (পার্ট-টাইমার) হিসেবে গণ্য করা হতো।

১৯৮৬ সালে যে ওয়েজ বোর্ড ঘোষিত হয়, সেখানে প্রথমবারের মতো ঢাকার (রাজধানীর) বাইরের সাংবাদিকদের জন্য একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বেতন-কাঠামোর সুপারিশ করা হয়। এই ওয়েজ বোর্ডে জেলা শহরের সাংবাদিকদের জন্য প্রতি মাসে ৫০০ টাকা রিটেইনার অ্যালাউন্স, প্রিন্টে ছাপা প্রতি কলাম লাইনের জন্য ১ টাকা, একটি ছবির জন্য ৫০ টাকা, মাসে ৭৫ টাকা চিকিৎসা ভাতা, মাসিক যাতায়াত ভাতা ১০০ টাকা, রিটেইনার অ্যালাউন্সের সমান উৎসব ভাতা এবং যথাযথ পোস্টাল খরচ ও টেলিফোনের বিল প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির উচ্চহার ও অন্যান্য কারণে ঢাকায় জীবনযাপনের ব্যয় যে হারে বেড়েছে, সেই তুলনায় সাংবাদিক-কর্মচারীদের প্রকৃত মজুরি মোটেও বাড়েনি। ১৯৬৩ সালে সাংবাদিকদের সর্বনিম্ন গ্রেডের ন্যূনতম বেতন ছিল প্রথম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তার বেতনের সমান। কিন্তু বর্তমান বেতন কাঠামোয় কোনো মিল নেই। আবার মফস্বল শহরে জীবনযাপনের ব্যয় ঢাকার চেয়ে কম হলেও মফস্বল শহরের সাংবাদিকদের যে বেতন-ভাতা দেওয়া হয়, তাও বর্তমান জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একেবারেই অপ্রতুল। অনেক ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরের সংবাদদাতাদের কোনো বেতনই দেওয়া হয় না। তাদের রিপোর্ট ছাপা হলে তার জন্য সামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, কিন্তু তাও অনিয়মিত। বর্তমান বাস্তবতায় মফস্বলের সাংবাদিকতা পেশা আর কোনোভাবেই খণ্ডকালীন নেই। ঢাকার ২৪ ঘণ্টার বার্তাকক্ষের চাহিদা মেটাতে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকতার নানারকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়।

বাংলাদেশ সাংবাদিকদের পেশাগত স্বীকৃতি, আর্থিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষার সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে এখন পর্যন্ত তা শ্রম আইনেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিগত সরকারের সময়ে গণমাধ্যমকর্মী আইন নামে একটি নতুন আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। তবে তা নিয়ে জনমত যাচাই বা অংশীজনদের সঙ্গে যথেষ্ট আলোচনা হয়নি। গণমাধ্যমকর্মী আইনের খসড়ায় দেখা যায়, সামান্য কিছু বিষয় ছাড়া তাতে হুবহু শ্রম আইনের ধারাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শ্রম আইন কার্যকর করায় কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণেই সংবাদপত্র শিল্পে সাংবাদিক-কর্মচারীদের স্বীকৃত অধিকারসমূহের ক্রমাগত লঙ্ঘন ঘটে চলেছে। আবার গণমাধ্যম শিল্প এখন সংবাদপত্রের বাইরেও অনেক বেশি বিস্তৃত। কিন্তু সেই অংশে কাজ করা গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো জাতীয় নীতিমালা তৈরি হয়নি। ফলে বিপুল সংখ্যায় গণমাধ্যমকর্মী প্রতিনিয়ত বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন এবং প্রতিকার পাচ্ছেন না।

নব্বই দশকে দেশে বেসরকারি টেলিভিশনের বিকাশ ঘটলেও এখন পর্যন্ত সরকারি টেলিভিশন, বেতার, বেসরকারি টেলিভিশন ও রেডিওতে কর্মরত সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বেতন-কাঠামো বা সুযোগ-সুবিধার বিধান তৈরি হয়নি। সংবাদপত্র এবং বেসরকারি টেলিভিশন, বেতার, এফএম রেডিও কিংবা কমিউনিটি রেডিওর সাংবাদিকদের বেতন কাঠামোতে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ও অন্যান্য সংবাদ সংস্থা ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের খুবই অল্প বেতন-ভাতা দিয়ে থাকে।

গত কয়েক দশকে প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ইন্টারনেটের বিকাশে সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে গণমাধ্যমের নতুন ধারার উন্মেষ ঘটেছে। ছাপা পত্রিকা কমে এসেছে। সংবাদপত্রের আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশন (অনলাইন, মাল্টিমিডিয়া, আইপি টিভি, ইন্টারনেট রেডিও) হয়েছে। ফলে অসংখ্য অনলাইনভিত্তিক গণমাধ্যম বাজারে এসেছে। অসংখ্য গণমাধ্যম নিবন্ধন নিয়ে কিংবা নিবন্ধন ছাড়াই আত্মপ্রকাশ করেছে। সাংবাদিকের সংখ্যাও নাটকীয়ভাবে বেড়েছে, যাদের অনেকেরই পেশাগত যোগ্যতা নেই। আবার অনেকেই ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করছেন। সেই সঙ্গে উপযুক্ত বেতন-ভাতা না পাওয়ার জন্য সাংবাদিকতার নামে আপস করা, অপসাংবাদিকতা, হলুদ সাংবাদিকতা, ভুল তথ্য ছড়ানো, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে জিম্মি করা, অর্থ আদায়, সম্মানহানি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লাগা, নিজের প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অবৈধ ব্যবসাকে রক্ষা করা, রাজনৈতিক নেতা কিংবা দলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার মতো অসংখ্য অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন অনিয়ম, কিংবা বিশেষ সুবিধা নেওয়ার তদবিরে সাংবাদিকদের কাজে লাগানোয় প্রশাসন চাপের মুখে পড়ে। একজন জেলা প্রশাসক কমিশনের কাছে অনুরোধ করেছেন যে, এসব শিল্পগোষ্ঠীর গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ বন্ধে যেন পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বর্তমান সাংবাদিকতায় বহুবিধ দক্ষতা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। একজন সাংবাদিককে একই সঙ্গে প্রতিবেদন লেখা, ছবি তোলা, ভিডিও তৈরি ও সম্পাদনা এবং অনলাইনে প্রকাশের কাজ করতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাংবাদিকদের তৈরি কনটেন্টের কপিরাইট প্রায়ই লঙ্ঘিত হচ্ছে। অনেক মিডিয়া, এমনকি প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যমও মূল প্রতিবেদকের কৃতিত্ব না দিয়ে তাদের সংবাদ হুবহু নকল করছে। কপিরাইট লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া হাজসগুলোও কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয় না। কপি নকল করা রোধের সফটওয়্যার ব্যবহার এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হলেও এসব প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন।

অনলাইনে কর্মরত সাংবাদিকদের পাঠানো সংবাদ, ছবি বা মাল্টিমিডিয়া কনটেন্টের জন্য আজও কোনো সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি। বেশির ভাগ গণমাধ্যম অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদের জন্য অর্থ প্রদান করে না, যদিও কিছু প্রতিষ্ঠান এ প্রথা চালু করেছে। সংবাদপত্রের বেশির ভাগ খবর এখন ডিজিটাল সংস্করণে ছাপা হয়, যার ফলে অনলাইন নিউজের জন্য সাংবাদিকদের সম্মানি প্রায় অর্ধেক কমে গেছে। এতে প্রান্তিক সাংবাদিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

২০১৭ সালে সরকার জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা (২০২০ সালে সংশোধিত) প্রণয়ন করলেও সেখানে সাংবাদিকদের তৈরি কনটেন্টের আর্থিক মূল্যের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া অনলাইন গণমাধ্যমগুলো সাংবাদিকদের কনটেন্টের মাধ্যমে যে ডিজিটাল রাজস্ব আয় করে, তার লভ্যাংশ সাংবাদিকদের দেওয়ার জন্য কোনো জাতীয় নীতিমালা নেই। এ ক্ষেত্রেও সাংবাদিকরা বঞ্চিত হচ্ছেন।

সংবাদ প্রতিবেদকের পাশাপাশি সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল বা টেলিভিশনে কর্মরত ভিডিও সাংবাদিকদের অধিকাংশই ন্যায্য বেতন-ভাতা পান না। তাদের অনেকেরই নিয়োগপত্র নেই এবং মাসের পর মাস বেতন বকেয়া থাকে। কাজের সরঞ্জামও সরবরাহ করা হয় না, ফলে অনেক ভিডিও সাংবাদিক তাদের ব্যক্তিগত ক্যামেরা বা মোবাইল ব্যবহার করে কাজ করতে বাধ্য হন। একজন ফটো সাংবাদিক, ভিডিও সাংবাদিক বা মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিকের বেতন দিয়ে নিজের ভরণপোষণ করাও কঠিন হয়ে পড়ে। জেলা শহরগুলোয় কর্মরত ভিজ্যুয়াল সাংবাদিকদের অধিকাংশ গণমাধ্যম মাসে মাত্র ২০০০ থেকে ৫০০০ টাকা দেয়, এমনকি অনেক সময় কোনো পারিশ্রমিকই দেওয়া হয় না। অথচ, বাংলাদেশ শ্রম আইনে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র এবং ন্যূনতম মজুরির সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক ও কর্মচারীদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো না থাকায় মিডিয়া হাউজগুলো তাদের নিজস্ব (প্রায়ই নীতিমালাবিহীন) নিয়মানুসারে কর্মীদের বেতন নির্ধারণ করে। সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা-সম্পাদক, প্রধান প্রতিবেদক ও প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বেতন এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের বেতনে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়।

সম্প্রতি ঢাকার অনেক গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, কিছু ভুঁইফোঁড়, তবে পরিচিত সংবাদপত্র, টেলিভিশন ও অনলাইন পোর্টাল টাকার বিনিময়ে মফস্বল সাংবাদিকদের নিয়োগ দিচ্ছে। এসব সাংবাদিককে প্রায়ই কোনো বেতন-ভাতা দেওয়া হয় না, বরং তাদের কাছ থেকে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঢাকায় কিছু মিডিয়া হাউসকে দিতে হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

বর্তমানে যেসব গণমাধ্যম কোনো নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র এবং মাসিক বেতন ছাড়াই সাংবাদিকদের কাছ থেকে মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর কাজ করিয়ে নেয়, তারা বিদ্যমান শ্রম আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রতিকার চাওয়ার জন্য সাংবাদিকদের কোনো উপযুক্ত জায়গা নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কোনো মালিক নিয়োগপত্র প্রদান না করিয়া কোনো শ্রমিককে নিয়োগ করিতে পারিবেন না এবং নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিতে হইবে। সার্ভিস বই প্রদান করতে হবে (অধ্যায় দুই, পৃষ্ঠা ৩১-৩২)। অথচ ঢাকা ও সারা দেশে অসংখ্য সাংবাদিক কোনো নিয়োগপত্র ছাড়াই কাজ করছেন।

জীবনযাত্রার ব্যয় দিনদিন অনেক বেড়ে গেলেও অনেক গণমাধ্যম তাদের কর্মীদের নিয়মিত পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্ট দেন না। ঢাকায় সাংবাদিকদের নিয়মিত-অনিয়মিত পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হলেও মূলধারার অনেক মফস্বল সাংবাদিক ১০ বছর বা তার বেশি সময় কাজ করার পরও কোনো পদোন্নতি বা ইনক্রিমেন্ট পান না। চাকরি শেষে দেওয়া হয় না অবসর ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটির সুবিধা, যা তাদের ঢাকার সহকর্মীদের দেওয়া হচ্ছে। দীর্ঘ বছর কাজ করেও তাদের চাকরি শেষে খালি হাতে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে কমিশনের মতবিনিময় সভায় অভিযোগ এসেছে।

যেটুকু বেতন-ভাতা তাদের দেওয়া হয়, বেশির ভাগ মিডিয়া হাউজগুলো তা নিয়মিত দেয় না। অথচ, নিয়মিত বেতন পরিশোধের বিষয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১২২-এর ২ উপধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোনো মজুরিকাল এক মাসের ঊর্ধ্বে হইবে না।' শ্রম আইনের ১২৩-ধারায় মজুরি পরিশোধের সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কোনো শ্রমিকের যে মজুরিকাল সম্পর্কে তাহার মজুরি প্রদেয় হয়, সেই কাল শেষ হওয়ার পরবর্তী সাত কর্মদিবসের মধ্যে তাহার মজুরি পরিশোধ করিতে হইবে।'

অভিযোগ আছে, নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মরত সাংবাদিকদের বিজ্ঞাপনের এজেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে। বাড়তি কমিশন দেওয়ার শর্তে সাংবাদিকদের এই কাজ দেওয়া হয়। সরকারি, আধা-সরকারি দপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার বিজ্ঞাপন আগে কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকা থেকে বিতরণ করার যে ব্যবস্থা ছিল, তা কয়েক দশক আগে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়। এরপর থেকেই স্থানীয় সংবাদদাতাদের স্থানীয় প্রশাসন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া শুরু হয়। ফলে, স্থানীয় সাংবাদিকদের মধ্যে খবরের প্রতিযোগিতার চেয়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের প্রতিযোগিতা বাড়ছে। অনেক মিডিয়া হাউজ মাসে কয়টা নিউজ দিতে হবে, সেই ধরনের শর্ত না দিয়ে মাসে কয়টি বিজ্ঞাপন দিতে হবে-সেই টার্গেট দিচ্ছে। এমনকি নিয়োগের সময়ও বিজ্ঞাপনের শর্তের কথা বলা হচ্ছে। যার ফলে, সারা দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দুর্নীতি-অনিয়ম, জনভোগান্তির খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে শ্রম আইনে নিয়োগকর্তার ওপর যে দায়িত্ব নির্ধারিত আছে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঙ্ঘিত হয়ে আসছে। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে স্থানীয় পর্যায়ের সাংবাদিকদের নিরাপত্তাসামগ্রীর জোগান দেওয়া, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঝুঁকিবিমা এবং আইনগত সহায়তার বিষয়ে অধিকাংশ নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তাদের দায়িত্ব পালন করে না। অথচ পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় সংবাদদাতারাই সবচেয়ে বেশি শারীরিক আক্রমণ ও আইনগত হয়রানির শিকার হন। ৫৪ বছরে যত সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন, তার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশই ঢাকার বাইরে কর্মরত সাংবাদিক।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও সাংবাদিকতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা বা রেডিওর কাজ বোঝালেও বাংলাদেশে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা পেশাদার সাংবাদিকতার সমতুল্য। দেশের চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দলীয় রাজনীতি ক্যাম্পাসগুলোয় বিস্তৃত হওয়ায় সহিংস বিবাদ-ফ্যাসাদ প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা অনেক সময়েই প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। ফলে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতায় ঝুঁকির মাত্রাও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি। গত জুলাই-আগস্টের সময়েও অনেক সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকে আহত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের নিয়মিত বেতন-ভাতা দেয় না। অনেক প্রতিষ্ঠান শুধু পরিচয়পত্র দিয়েই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। অনেকে নামমাত্র বেতন-ভাতা দেয় বলে ক্যাম্পাস সাংবাদিকরা কমিশনকে জানিয়েছেন। ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কোনো নিরাপত্তাসামগ্রী দেওয়া হয় না। যে কোনো হামলা-মামলার ক্ষেত্রেও তারা খুব একটা সহযোগিতা পান না।

কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানেই কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা মানা হয় না। অনেক সময় সাংবাদিকদের কাছ থেকে নির্ধারিত কর্মঘণ্টার অধিক কাজ করিয়েও কোনো ওভারটাইম দেওয়া হয় না। অনেক সাংবাদিক এমনও অভিযোগ করেছেন যে সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও তাদের কাজ করতে হয়। বিনিময়ে কোনো আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয় না এবং পরবর্তীতে অর্জিত ছুটি অন্য সময়ে ভোগের সুযোগ দেওয়া হয় না। কিন্তু শ্রম আইনে একজন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করানোর বাধ্যবাধকতা আছে। একান্ত প্রয়োজনে অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হলে তার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের শর্ত রয়েছে। অন্যদিকে, শ্রম আইনে শ্রমিকদের সপ্তাহে এক থেকে দেড় দিন ছুটির বিধান থাকলেও অনেক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান তা মানে না। স্থানীয় সংবাদদাতাদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই মানা হয় না বলে অভিযোগ আছে।

কমিশনের বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় অনেক সাংবাদিক জানিয়েছেন যে, তাদের চাকরির ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই। কর্তৃপক্ষ চাইলে যে কোনো সময় বিনা নোটিশে সাংবাদিকদের বরখাস্ত করা হয়। অনেক সময় নিয়োগপত্রেও অন্যায়ভাবে সেরকম শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় ঘুম থেকে উঠে সাংবাদিক তার মোবাইলের মেসেজে জানতে পারেন যে তার চাকরি নেই। অনেক সময় অ্যাসাইনমেন্ট থেকে ফিরে এসে সাংবাদিক দেখতে পান তাকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অথচ শ্রম আইনে ছাঁটাই, বরখাস্ত বা চাকরি থেকে ডিসচার্জ করার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। এবং সেক্ষেত্রে সাংবাদিককে আগে থেকে নোটিশ প্রদান এবং ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে, যা বেশির ভাগ গণমাধ্যম লঙ্ঘন করে থাকে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এর ২০ ধারায় বলা হয়েছে যে, 'কোন শ্রমিককে প্রয়োজন অতিরিক্ত হওয়ার কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান ছাঁটাই করতে পারবে, তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিক যদি কোনো মালিকের অধীনে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্যূন এক বৎসর চাকরিতে নিয়োজিত থাকেন, তা হলে তার ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিককে তার ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে এক মাসের লিখিত নোটিশ দিতে হবে, অথবা নোটিশ মেয়াদের জন্য নোটিশের পরিবর্তে মজুরি প্রধান করতে হবে। তাকে (ছাঁটাইকৃত শ্রমিককে) ক্ষতিপূরণ বাবদ তার প্রত্যেক বৎসর চাকরির জন্য ত্রিশ দিনের মজুরি বা গ্র্যাচুইটি যদি প্রদেয় হয়, যা অধিক হইবে, সেটা প্রদান করতে হবে।'

অনেক নারী সাংবাদিক কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, অনেক গণমাধ্যম মাতৃত্বকালীন বা প্রসূতিকালীন কোনো ছুটি বা বেতন-ভাতা প্রদান করতে চায় না। অনেক সময় মাতৃত্বকালীন চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রসূতিকল্যাণ সুবিধা, ছুটি বা গর্ভকালীন সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে।

শ্রম আইনে শ্রমিকদের উৎসব ভাতা বাধ্যতামূলক করা হলেও অনেক গণমাধ্যম গণমাধ্যমকর্মীদের কোনো উৎসব ভাতা দেয় না। অনেক সময় সাংবাদিকদের উৎসবের দিনেও বাধ্যতামূলক কাজ করতে হয়। উৎসবের সময় অনলাইনে কাজ করা সাংবাদিকদের দীর্ঘ কর্মঘণ্টা কাজ করতে হয়। ২০০৬ সালের ৪২নং আইনের (শ্রম আইনের) ১১৮ ধারার ৩ উপ-ধারায় সংশোধনী এনে বলা হয়েছে যে, 'কোনো শ্রমিককে কোনো উৎসব-ছুটির দিনে কাজ করিতে বলা যাইতে পারিবে, তবে ইহার জন্য তাহাকে এক দিনের বিকল্প ছুটি এবং দুই দিনের ক্ষতিপূরণ মজুরি প্রদান করিতে হইবে।'

দেশের যেসব গণমাধ্যম উৎসব ভাতা প্রদান করে, সেগুলোর অনেকেই কেবল ঈদের সময় সব ধর্মের গণমাধ্যমকর্মীকে একসঙ্গে উৎসব ভাতা প্রদান করে। এতে অন্য ধর্মের গণমাধ্যমকর্মীদের স্ব স্ব ধর্মীয় উৎসবের সময় সমস্যা হয় বলে অনেক সাংবাদিক কমিশনকে জানিয়েছেন। কিন্তু সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে ২০১৮ সালে যে আইন প্রণয়ন করেছে, সেখানে একটা নতুন দফা সন্নিবেশিত করেছে। নতুন এই দফায় বলা হয়েছে, 'উৎসব ভাতা' অর্থ কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদেরকে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় উৎসবের প্রাক্কালে প্রদেয় নির্ধারিত উৎসব ভাতা।'

এছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত ছুটি, ভাতা এবং ভবিষ্যৎ তহবিল গঠনের কথা বলা হলেও বেশির ভাগ গণমাধ্যম এই সুযোগ-সুবিধাগুলো নিশ্চিত করে না। তাছাড়া যে কোনো প্রকারের অব্যাহতি, বরখাস্ত বা অপসারণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে শ্রম আইনে, যা গণমাধ্যম শিল্পে প্রতিনিয়ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

১৫

গণমাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে করণীয়

একটি সমতামূলক সমাজ নির্মাণের জন্য সংবাদমাধ্যমে নারী ও পুরুষের সমতা গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। সমাজে নারীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করা, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং নিপীড়ন ও নির্যাতন বন্ধের জন্য সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২০১১ সালে যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়, এর ৪০তম অনুচ্ছেদে গণমাধ্যম ও নারীবিষয়ক অংশে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা আছে।

৪০.১ গণমাধ্যম নারীর সঠিক ভূমিকা প্রচার করা, প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা;

৪০.২ নারীর প্রতি অবমাননাকর, নেতিবাচক, সনাতনী প্রতিফলন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা;

৪০.৩ বিভিন্ন গণমাধ্যমের ব্যবস্থাপনা ও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা;

৪০.৪ প্রচারমাধ্যম নীতিমালায় জেন্ডার প্রেক্ষিত সমন্বিত করা।

এই সমতা অর্জনের দুটি দিক থাকে।

প্রথমত, অংশগ্রহণের দিক এবং দ্বিতীয়ত, আধেয় তৈরির দিক থেকে।

সংবাদমাধ্যমকে একটি কর্মক্ষেত্র হিসেবে দেখলে এখানে নারীর সম-অংশগ্রহণ মানবাধিকারের প্রশ্নেই গুরুত্বপূর্ণ। আরও যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো সংবাদমাধ্যম শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের চিন্তাজগতের ওপর প্রভাব রাখে আর সংবাদকর্মীরা এই জগৎ তৈরি করে দেন। নারীর সমান অংশগ্রহণ না থাকলে সংবাদও হয়ে পড়বে একপেশে; যা সঠিক তথ্য পরিবেশনার পরিপন্থি। বিভিন্ন দেশের গবেষণায় দেখা যায়, নারী যখন অধিক হারে সাংবাদিকতায় অংশগ্রহণ করেন, তখন তারা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে আনতে পারেন।

সংবাদকক্ষে নারী যখন প্রান্তিক থাকেন, তখন তার দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এমনকি সাংবাদিকদের ফোরাম এবং ইউনিয়নগুলোয়ও আমরা নারীর অংশগ্রহণের এ প্রান্তিকতা দেখতে পাই।

সংবাদমাধ্যমের আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভাষা ও উপস্থাপন রীতিতে লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে। সংবাদ উপস্থাপনের রীতিও পুরুষতান্ত্রিক ও ছাঁচে ঢালা, যা নারীর অসম অবস্থানকে দৃঢ় করে। এছাড়া সংবাদ রচনায় দেখা যায়, পুরুষকেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুখ্য চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়, নারীর কণ্ঠস্বর অশ্রুত কিংবা প্রান্তিক হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনায় যে তথ্যগুলো উঠে এসেছে:

এ অবস্থা দূর করে একটি জেন্ডার-সাম্যমূলক পরিবেশ তৈরিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোয় মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে:

ক. গণমাধ্যমের সব পর্যায়ে সব জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ, পদায়ন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা;

খ. প্রতিটি গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণবিধি প্রস্তুত করতে হবে এবং আচরণবিধি কার্যকরভাবে পালনের জন্য তথ্যদান, আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা রাখা; সব জেন্ডারের সাবলীল অংশগ্রহণের জন্য অবকাঠামো (যেমন: ভিন্ন টয়লেট, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র) ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;

গ. নারীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে জেন্ডার নির্বিশেষে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতার ব্যবস্থা; নিরাপদে যাতায়াতের জন্য পরিবহনব্যবস্থা রাখা;

ঘ. হাইকোর্ট প্রণীত যৌন নিপীড়ন রোধ নির্দেশ (২০০৯) অনুযায়ী প্রতিটি গণমাধ্যম কার্যালয়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার সেল তৈরি করা;

ঙ. সাংবাদিকতায় নানা ধরনের চাপ মোকাবিলায় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া;

চ. নারী যেন যথাযথভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি পায় এবং ছুটি শেষে কাজে ফিরে কোনো বৈষম্যের মুখোমুখি না হয়, তা নিশ্চিত করা;

ছ. নারীকে কীভাবে উপস্থাপনা করা হবে, তার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং নিয়মাবলি রচনা করা; নারীর প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে, কিংবা সব ক্ষেত্রে তার সাবলীল পদচারণায় বাধা সৃষ্টি করে–এমন গৎবাঁধা ধারণা প্রকাশ ও প্রচার না করার বিষয়ে নীতিমালা প্রস্তুত করা;

জ. সমাজে নারীর বহুমুখী ভূমিকা ও অংশগ্রহণ তুলে ধরা; কোনো একটি সংবাদ/ফিচারের ক্ষেত্রে নারীর কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে কি না, তা খেয়াল রাখা;

ঝ. ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে হবে যেন শব্দ বা বর্ণনার মাধ্যমে নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবমাননা না হয়।

১৬

আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি

ব্যক্তির শ্রেণি, ধর্ম, ভাষা, শারীরিক বা নৃতাত্ত্বিক ভিন্নতার কারণে অনেক সময় তারা বৈষম্যের শিকার হন।

গণমাধ্যমের সঙ্গে সংখ্যালঘু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সম্পর্ক ইতিবাচক বা নেতিবাচক হতে পারে। তাদের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে গণমাধ্যম যেমন সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা বাড়াতে পারে, তেমনই ভ্রান্ত, একপেশে ও নেতিবাচক উপস্থাপনা দিয়ে গৎ বাঁধা ধারণাকে দৃঢ় ও বৈষম্য প্রকট করে তুলতে পারে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে। এর মূল বিধানগুলোর মধ্যে রয়েছে 'জাতীয় বা জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের/ব্যক্তিদের নিজস্ব সংস্কৃতি উপভোগ করার, নিজস্ব ধর্ম পালন করার এবং অনুশীলন করার এবং ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রকাশ্যে, স্বাধীনভাবে এবং হস্তক্ষেপ বা কোনো ধরনের বৈষম্য ছাড়াই নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের অধিকার' (ধারা ২.১)।

জাতিসংঘের আদিবাসীবিষয়ক ঘোষণাপত্র-২০০৭ (UNDRIP)-এর ১৬নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যেঃ

অ. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজের ভাষায় নিজস্ব গণমাধ্যম থাকবে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমেও বৈষম্যহীনভাবে তাদের অভিগম্যতা থাকবে।

আ. রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম যাতে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটাতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্র যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

সুতরাং গণমাধ্যমে এক্ষেত্রে যা করা যেতে পারেঃ

১. গণমাধ্যম নীতিমালায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্তি;

২. গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম সম্প্রচার সময়সীমা নির্ধারণ;

৩. আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রকাশ/প্রচাররত গণমাধ্যমে আদিবাসী ভাষায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;

৪. আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে যেসব মাধ্যম গড়ে উঠেছে, তাদের নিবন্ধন সহজতর করা; এছাড়া আদিবাসীদের নিজস্ব গণমাধ্যম যেন আরও গড়ে উঠতে পারে, তার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া;

৫. মূলধারার গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থাপন যথাযথ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ উপস্থাপনের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা;

৬. সাংবাদিকতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে 'আদিবাসী বিষয়' (Indegenous Studies) অন্তর্ভুক্ত করা;

৭. আদিবাসী সাংবাদিক/সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের জন্য ফেলোশিপ দেওয়া ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

১৬.১ প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সব নাগরিকের সম-অধিকার, মানবসত্তার মর্যাদা, মৌলিক মানবাধিকার ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা এবং তাদের কল্যাণ ও উন্নয়নে প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১ সংসদে পাশ করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD)-এ ২০০৭ সালের ৯ মে স্বাক্ষর এবং ৩০ নভেম্বর অনুসমর্থন করে। প্রতিবন্ধিতাবিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল UNCRPD-এর আলোকে ২০০১ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইনটিকে যুগোপযোগী করে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এবং 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে।

কিন্তু এরপরও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা শারীরিক অবকাঠামোগত বাধা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা, নীতিগত অনিয়ম কিংবা বৈষম্যের শিকার হন। এ প্রতিকূলতার মধ্যেই গণমাধ্যম হয়ে উঠতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা সচেতনতা বাড়াতে, নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন সমান সুযোগ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে।

সচেতনতা সৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

গণমাধ্যমের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো জনমত গঠন করার ক্ষমতা। যখন টেলিভিশন, সংবাদপত্র বা সামাজিক মাধ্যম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেবল করুণার দৃষ্টিতে না দেখে, বরং তাদের ক্ষমতায়নের গল্প তুলে ধরে, তখন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসে। ইতিবাচক উপস্থাপনা যেমনঃ সিনেমা, নাটক কিংবা সংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবনের চিত্র তুলে ধরা হয়, তখন সাধারণ মানুষ তাদের সহযোদ্ধা হিসেবে দেখতে শুরু করে, করুণার জায়গায় তৈরি হয় শ্রদ্ধা ও সমানাধিকারের বোধ।

নীতিনির্ধারণ ও অ্যাডভোকেসির জন্য গণমাধ্যমের ভূমিকা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং প্রতিবেদনগুলো যখন বৈষম্য, প্রতিবন্ধকতা ও আইনি ফাঁকির বিষয়গুলো তুলে ধরে, তখন তা নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি জোরালো বার্তা হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে। প্রতিবন্ধী অধিকারের পক্ষে জনমত তৈরি করা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ সৃষ্টি করা এবং প্রয়োজনীয় নীতিগত সংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া–এসব ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের অবদান অপরিসীম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতার অভাবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে। মিডিয়া এখানে যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রবেশগম্যতার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের সঙ্গে কথা বলে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দেওয়া

গণমাধ্যম তখনই প্রকৃত অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, যখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা নিজেরাই সাংবাদিক, কলাম লেখক, টিভি উপস্থাপক বা কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাদের জীবনের গল্প তারা নিজেরাই যখন বলেন, তখন সেটি আরও বিশ্বাসযোগ্য এবং প্রভাবশালী হয়। পাশাপাশি, তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা গণমাধ্যমের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ ও অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি

গণমাধ্যমের একটি বড় দায়িত্ব হলো নিজেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব হওয়া। টিভি চ্যানেলে সংবাদের সময় বাংলা ইশারা ভাষার ব্যবহার, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিওতে ক্যাপশন সংযোজন, ওয়েবসাইটগুলোয় স্ক্রিন-রিডার ব্যবহারযোগ্যতা

নিশ্চিত করা–এসব পদক্ষেপ নিলে গণমাধ্যমের তথ্য সবার জন্য সমানভাবে উপভোগ্য হয়। বর্তমানে শুধু বিটিভি এবং দেশটিভি বাংলা ইশারা ভাষা ব্যবহার করে থাকে এবং সেটা শুধু সংবাদ পরিবেশনে। কিন্তু বিনোদন বা অন্যান্য আলোচনা অনুষ্ঠানেও তো এই ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন, সেটা করা হচ্ছে না–এটা নিয়ে মিডিয়ায় আলোচনা নেই।

বৈষম্য ও স্টিগমার বিরুদ্ধে লড়াই

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শুধু করুণার চোখে দেখা বা তাদের জীবনসংগ্রামকে 'অনুপ্রেরণার গল্প' বানিয়ে দেখানো অনেক সময় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এটি তাদের ক্ষমতাহীন হিসেবে চিত্রিত করে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলো আড়াল করে ফেলে। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নিশ্চিত করতে হবে, যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করা হয় এবং তাদের অধিকারকে কেন্দ্র করে প্রতিবেদন তৈরি হয়।

জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা প্রদান

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি কিংবা কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ চ্যালেঞ্জ থাকে। সংবাদমাধ্যমকে নিশ্চিত করতে হবে যে, এই গোষ্ঠী প্রয়োজনীয় তথ্য যথাযথভাবে ও সহজভাবে পাচ্ছে এবং একই সঙ্গে তারা সহজে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা পাচ্ছে কি না, সেটাও গণমাধ্যম তুলে ধরতে পারে। একই সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রবেশগম্যতার ঘাটতি তুলে ধরার মাধ্যমে নীতিগত পরিবর্তনের পথে ভূমিকা রাখতে পারে গণমাধ্যম।

তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনকে জোরদার করা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা সংগঠন ও অ্যাক্টিভিস্টদের কণ্ঠ আরও উচ্চকিত করতে পারে সংবাদমাধ্যম। স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলনগুলো যখন গণমাধ্যমে জায়গা পায়, তখন তা শুধু দেশীয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মেও গুরুত্ব পায়।

করপোরেট দায়বদ্ধতা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

গণমাধ্যম কেবল সচেতনতা তৈরি করেই থেমে থাকবে না, বরং এটি করপোরেট প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দপ্তরগুলোর ওপরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে যাতে তারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। বিশেষ প্রতিবেদন বা ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও পরিবহণব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির গুরুত্ব তুলে ধরা সম্ভব।

১৬.২ গণমাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি

গণমাধ্যমকে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে শুধু প্রতিবেদন প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে, কনটেন্ট তৈরিতে এবং নীতিমালায় সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। যেভাবে তা করা যেতে পারে:

- চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো যেন স্ক্রিন রিডার-সহায়ক ও সহজ ভাষায় লেখা; সাক্ষাৎকারের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা (যেমন: ইশারা ভাষার দোভাষী, নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি) নিশ্চিত করা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রযোজক ও প্রযুক্তিগত পদে নিয়োগ দেওয়া; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মেন্টরশিপ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রবেশগম্য অফিস (র‍্যাম্প, লিফট, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব বাথরুম) নিশ্চিত করা;
- সহায়ক প্রযুক্তির (স্ক্রিন রিডার, স্পিচ-টু-টেক্সট সফটওয়্যার) ব্যবস্থা করা।

- ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং আওয়ারস এবং রিমোট ওয়ার্ক সুবিধা দেওয়া।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শুধু করুণা বা অনুপ্রেরণার বস্তু হিসেবে না দেখিয়ে তাদের সক্ষমতা ও অবদানের গল্প তুলে ধরা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবাদিক, আলোচক ও প্যানেলিস্ট হিসেবে নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করা।

- টেলিভিশন সংবাদে ক্লোজড ক্যাপশন ও ইশারা ভাষার দোভাষী যুক্ত করা; রেডিও প্রোগ্রামের জন্য লিখিত ট্রান্সক্রিপ্ট বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য অডিও বিবরণী দেওয়া;

- অনলাইন সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সহজ ভাষা, অল্ট ট্যাক্সট, ইমেজ ডিসক্রিপশন ও ব্রেইল-সহায়ক ফরম্যাট ব্যবহার করা।

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় সম্মানজনক ভাষা ব্যবহারের নির্দেশিকা থাকা।

- ওয়েবসাইটগুলো যেন ওয়েব কনটেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন (WCAG 2.1) অনুসারে ডিজাইন করা হয়; স্ক্রিন-রিডার সক্ষম নিউজ অ্যাপ তৈরি করা; অডিও, ব্রেইল ও বড় ফন্টে সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

গণমাধ্যম শুধু তথ্য পরিবেশনের মাধ্যম নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার। যদি এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত ও সমানাধিকারের সমাজ তৈরি করা সম্ভব। আমাদের প্রয়োজন দায়িত্বশীল, নৈতিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণমাধ্যম, যা সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠে, তাদের সংগ্রাম ও সাফল্য তুলে ধরে এবং সমাজ ও নীতিনির্ধারকদের পরিবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

১৭

অপ/ভুয়া তথ্যের ঝুঁকি

ভুয়া খবর, ভুল বা অপ/কুতথ্য, গুজব ইত্যাদির মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানো বাংলাদেশে নতুন কিছু নয়। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো ভুয়া ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের কারণে ব্যাপক সহিংসতা ও প্রাণহানির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটার পর দেশের ভেতর এবং বাইরেবিশেষ করে প্রতিবেশী ভারত থেকে অবিশ্বাস্য মাত্রায় ভুয়া ও অপতথ্যের স্রোত অনর্গল বইতে শুরু করে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে বিতর্কিত করা, কথিত জঙ্গিবাদের উত্থান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসন ও কথিত ডিপ-স্টেটের ষড়যন্ত্রকে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের কারণ হিসেবে দেখানোর নিরন্তর চেষ্টা বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে যেমন চলছে, তেমনই ভারতের মূলধারার গণমাধ্যমেও তার বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এর আগে, বাংলাদেশের ২০১৮ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ফেসবুক নয়টি পেজ এবং ছয়টি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করেছিল এবং প্রায় একই সময়ে টুইটার ১৫টি ভুয়া অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কথা জানিয়েছিল। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির নির্বাচন ঘিরেও ভুয়া পরিচয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার চলেছে। বস্তুত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো এখন এ ধরনের অপতথ্য ও ভুয়া খবর প্রচারের উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো দায়িত্বহীনভাবে কথিত অবাধ বাকস্বাধীনতার নামে অপতথ্য ও ভুয়া তথ্য প্রচারে সহায়তা করছে। কথিত অবাধ বাকস্বাধীনতার সৈনিক বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক টুইটার একক্ভাবে নিজ মালিকানায় নেওয়ার পর ওই প্ল্যাটফর্মে সব ধরনের সত্যতা যাচাইয়ের বাধ্যবাধকতা তুলে দেওয়া হয়েছে। এমনকি, একজনের পরিচয় অন্যজন অবলীলায় যাচাইকৃত হিসাবে ব্যবহার করতে পারছেন। ফলে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালীদের নামে অনেক সময়ে এমন তথ্য প্রচার করা হচ্ছে, যা ক্ষতিকর হলেও ওইসব ব্যক্তি তাদের প্রকৃত অবস্থান প্রকাশ করার আগেই বিকৃত তথ্য ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে। গত নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর ফেসবুকও সত্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে-২০২০ সালে ফেসবুক সত্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়ায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিভিন্ন দাবি ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ফেসবুকে নিষিদ্ধ করেছিল, যা এবার তিনি পুনর্নির্বাচিত হওয়ার পর তুলে নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে এসব ভুয়া খবর বা বানোয়াট তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার এবং অজ্ঞতাজনিত ও উদ্দেশ্যহীন প্রচার নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। ব্যঙ্গাত্মক রচনা বা মন্তব্য কিংবা প্যারোডি থেকে শুরু করে বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র তত্ত্ব পর্যন্ত নানা উৎস থেকে ভুয়া বা বিভ্রান্তিকর তথ্যের উৎপত্তি ঘটছে। বিব্রতকর কিংবা ক্ষতিকর সত্যকে আড়াল বা অস্বীকার করা এবং মিথ্যাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সত্য হিসেবে চালানোর চেষ্টা আগেও হতো। তবে এখন এর বিস্তৃতি বাড়ার মূল কারণ ইন্টারনেটের পরিব্যাপ্তি ও সোশ্যাল মিডিয়া। ২০১৬ সালে অক্সফোর্ড ডিকশনারির বিবেচনায় বছরের সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ছিল 'ফেক নিউজ'। ২০১৭তেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কল্যাণে শব্দটি শীর্ষ আলোচিত শব্দাবলির তালিকায় ছিল। পরিহাসের বিষয় হলো, যেসব খবরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বা তাঁর পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশিত হয়, সেগুলোকেই তিনি বানোয়াট খবর বলে উড়িয়ে দেন। বিপরীতে তাঁর অনুসারী কট্টর ডানপন্থি কিছু গোষ্ঠী সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অজস্র বানোয়াট তথ্য ব্যবহার করে অপপ্রচার চালায়।

বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং ইউনিসেফের হিসাবে তরুণদের ৬৯ শতাংশ তথ্য পেতে ও অন্যের সঙ্গে তা শেয়ার করতে এবং সামাজিক যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের প্রায় সবাই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগের নেটওয়ার্ক ব্যবহারে অভ্যস্ত। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেসব তথ্য, সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সহজলভ্য করার অ্যালগরিদমের কারণে বিভ্রান্তিকর বা অপতথ্য হলেও সেগুলো খুব দ্রুতই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। এই তথ্য প্রকাশ, প্রচার বা ছড়ানোর বিষয়টি জটিল ও বহুমাত্রিক, তা কোনো নির্দিষ্ট সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়, এবং বিভিন্ন রূপে তা আবির্ভূত হতে পারে।

অপতথ্য ও ভুয়া তথ্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নের বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা এখনো ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেননি, কারণ এর ব্যাপকতা অনেক বেশি। ভুয়া খবর, ফালতু খবর, কম্পিউটারের সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রচারমূলক কাজ, অনলাইনের মাধ্যমে অন্যের ক্ষতিসাধন করা যায় এমন কন্টেন্ট (Content), ঘৃণা বা বিদ্বেষমূলক কন্টেন্ট, অনলাইনে অস্বাভাবিক আচার-আচরণ-এগুলোর সবই অপপ্রচার বা বিভ্রান্তি ছড়ানোর কৌশল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এগুলো ছবি, ভিডিও, অডিও, লেখা, আঁকা ছবি, গ্রাফিক্স এবং মানুষের তৈরি বা কম্পিউটারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর তৈরি কন্টেন্ট (ডিপফেক) মাধ্যমে হয়ে থাকে। এখন এআই-এর মাধ্যমে যেভাবে যে কেউ ছবি, কণ্ঠ এবং কন্টেন্ট নকল করতে পারে, তাতে বিপদ বেড়েছে বহুগুণে।

সাধারণত যেসব উপায়ে অপ/কু বা ভুয়াতথ্য ছড়ানো হয়, সেগুলো এরকম:

- ব্যঙ্গ বা প্যারোডি: ক্ষতিকর কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও মানুষকে বোকা বানাতে পারে বা ধোঁকা দিতে পারে।
- ভুল ধারণা দেওয়া আধেয়: কোনো বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তথ্যের অপব্যবহার।
- নকল পরিচয়ে আধেয়: প্রকৃত উৎস বা সূত্রের পরিচয় ব্যবহার করে ভুল তথ্য দেওয়া।
- বানোয়াট আধেয়: ধোঁকা দেওয়া বা বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে এমন আধেয় তৈরি যা শতভাগ ভুয়া।
- ভুয়া যোগসূত্র স্থাপন: যখন শিরোনাম বা ছবি বা বিবরণ আধেয়র সঙ্গে মেলে না।
- ভুয়া পটভূমি: আসল আধেয় ব্যবহার করে ভিত্তিহীন তথ্য ও পটভূমি তুলে ধরা।
- বিকৃত আধেয়: আসল বা প্রকৃত তথ্য বা ছবিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ধোঁকা দেওয়া।

১৭.১ বাংলাদেশের চিত্র

অপতথ্য ও তথ্যবিকৃতিতে বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বেশি বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয় (বিশেষজ্ঞ মতামত)। এর প্রধান কারণ দুটি-প্রথমত, মূলধারার সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি; এবং দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও ডিজিটাল মাধ্যমের ওপর পাঠকদের অতিনির্ভরশীলতা। বিভিন্ন জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে খবরের প্রধান উৎস হিসেবে মানুষ এখন সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে টেলিভিশন চ্যানেলের ওপর। এরপর আছে অনলাইন মাধ্যম এবং তৃতীয় অবস্থানে সংবাদপত্র। সম্প্রতি কিছু মূলধারার গণমাধ্যম সোশ্যাল মিডিয়ার ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির অপতথ্য, অর্ধসত্য বা বিকৃত তথ্যকে খবর হিসেবে প্রকাশ করছে বা বিভিন্ন লেখায় সেগুলো উদ্ধৃত করছে, যা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

সংবাদমাধ্যম ও তার কাজের ধরন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ বিবেচনার কারণেও খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সংশয় দেখা যায়। এসব জরিপে দেখা যাচ্ছে, মানুষ সঠিক খবরের জন্য একাধিক মাধ্যমের শরণাপন্ন হয় এবং একাধিক মাধ্যমে একই তথ্য পেলে তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। এটি মূলধারার সংবাদমাধ্যমের ওপর গুরুতর আস্থার ঘাটতির প্রতিফলন।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমে আস্থার ঘাটতির অবশ্য একাধিক কারণ আছে। সংবাদমাধ্যমের ওপর সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কারণে স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে কাজ করার পরিবেশ না থাকায় অনেক সংবাদমাধ্যমই সঠিক তথ্য প্রকাশ করে না, বা পুরো তথ্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে, অথবা খণ্ডিত তথ্য প্রকাশ করে। দ্বিতীয়ত, বিপুলসংখ্যক সংবাদমাধ্যম সরকার-সমর্থক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকায় রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের বিপক্ষে যায়-এমন তথ্য প্রকাশ করে না। উপরন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করে। তথ্য এবং মতামতের সীমারেখা প্রায়ই উপেক্ষিত হয় এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকে তথ্য হিসেবে তুলে ধরা হয়।

সংবাদমাধ্যমের সংখ্যাগত আধিক্যের কারণে দ্রুততম সময়ে তথ্য প্রকাশের এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা এখন তীব্র হয়ে উঠেছে। এর ফলে তথ্যের যথার্থতা যাচাই ছাড়াই অনেক সময় খবর হিসেবে ভুল তথ্য, বিকৃত তথ্য, এমনকি গুজবও

সংবাদমাধ্যমে প্রচার হওয়ার নজির অহরহ তৈরি হচ্ছে। অবশ্য এ প্রবণতা ইলেকট্রনিক মাধ্যম টেলিভিশন ও ডিজিটাল মাধ্যম অনলাইন পোর্টালে সবচেয়ে প্রকট। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থতাড়িত মাধ্যমের স্ফুরণ এবং অসুস্থ প্রতিযোগিতার কারণে কখনো কখনো তথ্যপ্রবাহে নাজুক বিশৃঙ্খলাও দেখা দেয়, যা মানুষের মধ্যে গভীর বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতি গুরুতর আস্থাহীনতা তৈরি করে। দেশের অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতার চিত্র তুলে ধরতে ২০২৩ সালের ২৬ মার্চে স্বাধীনতা দিবসের একটি প্রতিবেদনে ছবি ও উদ্ধৃতির ব্যবহারকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিতর্ক এরকম একটি নজির। দেশের শীর্ষস্থানীয় বাংলা দৈনিক প্রথম আলোর বিরুদ্ধে বানোয়াট উদ্ধৃতি ব্যবহারের অভিযোগ তোলে ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক একাধিক টিভি চ্যানেল ও অনলাইন মিডিয়া, যা একটি গুরুতর রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দেয়, এবং জনমনে সংশয় তৈরি করে।

বিশ্বজুড়ে সংবাদমাধ্যমে যে বিবর্তন ঘটছে, সেই একই ধারায় বাংলাদেশেও মূলধারার সংবাদমাধ্যম-টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্র, অনলাইন পোর্টাল-সবাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে প্রায় প্রতিটি খবর ও নিবন্ধ এখন দ্রুততম সময়ে সংক্ষিপ্তরূপে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করে পাঠককে মূল প্রকাশনায় আকৃষ্ট করার চেষ্টা নিয়মিত চর্চায় পরিণত হয়েছে। এসব কাজ এখন সব সাংবাদিকেরই পেশাগত দায়িত্বের অংশ হয়ে গেছে। এ কাজটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো ধরনের সম্পাদনা প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে সামান্য শব্দগত হেরফের ঘটার কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও ভুল বার্তা প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি হয়। সংবাদমাধ্যমগুলো বিজ্ঞাপনী আয় কমে যাওয়ায় বার্তাকক্ষে সীমিত জনসম্পদ নিয়ে প্রকাশনার কাজ করায় এই সম্পাদনাগত দুর্বলতা প্রকট হচ্ছে।

মূলধারার সংবাদমাধ্যমের দুর্বলতার কারণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে উৎসুক মানুষ খবরের জন্য সামাজিক মাধ্যমের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডির সমীক্ষার তথ্য বলছে, বাংলাদেশে প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ সামাজিক মাধ্যমের কন্টেন্টে (Content) ইতিবাচক আস্থার কথা জানিয়েছেন। সমীক্ষায় ৮০ শতাংশ উত্তরদাতা সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া তথ্য শেয়ার করার কথাও জানিয়েছেন। প্রতি তিনজনে একজনের বেশি উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাঁরা সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যাচাই করার কোনো চেষ্টা করেননি। আবার যারা তথ্য যাচাইয়ের চেষ্টা করেছেন, তাদের প্রতি ১০ জনে চারজন অন্যের 'লাইক' দেখে সেই তথ্যকে সত্য বলে বিবেচনা করেছেন। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বিটিআরসির তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৬ কোটির বেশি এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ কোটির বেশি। অন্যান্য একাধিক জরিপের তথ্য বলছে, ৮০ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন।

নির্ভরযোগ্য হিসেবে যে কয়টি সংবাদমাধ্যম বা প্রতিষ্ঠান দেশে পরিচিতি পেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে রাজনৈতিক প্রচারও সাম্প্রতিককালে উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। সাংবাদিক ও সুনির্দিষ্ট করে সংবাদমাধ্যমকে 'দেশবিরোধী', 'গণতন্ত্রবিরোধী' বা ভিন্ন দেশের দালাল আখ্যা দিয়ে তাদের সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও সংশয় তৈরির চেষ্টা মাঝেমধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। এর আগে ছিল 'উন্নয়নবিরোধী' বা 'মুক্তিযুদ্ধবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা।

বাংলাদেশে অপ/ভুয়া তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্য মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা। এছাড়া, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের প্রসারের জন্য অনলাইনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তিকর ও ভুল তথ্য প্রচারের নজির রয়েছে। তবে সন্ত্রাসবিরোধী বিভিন্ন প্রতিরোধ ও নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের কারণে এটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে যেসব অপপ্রচার বা ভুয়া তথ্য প্রচারের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ তদন্ত অনেক ক্ষেত্রেই অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। একাধিক ঘটনায় দেখা গেছে, ভুল তথ্য, যা ধর্মীয় অবমাননা হিসেবে গণ্য হয়েছে, এমন কন্টেন্ট অন্যের পরিচয় ধারণ করা উৎস (ইমপারসোনেটিং) থেকে ছড়ানো হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক হিন্দু যুবকের ফেসবুক আইডি থেকে ইসলাম ধর্মের অবমাননাকর মন্তব্য করাকে কেন্দ্র করে প্রাণঘাতী সহিংসতা হয়, কিন্তু পরে তদন্তে দেখা যায় অন্য কেউ তার পরিচয় ধারণ করে সেটি করেছিল। ২০২৪ সালের মার্চে পঞ্চগড়ে

আহমদিয়াবিরোধী সহিংসতার ক্ষেত্রেও ফেসবুকে ছড়ানো ভিত্তিহীন গুজবের ভূমিকা রয়েছে বলে প্রমাণ মিলেছে (ডিসমিসল্যাব)। স্পষ্টতই এগুলোর পেছনে গোষ্ঠীগত স্বার্থ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকার অভিযোগ আছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি সম্পাদিত ভিডিও, খণ্ডিত তথ্য ব্যবহার করে তৈরি কন্টেন্ট প্রকাশের হার লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। ফেসবুকের রিল, টিকটক ও ইউটিউবে ছোট ছোট সম্পাদিত ক্লিপ ব্যবহার করে বিকৃত ও বিভ্রান্তিকর কন্টেন্ট তৈরি করা হচ্ছে। এগুলোর অনেকটিতেই দেখা যায় ঘটনাস্থল, উপলক্ষ্য, অনুষ্ঠান বা আয়োজন, বক্তা বা মূল চরিত্রসমূহ-সবই যথার্থ বা আসল, কিন্তু বক্তব্য এমনভাবে সম্পাদিত বা খণ্ডিত যে তা মূল অনুষ্ঠানের প্রকৃত বক্তব্য নয়।

প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংবাদমাধ্যমের লোগো ও ছবি ব্যবহার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া খবর ছড়ানোর ঘটনা ইতোমধ্যেই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভুয়া তথ্যের আরেকটি উৎস হচ্ছে দেশের বাইরের বিভিন্ন গোষ্ঠী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও এরকম অপতথ্য বা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তথ্যবিকৃত করার পেছনে থাকে। বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর ভারতীয় প্রচারমাধ্যমে যে ধরনের অপপ্রচার ও ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি দেখা যাচ্ছে, তা বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের কাছে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও সংগঠিত অপতথ্য/ভূঁয়াতথ্য প্রচার বন্ধ হয়নি।

এর আগে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে বাধাদানকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞার নীতি ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিবেশী একটি দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রথমে আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থনে ওয়াশিংটনে ভূমিকা রাখার জন্য দিল্লির প্রতি আহ্বান জানিয়ে কিছু অভিমত প্রকাশ করা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী মোদির ওয়াশিংটন সফরের আগে কোনো সূত্র উল্লেখ না করেই খবর ছাপা হয় যে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এমন কোনো পদক্ষেপ না নিতে অনুরোধ জানানো হবে। ওই বৈঠকের আগে বা পরে এরকম কোনো আলোচনার কথা কোনো সরকারি সূত্রই বলেনি। সিলেটের পৌর নির্বাচনের আগে লন্ডন থেকে এক ব্যক্তি একটি ভুঁইফোঁড় সংগঠনের নামে একটি ভুয়া জনমত জরিপ প্রকাশ করে বলেন, আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী, যিনি লন্ডনের প্রবাসজীবন থেকে দেশে ফিরেছেন, তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হতে যাচ্ছেন। দেশের প্রধান প্রধান পত্রিকায় ওই জরিপের সত্যাসত্য যাচাই না করেই তা খবর হিসেবে ছাপা হয়, যা ডিসমিসল্যাব পরে অনুসন্ধান করে দেখায়, এটি কোনো পেশাদার প্রতিষ্ঠানের নির্ভরযোগ্য জরিপ ছিল না।

২০২৩ সালের মে মাসের শেষদিকে বাংলাদেশের নির্বাচন ও মানবাধিকার প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের উদ্দেশ্যে ছয়জন কংগ্রেসম্যান একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ পেলেও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম চারদিন তা প্রকাশ করেনি। চিঠিটি অনলাইনে প্রকাশ পায় শুক্রবার বিকেলে এবং তারপর দুদিনের সাপ্তাহিক ছুটি ও লেবার ডের ছুটি মিলিয়ে তিনদিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ছুটির কারণে ওইসব কংগ্রেসম্যানের দপ্তরে বিবৃতির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশের সাংবাদিকদের তিনদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়। সময়ের ব্যবধানের কারণে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে তা প্রকাশ পায় চারদিন পর। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১৪ সালে একই ধরনের এক বিবৃতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার পেয়েছিল, যা প্রকৃতপক্ষে ছিল জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে তৈরি বানোয়াট বিবৃতি। ২০২৩ সালে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বার্তাকক্ষগুলো বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

মিডিয়াবিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এমআরডিআই-এর ২০২০ সালের জাতীয় জরিপে দেখা গেছে, দেশের ৬৪ শতাংশ মানুষ একবার না একবার ভুয়া খবরের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা পুরুষদের ৭৬ শতাংশ এবং নারীদের ৫১ শতাংশ। খবরের প্রতি পুরুষদের আগ্রহ বেশি থাকার কারণে এমনটি হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায়। ওই জরিপেই দেখা গেছে, গ্রামাঞ্চলে ভুয়া খবর পৌঁছানোর হার শহরাঞ্চলের চেয়ে কিছুটা বেশি।

১৮

বাংলাদেশে গণমাধ্যম সাক্ষরতা প্রসারণে করণীয়

যেকোনো দেশে গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় একটি আদর্শ মিডিয়া-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য মিডিয়া-শিক্ষিত নাগরিক থাকা আবশ্যক। গত তিন দশকে গণমাধ্যমের পাশাপাশি অন্যান্য ধরনের মিডিয়ারও প্রসার ঘটেছে (যেমন, সামাজিক মাধ্যম); নাগরিকদের মিডিয়া ব্যবহার করার প্রবণতাও বেড়েছে। ইন্টারনেটভিত্তিক 'সাইবার' জগতে তাদের বিচরণ বাড়ছে। আমাদের প্রতিদিনকার ব্যবহার্য মিডিয়ার তালিকায় মুদ্রণমাধ্যম, শব্দ-দৃশ্য (audiovisual) মাধ্যম, টেলিফোন এবং মিথস্ক্রিয়া (ইন্টারঅ্যাক্টিভ) মাধ্যম জায়গা করে নিয়েছে। মাধ্যমের যেমন ভিন্নতা রয়েছে, তেমনই মাধ্যম সাক্ষরতা ধারণার মধ্যেও তারতম্য লক্ষ করা যায়। প্রচলিত প্রত্যয়গুলোর মধ্যে গণমাধ্যম সাক্ষরতা, কম্পিউটার সাক্ষরতা, সাইবার সাক্ষরতা, ইন্টারনেট সাক্ষরতা, নেটওয়ার্ক সাক্ষরতা, ডিজিটাল সাক্ষরতা, ই-সাক্ষরতা, তথ্য সাক্ষরতা ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত। যদিও প্রায়ই এদের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, অর্থের দিক থেকে এদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন মাত্রা রয়েছে। মিডিয়া সাক্ষরতা বিষয়ে যেকোনো নীতি তৈরির সময় এই ভিন্নতা মনে রাখা প্রয়োজন। অনেকেই গণমাধ্যম সাক্ষরতা বলতে বিভিন্ন ধরনের মিডিয়ার বার্তায় বা তথ্যে ব্যবহারকারীর অভিগম্যতা, বার্তার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন এবং বার্তা তৈরি করার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আবার, ভুয়া সংবাদ ও গুজব শনাক্ত করার দক্ষতা এবং সাইবার-অপরাধ এবং তথ্যপ্রযুক্তি আইন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকাও গণমাধ্যম সাক্ষরতার মধ্যে পড়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও যৎকিঞ্চিৎ গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ, বয়স এবং ভৌগোলিক অবস্থানে থাকা মানুষের (যারা বিভিন্ন ধরনের মাধ্যম ব্যবহার করছেন এবং যারা ভবিষ্যতে করবেন) গণমাধ্যম সাক্ষরতার মাত্রা সন্তোষজনক নয়। এ ব্যাপারে করণীয় কিছু সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো।

১৯

গণমাধ্যমের অপব্যবহার ও অপসাংবাদিকতা

বাংলাদেশে বরাবরই ক্ষমতাশালী মহল গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে আসছে। প্রায়ই দলীয় অনুগত ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা গণমাধ্যমের নিবন্ধন ও অনুমোদনে অগ্রাধিকার পান। ফলে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, এমনকি রাজনৈতিক নেতারাও এই সুবিধা লাভ করেন। যারা গণমাধ্যমের মালিকানা পান না, তাদের প্রায়ই ভয়ভীতি দেখিয়ে সরকারের পক্ষে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নতুন দৈনিক পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেল এলেও উভয় সরকারের আমলেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সীমিত ছিল।

তবে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দলীয় ও রাজনৈতিক বিবেচনায় গণমাধ্যমের লাইসেন্স দেওয়ায় এই শিল্পে অশুভ প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বস্তুনিষ্ঠতা, পেশাদারি, সাংবাদিকতার নীতি ও নৈতিকতাকে উপেক্ষা করে পারিবারিক, ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থে গণমাধ্যমকে অপব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। এমনকি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবেও গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয়। অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে গণমাধ্যম নিজেদের ও ব্যবসার রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে।

শেখ হাসিনার দেড় দশকে অসংখ্য টেলিভিশন চ্যানেল, এফএম রেডিও, পত্রিকা ও অনলাইন নিউজ পোর্টালের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অসংখ্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল চালু করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে নানা খবর, ছবি ও ভিডিও প্রকাশ করতে থাকে। এসব নামসর্বস্ব পোর্টাল ভুয়া খবর, বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। মূলধারার কিছু গণমাধ্যমেও একই ধরনের তৎপরতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন সংস্থাও প্রায়ই জড়িত থাকে। করোনার সময়ে তথ্য মহামারির সৃষ্টি হয়, যেখানে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সরকারবিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ও ভুয়া খবর ছড়াতে দেখা যায়। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ঘিরেও একই প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী ভারতীয় কিছু গণমাধ্যমও ভূমিকা রাখছে।

যদিও অপপ্রচার ও তথ্য বিকৃতি নতুন কিছু নয়। ২০০৬ সালের আগস্টে যমুনা গ্রুপের যুগান্তর পত্রিকা বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহ আলমকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ২ আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'মাফিয়া ডন শাহ আলমের উত্থানের নেপথ্যে সুন্দরী নারী ও মদ' এবং ৩ আগস্টের প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল, 'কে এই মাফিয়া ডন শাহ আলম?' যমুনা ফিউচার পার্কসংলগ্ন একটি রাস্তা নিয়ে বসুন্ধরা গ্রুপের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামেরর মালিকানাধীন সংবাদপত্র এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলে অভিযোগ ওঠে। এ দুই শিল্পগোষ্ঠীর দ্বন্দ্বের জেরে যুগান্তরে অপসাংবাদিকতার আরও উদাহরণ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালা ও বস্তুনিষ্ঠতা উপেক্ষিত হয়। এমনকি বসুন্ধরা গ্রুপ এসব খবরের প্রতিবাদ পাঠালেও যুগান্তরে তা ছাপা হয়নি। পরে বসুন্ধরা গ্রুপ বিজ্ঞাপন আকারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিবাদ ছাপে। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। শাহ আলম নিম্ন আদালতে মানহানির মামলা করে যুগান্তরের তৎকালীন সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, প্রকাশক সালমা ইসলামসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে। আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। তবে তারা উচ্চ আদালত থেকে জামিন পান।

মাফিয়া ডন শাহ্ আলমের উত্থানের নেপথ্যে সুন্দরী নারী আর মদ

যুগান্তর রিপোর্ট

আমোদ-ফুর্তির জন্য মধ্যযুগীয় আমলের রাজা-বাদশাদের হেরেমখানার আদলে গড়ে তোলা হয়েছিল বসুন্ধরা গ্রুপের রঙমহল। ব্যবসায়িক স্বার্থেই গড়ে তোলা হয় এই রঙমহল। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাকে খুশি করার প্রয়োজন হতো তাকেই দাওয়াত দিয়ে আনা হতো এ রঙমহলে। রঙমহলের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিদেশী মদ ও সুন্দরী নারী। বিশেষ ওই ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের মাধ্যমে বাগিয়ে নেয়া হতো অবৈধ সুযোগ-সুবিধাসহ কোটি কোটি টাকার কাজ। বিশেষ অতিথিদের জন্য রঙমহলে মাঝেমধ্যে হাজির করা হতো টিভি ও চলচ্চিত্রের উঠতি নায়িকাদের। আর নেপথ্যে থেকে বম্বের মাফিয়া ডনের মতো সবকিছুর কলকাঠি নাড়তেন বসুন্ধরার কর্ণধার আহমেদ আকবর সোবহান ওরফে শাহ আলম। গুলশানে বসুন্ধরা গ্রুপের এমনই একটি

নেপথ্যে : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

যুগান্তর

...কার আগে প্রবেশপত্র দেখা হচ্ছে

...হাজার পুলিশ প্রহরায়

...য মহড়া-পাল্টা মহড়া

...পর ১৪ দিন ক্যাম্পাস বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় খোলাকে সামনে রেখে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ ও শিবির নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি নেয়।

খুলল : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ১

ওপর মহলের চাপে মানহানির মামলায় যুগান্তর স্বত্বাধিকারী সম্পাদক প্রকাশক ও বার্তা সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

যুগান্তর রিপোর্ট

সন্ত্রাসী ও ভূমি দস্যুতায় সহযোগী মাস্তানসহ শতাধিক ক্যাডারকে সঙ্গে নিয়ে দৈনিক যুগান্তরের বিরুদ্ধে দুটি মানহানি মামলা করলেন মাফিয়া ডন বসুন্ধরার মালিক আহমদ আকবর সোবহান ওরফে শাহ আলম। উপর মহলকে ম্যানেজ করে সাব্বির হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী শাহ আলম নিজের ও তার বিদেশ পলাতক ছেলের অপরাধ আড়াল করার জন্য যুগান্তরের বিরুদ্ধে মামলাগুলো করেন। শুধু তাই নয়, দিনভর চরম নাটকীয়তার মাধ্যমে, নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে এবং ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি যমুনা শিল্প গ্রুপের কর্ণধার নুরুল ইসলাম বাবুল, দৈনিক যুগান্তর সম্পাদক গোলাম সারওয়ার, প্রকাশক সালমা ইসলাম ও বার্তা সম্পাদক আহমেদ ফারুক হাসানের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিরও আবেদন করেন তিনি। সূত্র জানায়, ম্যাজিস্ট্রেট অনেকটা বাধ্য হয়েই মানহানি মামলায় দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি নুরুল ইসলাম বাবুল ও স্বনামধন্য সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার ও দেশের বিশিষ্ট আইনজীবী যুগান্তর প্রকাশক সালমা ইসলামসহ চার জনের নামে ওয়ারেন্ট দেন, যা একটি নজিরবিহীন ঘটনা। অতীতে ৫০০ ও ৫০১ ধারায় দায়ের করা মানহানি মামলায় সরাসরি

পরোয়ানা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ২

গাজীপুরে বসুন্ধরা গ্রুপের ভূমি দখল ও রঙমহল

যুগান্তর রিপোর্ট

বন বিভাগ ও সাধারণ নিরীহ মানুষের শত শত বিঘা জমি দখল করে বসুন্ধরা গ্রুপ গাজীপুরে গড়ে তুলছে বিশাল হাউজিং প্রকল্প। মৌচাক হোমস এবং মৌচাক রিসোর্স নামে এ হাউজিং প্রকল্প ও রঙমহল গড়ে তুলতে প্রায় ২শ'

রঙমহল : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

২০১০ সালে বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকানাধীন কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ডেইলি সান ও বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম বাজারে আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সংবাদপত্রশিল্পে প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে বসুন্ধরা গ্রুপ আবির্ভূত হয়। ২০১২ সালে বসুন্ধরা গ্রুপ প্রথম আলো ও এর সম্পাদক মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে তাদের সব মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। সে বছর ১১ জানুয়ারি 'মতিউর রহমান ও প্রথম আলোর সেইসব ভূমিকা', ১২ জানুয়ারি 'প্রথম আলোর লাগাতার মিথ্যাচার'-এভাবে নানা শিরোনামে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এসব প্রতিবেদনে সাংবাদিকতার কোনো নিয়মনীতি মানা হয়নি। এসব প্রতিবেদনে মনগড়া তথ্য ও সূত্র ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের পেছনে কারণও ছিল। বসুন্ধরা গ্রুপের ভূমি দখল ও সাব্বির হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন

অবৈধ কর্মকাণ্ডের বিষয়ে অতীতে প্রথম আলো অনেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সেসব প্রতিবেদন তথ্যভিত্তিক হলেও বসুন্ধরা তা ভালোভাবে নেয়নি। এ গ্রুপের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান চালুর পর বসুন্ধরা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও নিবন্ধে প্রতিশোধপরায়ণতার প্রতিফলন দেখা যায়।

মন্তব্য প্রতিবেদন

মতিউর রহমান

দুই নেত্রীকে সরে দাঁড়াতে হবে

বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা—বাংলাদেশের সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আবার নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। তাঁরা কি দলের নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন, রাজনীতি থেকে অবসরে যাবেন, না স্বেচ্ছায় বিদেশে চলে যাবেন—এসব নিয়ে অনেক আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছে, এখনো হচ্ছে নানা মহলে। সর্বশেষ, গত সোমবার বিবিসির সংলাপে দুই দলের দুই জ্যেষ্ঠ নেতা বলেছেন, প্রয়োজনে দুই নেত্রীকে বাদ দিয়েই সংস্কার করতে হবে।

বিএনপি ও আওয়ামী লীগের গ্রেপ্তার হওয়া নেতাদের কাছ থেকে তাঁদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অবৈধ অর্থ-চাঁদা-সম্পত্তি সংগ্রহ এবং বাসে আগুন দেওয়া ও খুনের মামলা চাপা দেওয়াসহ বহু ব্যাপারে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, তা এককথায় অবিশ্বাস্য। ক্ষমতায় থেকে বা ক্ষমতার বাইরে গিয়ে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল দুটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের চাঁদা আর দুর্নীতির যে রূপ বের হয়ে আসছে, তা রীতিমতো ভয়ঙ্কর। এসবের অনেক কিছুই আমরা জানতাম, সমাজে আলোচিত ছিল, তারপরও সত্য এত ভয়ঙ্কর যে, পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো সবাইকে যুগপৎ গভীরভাবে হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু বেগম জিয়া বলেছেন, 'আমার ও আমার পরিবার সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।' শেখ হাসিনা বলছেন, 'জীবনে কাউকে এক টাকাও দিতে বলিনি। কারও কাছে চাঁদা চাইনি।' তবে দুই নেত্রীর এসব কথা কেউ বিশ্বাস করেন না। এখন আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি।

কিছু দিন আগে আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছিলেন, দুই দলের নেতাদের পরামর্শ অনুযায়ীই সরকার দুই নেত্রীর ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ (দুই নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠানো) নিয়েছিল। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে পরামর্শদাতাদের নাম প্রকাশের অনুরোধ জানানো হয়। জবাবে মইনুল হোসেন পরামর্শদাতাদের নাম প্রকাশ না করে আবারও একই কথা বলেন। তবে তিনি বলেন, দুই নেত্রীকে দেশে রেখে বা দলের শীর্ষে রেখে সংস্কার করা যাবে কি যাবে না—এ ব্যাপারে দলের মধ্যে দুই রকম মত

● এরপর : পৃষ্ঠা-১১

এদিকে ২০১৬ সালে বসুন্ধরা গ্রুপ আরেকটি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার অনুমতি পায়। সে বছর তাদের টেলিভিশন চ্যানেল নিউজ২৪ সম্প্রচার শুরু করলে গণমাধ্যমজগতে তাদের আধিপত্য আরও বেড়ে যায়। এসব গণমাধ্যমে তারা নিজেদের ও গ্রুপের অন্যান্য ব্যবসার প্রসার ও রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ট্রান্সকম গ্রুপের মালিকানাধীন প্রথম আলো ও এর সম্পাদক মতিউর রহমান হলেও আরও অনেক ঘটনায় এসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের বহু উদাহরণ রয়েছে। প্রথম আলোর বিরুদ্ধে অপসাংবাদিকতার জন্য প্রেস কাউন্সিলে তিরস্কৃত হলেও তারা এই চর্চা থেকে বিরত হয়নি। কলেজছাত্রী মোসারাত জাহান মুনিয়ার ধর্ষণ ও হত্যা মামলার পর একদিকে বসুন্ধরা গ্রুপের কোনো গণমাধ্যমে এ বিষয়ে কোনো খবর প্রকাশ করা হয়নি, অন্যদিকে মুনিয়া ও তার পরিবারের চরিত্রহনন ও কুৎসা রটানো বিভিন্ন একতরফা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বসুন্ধরা গ্রুপের গণমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে এভাবে নীতি, নৈতিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতাকে উপেক্ষা করে ১৫ বছর ধরে অপসাংবাদিকতায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশের অন্য কোনো গণমাধ্যমে এই মাত্রায় পৌনঃপুনিক অপতথ্য ও অপসাংবাদিকতা দেখা যায়নি। ৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পরেও তাদের এই ধরনের তৎপরতা বন্ধ হয়নি। তথ্য বিকৃত করে নিয়মিতভাবে তাদের গণমাধ্যমে প্রথম আলো ও মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। এর কয়েকটি উদাহরণ হলো, ২০২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর 'দাঁড়ি টুপি দেখলেই প্রথম আলো জঙ্গি বানিয়ে দেয়', ৫ ডিসেম্বর 'প্রথম আলোর কাজই ছিল জঙ্গি নাটক করা' ও 'আলেমদের ফাঁসানোর মাস্টারমাইন্ড প্রথম আলো'। এছাড়াও গত ৪ জানুয়ারি 'প্রগতিশীলতার আড়ালে জঙ্গি নাটক ছড়ায় প্রথম আলো' শিরোনামে বসুন্ধরা গ্রুপের পত্রিকাগুলোয় প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

বসুন্ধরার নিজস্ব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান থাকলেও তারা একাধিক ছায়া গণমাধ্যমে বিনিয়োগ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে অন্য কিছু গণমাধ্যমেও একই ধরনের অপতথ্য প্রকাশের নমুনা মেলে। যেমন, মুনিয়াকে নিয়ে অপপ্রচারে দেশ

রূপান্তর, সময়ের আলো, আলোকিত বাংলাদেশ, আমাদের সময় ডটকম, ঢাকা টাইমস২৪, আজকের খবরসহ বেশকিছু মিডিয়া যুক্ত হয়। দেশ রূপান্তর 'বোনের লোভী মুনিয়া' ও সময়ের আলো 'পোশাকের মতো প্রেমিক বদলাতেন মুনিয়া' এমন শিরোনাম দিয়ে প্রতিবেদন ছাপে।

ট্রান্সকম গ্রুপের দুটি পত্রিকা প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের ভূমিকা নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে তাদের বিরুদ্ধে ১/১১ সরকারের সময় রাজনৈতিক এজেন্ডা ঠিক করার অভিযোগ করা হয়। শেখ হাসিনা ও তার দলের নেতাদের বড় একটি অভিযোগ, ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে দেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন আনার যে চেষ্টা করা হয়েছিল, তাতে প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কয়েকটি দৈনিকের ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন। শেখ হাসিনা একাধিকবার অভিযোগ করেছেন, '২০০৭ সালে যখন ইমার্জেন্সি হয়, তখন দুটি পত্রিকা আদাজল খেয়ে নেমে গেল'। এমন অভিযোগের পেছনে অন্যতম কারণ ২০০৭ সালের ১১ জুন প্রথম আলো পত্রিকায় 'দুই নেত্রীকে সরে দাঁড়াতে হবে' শিরোনামের একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছিলেন সম্পাদক মতিউর রহমান।

১/১১ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে 'সেনা-গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর দেওয়া তথ্য যাচাই না করেই প্রকাশ করে ভুল করেছি-'২০১৬ সালে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের এই স্বীকারোক্তির পর দেশজুড়ে তীব্র বিতর্ক ও আলোচনা শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর মানহানি হয়েছে, এই অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সারা দেশে ৮৩টি মানহানির মামলা এবং ১৬টি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিডিনিউজ২৪.কম এমন কিছু প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যা অনেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করেন। তাদের ধারণা, মাহফুজ আনাম ও তার সংবাদপত্রকে বিপাকে ফেলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বসুন্ধরা গ্রুপের গণমাধ্যমগুলোও সে সময় ডেইলি স্টারের বিরুদ্ধে একই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

২০২৩ সালের মার্চে স্বাধীনতা দিবসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রতিবেদনের সঙ্গে এক শিশুর ছবি প্রকাশ করায় প্রথম আলোর সাভার প্রতিনিধি শামসুজ্জামান শামসকে গ্রেফতার করা হয়। সম্পাদকের বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা হয়। এরপর একাত্তর টিভি ও সময় টিভি প্রথম আলোর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন খবর প্রচার করে। এই দুটি চ্যানেল বিভিন্ন ঘটনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ নেয় বলে দেখা যায়। এমনকি সময় টেলিভিশন বিবিসি বাংলার কিছু সংবাদ নিয়েও অপপ্রচার চালায়। ওই সংবাদগুলো সরকারের জন্য অস্বস্তিকর ছিল বলে অনেকে মনে করেন। গত কয়েক বছরে সময় নিউজসহ কিছু সংবাদমাধ্যম অন্য কোনো গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করলে, পালটা সংবাদ প্রচার করে। অপতথ্য প্রচারের পর্যবেক্ষণে থাকা একাধিক সংস্থা সময় টিভিকে ভুয়া তথ্য প্রচারে শীর্ষস্থানে চিহ্নিত করেছে।

গণমাধ্যম মালিকেরা তাদের প্রভাব খাটিয়ে প্রচারমাধ্যমের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেন, এমন উদাহরণ আরও অনেক রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে টিউশন ফি মওকুফের দাবিতে বিক্ষোভকালে বাংলাদেশ লিবারেল আর্টস ইউনিভার্সিটির দুই শিক্ষার্থী গ্রেফতার হন। কিন্তু জেমকন গ্রুপের মালিকানাধীন ঢাকা ট্রিবিউন ও বাংলা ট্রিবিউন এই খবর প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। জেমকন গ্রুপের চেয়ারম্যান কাজী আনিস আহমেদ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। এ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, সংবাদ প্রচারে তাদের সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ায় ইচ্ছাকৃত হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। বেশির ভাগ গণমাধ্যম মালিক তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সংবাদ বা নিবন্ধের ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) ঘোষণা করেন না, ফলে বাড়তি সুবিধা নেওয়া হয়। বিশেষ করে, সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়।

সংবাদমাধ্যমের মালিকদের রাজনৈতিক স্বার্থও সংবাদ বিষয়বস্তুকে প্রভাবিত করে। ২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচনে একাধিক টিভি চ্যানেলের মালিক প্রার্থী হওয়ায় নিজেদের নির্বাচনি প্রচারের খবর দেওয়ার জন্য অস্বাভাবিক বেশি সংখ্যায় প্রতিবেদক পাঠায়। নির্বাচনি প্রচারে গণমাধ্যমের নিরপেক্ষতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা থ াকলেও তারা তাতে ভ্রুক্ষেপ করেননি। এর আগে ২০১৮ সালের নির্বাচনে একই আসনে যমুনা ও ইনডিপেনডেন্ট

টিভি চ্যানেলের মালিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় একজন প্রার্থী তার অধিকতর ক্ষমতার প্রভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর টিভি চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করিয়ে দেন।

অনেক সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে, তারা নিজেদের গণমাধ্যম ব্যবহার করে। সাম্প্রতিককালে রংধনু ও বসুন্ধরার মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে। ফলস্বরূপ, এ দুই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর গণমাধ্যম একে অপরের বিরুদ্ধে তাদের মালিকানাধীন গণমাধ্যম ব্যবহার করে প্রচারণা চালায়।

সব মিলিয়ে দেশের অধিকাংশ গণমাধ্যম কোনো না কোনোভাবে নিজেদের স্বার্থে বা সরকারের পক্ষ নেওয়ায়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সাংবাদিকতার নীতিবিরোধী ভূমিকা পালন করছে। ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। নিয়মিত ও ইচ্ছাকৃতভাবে মূলধারার অনেক গণমাধ্যমই এই অনৈতিক কাজ করছে। তারা এমন শিরোনাম ব্যবহার করে, যা পাঠক-দর্শকের কাছে বাস্তব মনে হয়। অনেক ক্ষেত্রে তথ্য বিকৃত করেও প্রকাশ করা হয়। অধিক পাঠক-দর্শক আকৃষ্ট করার জন্য গণমাধ্যমগুলো এমন অসৎ পন্থা অবলম্বন করে, যা সাংবাদিকতা পেশার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করে।

২০

জবাবদিহিতা এবং প্রশ্নবিদ্ধ সাংবাদিকতা

গণমাধ্যমের চূড়ান্ত জবাবদিহি পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে-যারা তথ্যের প্রকৃত গ্রাহক। বাংলাদেশের সংবিধান এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও তথ্য জানার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অধিকার তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সঠিক তথ্য জানার সুযোগ থাকে। আর গণতন্ত্রের অন্যতম অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গণমাধ্যম, যার মাধ্যমে মানুষ সঠিক তথ্য জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী মতামত গঠন করতে পারে। গণমাধ্যমের এই গুরুদায়িত্ব পালনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান রয়েছে এবং সেই আইনকানুন প্রতিপালনের জন্য রয়েছে নানা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এসব আইনকানুন ও প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই সহায়ক না হয়ে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে গণমাধ্যমের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং সেটি সরকার ও বেসরকারি বিনিয়োগকারীর ইচ্ছাধীন হয়ে অনেকটা একমুখী প্রচারযন্ত্রে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। ফলস্বরূপ গণমাধ্যম তার প্রতিশ্রুত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, আর মানুষ বস্তুনিষ্ঠ তথ্য থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই।

প্রযুক্তির নব নব উদ্ভাবন ও রূপান্তরের কারণে ঐতিহ্যগত গণমাধ্যম (ট্র্যাডিশনাল বা লিগ্যাসি মিডিয়া) ছাড়াও তথ্য জানার অনেক বিকল্প মাধ্যম এখন মানুষের হাতের নাগালে। কিন্তু এ নতুন মাধ্যমগুলোয় তথ্য প্রায়ই খণ্ডিত আকারে, পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, কিংবা বিকৃতরূপে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। অপতথ্য, ভুয়া তথ্য বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যের ছড়াছড়ি এবং তার ফলস্বরূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতার ঘটনাগুলো এখন নিয়মিত উদ্বেগের কারণ। তাই সাংবাদিকতার পেশাগত দায় এবং নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নটি আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এ নতুন বাস্তবতায় নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে গণমাধ্যমকে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল তথ্যের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। একটি সুস্থ ধারার গণমাধ্যম বিকাশের জন্য লাইসেন্সিং থেকে শুরু করে সংবাদ বিতরণ, এবং তার পরবর্তী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিরসন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে জবাবদিহি নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। এজন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন যথোপযুক্ত আইনগত ভিত্তি এবং নিবন্ধক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর ভূমিকা, তেমনই গণমাধ্যমের নিজস্ব জবাবদিহির ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং অবাধ তথ্য জানার সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার সমুন্নত রাখতে হলে সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যা ক্ষমতাসীন সরকারসহ সব রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আসতে হবে। এর পাশাপাশি প্রয়োজন গণমাধ্যম দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমের মালিকানা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, সর্বোপরি প্রকাশক, সম্পাদক, সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা।

সংবিধানের নিশ্চয়তা, পর্যাপ্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়নি। গণমাধ্যম তত্ত্বাবধানের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকলেও আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্রিয়তার অভাব রয়েছে। এর ফলে গণমাধ্যমের সংখ্যা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক গোষ্ঠীস্বার্থের বিনিয়োগের কারণে গণমাধ্যমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছে, যার ফলস্বরূপ সার্বিকভাবে গণমাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির কারণে মানুষের তথ্য গ্রহণ ও ব্যবহারের ধরনে পরিবর্তন এসেছে। এতে করে এমনিতেই প্রচলিত সংবাদমাধ্যমগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তার ওপর সরকারের বিভিন্ন সংস্থা এবং মালিকপক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বা হস্তক্ষেপের কারণে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলোর পেশাগত নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক স্বার্থে সম্পাদকীয় নীতি পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি কোনো কোনো সংস্থার অলিখিত চাপের অভিযোগও রয়েছে, যার কারণে সংবাদমাধ্যমে সেলফ সেন্সরশিপ বা স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের চর্চা বাড়ছে।

এসব কারণে পাঠক, দর্শক ও শ্রোতারা ঘটনার ভিন্নমত, অপরপক্ষ বা বিভিন্ন পক্ষের বক্তব্য এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যদিকে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বা ভুল তথ্যের শিকার হয়েও ভুক্তভোগীরা কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না। গণতন্ত্রের ধারাবাহিক চর্চার ফলে পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোয় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। সেসব দেশে তদারকির দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষগুলো গণমাধ্যম সংক্রান্ত নীতিমালা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সেখানকার গণমাধ্যমগুলো এখন নিজেরাই একক বা যৌথভাবে স্বনিয়ন্ত্রণ চর্চা করছে, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তারা বুঝতে পেরেছে, সরকার বা মালিক নয়, গণমাধ্যমের জবাবদিহি থাকতে হবে তথ্যের ভোক্তার কাছে। পাঠক, দর্শক ও শ্রোতারা মুখ ফিরিয়ে নিলে এই ডিজিটাল যুগে টিকে থাকা অসম্ভব।

অন্যদিকে, গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে থাকা দেশগুলো সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জবাবদিহির চর্চায় পিছিয়ে আছে। সেসব দেশও সংবাদমাধ্যম সম্পর্কিত আইনকানুন সংস্কারের পাশাপাশি তদারকি ও সহায়তার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়িয়ে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিচ্ছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ ধরনের উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা। বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের সময় কিছু গণমাধ্যমের পক্ষপাতমূলক রাজনৈতিক অবস্থান এবং তৎকালীন সরকারের দমন-নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ডে উসকানিমূলক ভূমিকার অভিযোগের প্রেক্ষাপটে এই উপলব্ধি আরও জোরালো হয়েছে।

প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য ১৯৭৩ সালের প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন অ্যাক্ট রয়েছে। বিগত কয়েক দশকে বিকশিত হওয়া সম্প্রচারমাধ্যমের জন্য রয়েছে জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা, বেসরকারি মালিকানাধীন এফএম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা, কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালন নীতিমালা, জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা, জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক অপারেশন অ্যান্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইন, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেশন অ্যাক্ট-এর মতো অনেক আইন ও নীতিমালা। এছাড়া শতাব্দীপ্রাচীন ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি অ্যাক্ট ও টেলিগ্রাফ অ্যাক্টও এখনো কার্যকর।

এসব আইনের অধীনে গণমাধ্যমের নিবন্ধন, প্রচারসংখ্যা যাচাই, স্পেকট্রাম ও ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দসহ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রয়েছে একাধিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো নিবন্ধন ও অনুমোদনের শর্তগুলো যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করা। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে তথ্য ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। টেলিভিশন, বেতার ও অনলাইনের ক্ষেত্রে এই কাজটি সম্প্রচার কমিশনের করার কথা। কিন্তু সরকার গত কয়েক দশকেও সম্প্রচার কমিশন গঠন করেনি, ফলে এসব ক্ষমতা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরাসরি প্রয়োগ করছে। বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানি হিসেবে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এর কার্যালয়েও নিবন্ধন করতে হয় এবং প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। কিন্তু অধিকাংশা প্রতিষ্ঠান তা পালন করে না এবং আরজেন্সসি আইনগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় না।

২০.১ যেভাবে প্রশ্নবিদ্ধ সাংবাদিকতা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দুর্নীতির ব্যাপকতা, রাষ্ট্রীয় অর্থ ও সম্পদ লুটপাটের প্রতিযোগিতা এবং মাফিয়াতন্ত্র যেভাবে অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে, তার কালো ছায়া গণমাধ্যমেও এসে পড়েছে। ক্ষমতাতোষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ নিয়ে গণমাধ্যমে কালোটাকার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। গণমাধ্যম জনস্বার্থে অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও বহুমতের সুস্থ গণতান্ত্রিক বিতর্কচর্চা প্রসারের পরিবর্তে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাকে প্রশ্ন করাই সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বাংলাদেশে সাংবাদিকরা সেই নৈতিক মনোবল প্রায় হারিয়ে ফেলেছেন। ক্ষমতাশালীর প্রশংসা বা তোষণ এবং ভিন্নমতকে বাতিল করে দেওয়া ও

বিরোধীদের কলঙ্কিত করাই যেন গণমাধ্যমের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনগুলো এই নির্মম বাস্তবতার প্রতীক। এসব সম্পাদক ও সমপদমর্যাদার সাংবাদিকরা সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে নিজেদের জাহির করতে যেমন আগ্রহী ছিলেন, তেমনই তারা সরকারের কাছ থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ফলে পেশার নীতি-নৈতিকতা বহুলাংশে নির্বাসিত হয়েছে।

গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় চাপ যেমন নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তেমনই তাদের সহযোগী হয়েছিল বন্ধু-স্বজন ও তোষণকারী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। অনেকে ফ্যাসিবাদের উত্থানে অতি উৎসাহে সহযোগিতা করেছেন, অনেকে পরোক্ষভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন। আর বাকিরা ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সামরিক-বেসামরিক সব নিরাপত্তা সংস্থা, দলীয় পেশিশক্তি, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতাভোগী দুর্বৃত্ত গোষ্ঠীগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিচারবিভাগও এক্ষেত্রে আইনি সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করেছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার সংকোচন সত্য প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সাংবাদিকতা পেশার মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাংবাদিক সমাজের রাজনৈতিক বিভাজন ও অনৈক্য। গণমাধ্যম একদিকে সরকারের তরফ থেকে হয়রানির আশঙ্কায় যেমন সেলফ সেন্সরশিপে অভ্যস্ত হয়েছে, তেমনই মালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ কিংবা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকটের কারণে আপস করতে বাধ্য হয়েছে।

বিগত দুই দশকে বাংলাদেশের গণমাধ্যম খাতে অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তিগত বিকাশের পাশাপাশি গণমাধ্যমের সংখ্যাও অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়েছে। বড় বড় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলো এই খাতে বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু, প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাবে সাংবাদিকতার নৈতিক বিকাশ ঘটেনি, বরং উদ্বেগজনক অবক্ষয় ঘটেছে। দক্ষ জনবলের অভাব মেটাতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। দেশের উচ্চ বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠানই নামমাত্র বেতনে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনা বেতনে সংবাদকর্মী নিয়োগ করেছে, যা দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ সংবাদকর্মী তৈরি করতে পারেনি। সাংবাদিকতা ছাড়াও গণমাধ্যমের জন্য আকর্ষণীয় ও মানসম্পন্ন সৃজনশীল অনুষ্ঠান নির্মাতা তৈরির ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়ে গেছে।

কেবল সংখ্যার বিচারে গণমাধ্যমে বহুত্ব (plurality) প্রদর্শনের কৌশল হিসেবে আওয়ামী লীগ সরকার ৪৬টি টেলিভিশন চ্যানেল, ২৮টি বেতার এবং শত শত সংবাদপত্র ও অনলাইন পোর্টালকে অনুমতি দিয়েছে। টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্প্রচার নীতিমালা কিংবা বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালন নীতি অনুসরণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রতি শর্তহীন আনুগত্যই ছিল একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। অনুমোদন পাওয়া টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর আবেদনপত্রে যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শুধু আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী পরিচয় এবং আওয়ামী লীগের আদর্শ ও আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম প্রচারই তাদের মিশন স্টেটমেন্ট হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

শুধু যে রাজনৈতিক নেতারাই (সংসদ সদস্য) স্বনামে অথবা পোষ্যদের নামে লাইসেন্স নেওয়ার ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় ব্যবহার করেছেন, তা নয়, কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ীও রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাব খাটিয়ে বেসরকারি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স নিয়েছেন। এসব সাংবাদিক নিজেদের আর্থিক সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও লাইসেন্স নিয়ে বিনিয়োগকারী খুঁজে নিয়েছেন এবং বিনা বিনিয়োগে শতকোটি টাকার মালিক হয়েছেন। কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন, অনৈতিক অতিমুনাফার লোভে সিন্ডিকেট গঠন বা বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ভূমিদস্যুতা এবং অর্থপাচারের মতো অপরাধকে আড়াল করার জন্য গণমাধ্যমের প্রভাবকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এমনকি, শিল্প কারখানার মালামাল পরিবহনে ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো শিল্পগোষ্ঠীর যানবাহনেও তাদের মালিকানাধীন গণমাধ্যম

প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোগো ব্যবহার করতে দেখা যায়। নদী দখল, ভূমি দখল কিংবা খাসজমির বরাদ্দ অথবা জাল দলিলের কারসাজির মতো অপরাধে প্রশাসনের ওপর তদবিরের জন্য সাংবাদিকদের কাজে লাগানোর অভিযোগও রয়েছে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সমিতি অ্যাসোসিয়েশন অব টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্স (অ্যাটকো)-এর পক্ষ থেকে কমিশন যেসব প্রস্তাব পেয়েছে, তার মধ্যে এক নম্বরেই আছে সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে 'ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের' চাপের কথা।

ব্যবসার ক্ষেত্রে অনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আছে-এমন অনেক ব্যবসায়ী সাংবাদিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পত্রিকা ও টেলিভিশনের অনুমতি ও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছেন। মূলত আইনে পত্রিকার ডিক্লারেশন কিংবা টেলিভিশনের লাইসেন্স হস্তান্তর নিষিদ্ধ থাকায় তারা এই কৌশল নেন। আবার সাংবাদিকদের মধ্যেও অনেককে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি তাদের আনুগত্যের বিচারে, যাদের সেই লাইসেন্স পাওয়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য থাকার কথা নয়। ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এমন বিনিয়োগকারীর দ্বারস্থ হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে নানা রকম আর্থিক অনিয়ম ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অসাধু উপায়ে অর্জিত পুঁজির দাপট গণমাধ্যমে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সম্পাদকীয় স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো এবং ক্ষমতাধর রাজনীতিক বা রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীর স্তুতি প্রচারে অনেকে বাধ্য হচ্ছেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ গণমাধ্যম সংস্থার মালিক প্রভাবশালী পুঁজিপতিরা। এদের অনেকের বিরুদ্ধে ভূমিদস্যুতা, ব্যাংক লুট কিংবা বাজার সিন্ডিকেট তৈরির অভিযোগ থাকলেও তাদের স্ত্রী, ভাই বা পরিবারের সদস্যরা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। ফলে ব্যবসা, রাজনীতি ও গণমাধ্যমজগৎ মিলেমিশে যে দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে, তাতে স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিছু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নানা সময়ে অন্যায় সুবিধা নেওয়ার চাপে অতিষ্ঠ একজন জেলা প্রশাসক গণমাধ্যম কমিশনকে জানিয়েছেন যে, এসব অসৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে গণমাধ্যমের অনুমতি বা লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ হওয়া দরকার। কমিশন অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় এমন অনেক অভিযোগ পেয়েছে যে, বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে নতুন পত্রিকা, টিভি চ্যানেল বা অনলাইন পোর্টাল চালুর জন্য উচ্চ বেতনে সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী (কলাকুশলী, প্রযুক্তিবিদ, সাধারণ বা প্রেস কর্মচারী) নিয়োগ দেওয়া হলেও, অল্প কিছুদিন পরেই তাদের বেতন-ভাতা কমানো, ছাঁটাই, এমনকি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে। গণমাধ্যমের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে অন্য যেসব ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তা হয় ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে, নয়তো তা অর্জনের সম্ভাবনা না থাকায় এমনটি করা হয়ে থাকে। এর ফলে গণমাধ্যমে ব্যাপক হারে বেকারত্ব তৈরি হয়েছে, চাকরিতে অনিশ্চয়তা বা নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। নিয়োগ ও বেতন-ভাতার ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যমান শ্রম আইনসহ অন্যান্য আইন ও নীতিমালা কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা বা অনীহার কারণে গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক ও অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে একধরনের অনিশ্চয়তা ও হতাশা তৈরি হয়েছে।

মাঠপর্যায়ের প্রকাশক, সম্পাদক, সাংবাদিক, শিক্ষক এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কমিশন অসংখ্য অভিযোগ পেয়েছে যে, বেশকিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান শুধু পরিচয়পত্র দেওয়ার মাধ্যমে জেলা-উপজেলায় সংবাদদাতা নিয়োগ করে, যারা কোনো বেতন-ভাতা পান না। তাদের ওপর বিজ্ঞাপন সংগ্রহ কিংবা খবর প্রচারের মাধ্যমে অর্থ আদায় করে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত টাকা দিতে বাধ্য করা হয়। এমনকি, এ ধরনের নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্রের জন্য আলাদা করে লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগও পাওয়া গেছে। মাঠপর্যায়ে কর্মরত এসব সাংবাদিকের আর্থিক নিরাপত্তা ও চাকরির নিশ্চয়তা না থাকায় তারা নানা ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সংবাদদাতা একসঙ্গে তিন থেকে চারটি গণমাধ্যমের কাজ করছেন, যা একদিকে তার পেশাগত ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, অন্যদিকে পাঠক-দর্শককে বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত করছে। এতে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা এবং পেশার মর্যাদা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, যা গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থায় চিড় ধরাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে একজন সাংবাদিককে একই সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক ও পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়ানোর বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, যা পেশার সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

জনস্বার্থের বদলে ব্যক্তি, পরিবার ও গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে গণমাধ্যমের যে অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছে, তার সঙ্গে তাল মেলানোর মতো দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি দেশে প্রকট। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম এবং গণযোগাযোগ বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষাসূচিতে পাঠদান করা হলেও তা গণমাধ্যম শিল্পের প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না, তার কোনো জরিপ বা গবেষণালব্ধ তথ্য কমিশনের কাছে নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মাত্র দু-তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠান সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমের প্রযুক্তি ও বিভিন্ন কলাকৌশলগত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোও নিজেদের ইনহাউস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সাধারণত রাখে না। ফলে, অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, দেশের গণমাধ্যমে সাংবাদিকতা ও সৃজনশীল অনুষ্ঠান বা কন্টেন্ট নির্মাণের জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি প্রকটভাবে অনুভূত হচ্ছে। গণমাধ্যমের সংখ্যাধিক্যের কারণে একধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতাও তৈরি হয়েছে। ব্রেকিং নিউজ দেওয়া, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া বিষয় ঘিরে নানা ধরনের প্রতিবেদন বা আলোচনায় সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা প্রায়ই উপেক্ষিত হচ্ছে। এখানেও প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতিই মূলত দায়ী। ব্রেকিং নিউজ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকগুলো অগ্রহণযোগ্য বিভ্রাটের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে।

গণমাধ্যমের ওপর একচ্ছত্র রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক ও বহুত্বের (প্লুরালিটি) একটা ধোঁয়াশা তৈরির লক্ষ্যে সাবেক স্বৈরতান্ত্রিক সরকার দলীয় অনুসারী ও তোষণকারীদের বিপুল সংখ্যায় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স বা অনুমতি দিয়েছে, যা এই শিল্পে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কয়েকটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে ও কৌশলে যেমন একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছে, তেমনই ছোট বা দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলো টিকে থাকার জন্য বেসরকারি বিজ্ঞাপনে অস্বাভাবিক ছাড় (ডিসকাউন্ট) দিয়ে বাজারে নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্রের জন্য নানাভাবে সরকারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব কৌশল অনুসরণ সত্ত্বেও তাদের আয় তেমন বাড়েনি এবং প্রতিষ্ঠানগুলোয় জনবল ছাঁটাই ও বেতন-ভাতা কর্তন বা অনিয়মিত হয়ে পড়ার মতো ঘটনা ঘটছে। এই অস্বচ্ছ এবং দুর্বল ব্যবসায়িক মডেল স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিধিকে ক্রমশ সংকুচিত করছে।

গত কয়েক দশকে সাংবাদিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভক্তি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে। সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষার সংগঠন ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, যার ফলস্বরূপ রিপোর্টারদের আলাদা সংগঠন, রিপোর্টার্স ইউনিটি, সহ-সম্পাদকদের সংগঠন, সাব-এডিটরস কাউন্সিল, কলামিস্টদের সংগঠনের মতো বিভাজিত সংগঠনের জন্ম হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিটভিত্তিক সমিতি গঠিত হয়েছে এবং পরে সেই বিটভিত্তিক সংগঠনগুলোও দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। সাংবাদিকদের অবসর কাটানো ও বিনোদনের সংঘ প্রেস ক্লাবগুলোও একইভাবে অনৈক্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকার বাইরে জেলা-উপজেলায় এমনও দেখা গেছে যে, এক উপজেলায় চারটি প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রেস ক্লাবের পরিচয় বিশেষ প্রভাব ও মর্যাদার সুযোগ তৈরি করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি সম্পত্তি প্রেস ক্লাবের নামে বরাদ্দ নেওয়ার পর সেখানে নানা ধরনের বাণিজ্যিক স্থাপনা বা আয়ের ব্যবস্থা করায় নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব স্বার্থের সংঘাতে রূপ নিয়েছে। পতিত স্বৈরাচারের সহযোগী ও লুটেরা ব্যবসায়ীদের অর্থ বা পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করে ভবন নির্মাণ, সাংবাদিকদের পুরস্কার প্রদান এবং নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ সাংবাদিকদের পেশাগত অবস্থানকে উজ্জ্বল না করে বরং কলুষিত করেছে। দুঃখজনকভাবে, এসব তৎপরতা সাংবাদিকদের পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার পরিবর্তে তার মারাত্মক ক্ষতি করছে। অনেক জায়গায় এসব বিরোধের সুযোগে রাজনীতিবিদ এবং আমলারা এসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সাংবাদিকতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছেন।

মাঠপর্যায়ের প্রায় সব মতবিনিময় সভাতেই সাংবাদিকেরা নিজেরা এ বিষয়ে তাদের উদ্বেগ জানিয়েছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তারাও প্রেস ক্লাব ও বিভিন্ন পরিচয়ধারী (যেমন বিটভিত্তিক) সাংবাদিক সংগঠনের অনৈতিক সুবিধা দাবি ও তদবিরের অভিযোগ তুলেছেন। প্রেস ক্লাবগুলো প্রধানত সামাজিক সংঘ হিসেবে সমাজসেবা অধিদপ্তর অথবা কোম্পানি

আইনে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজের নিয়ন্ত্রণ বা তদারকিতে পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রশাসন প্রেস ক্লাবগুলোকে সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে। এই বিভ্রান্তি পেশাগত কাজেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

২০.২ সংবাদে উপস্থাপনের ধরন ও পাঠক-দর্শকদের মানসিক স্বাস্থ্য

সারা পৃথিবীতে সংবাদ উপস্থাপনের ধরন এবং সংবাদ পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি বর্তমানে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি ভালো ছবি যেমন পাঠকের মনকে ভালো করতে পারে আবার একটি বেদনাদায়ক ছবিও মানুষের দীর্ঘ মনোবেদনার কারণ হতে পারে। বর্তমানে মূলধারার গণমাধ্যমগুলো (সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন, মাল্টিমিডিয়া) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেভাবে বা যে ভঙ্গিমায় সোশ্যাল মিডিয়ায় শিরোনাম, ছবি, তথ্য ও ভিডিও উপস্থাপন করে তা দর্শক, শ্রোতা বা পাঠকের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন দেশের একাডেমিক গবেষণায় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিউজ গৃহীতার মানসিক স্যস্থ্যের বিষয়টি বেশির ভাগ গণমাধ্যম এড়িয়ে যাচ্ছে।

দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, গণমাধ্যমগুলোর মনে রাখতে হবে যে তাদের বিভিন্ন ধরনের পাঠক, শ্রোতা বা দর্শক রয়েছে। যাদের একেকজনের চাহিদাও ভিন্ন হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, ক্রমাগত নেতিবাচক বা সংবেদনশীল সংবাদ পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকের মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা এবং এমনকি পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার (পিটিএসডি)-এর মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায়, নেতিবাচক সংবাদ, যেমন: সহিংসতা, দুর্যোগ, বাজারমূল্যের লাগামহীন বৃদ্ধি, গণহারে শ্রমিক ছাঁটাই এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রতিবেদন, মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সংবাদ গ্রহণের একটি প্রধান উৎস হওয়ায় এটি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।

বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোর অনলাইন ভার্সন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দেশে যখন যেই আলোচনা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশি থাকে, বার্তাকক্ষগুলো সেই বিষয়ে সারাদিন নিউজ প্রচার করে থাকে; যা অনেকের মানসিক স্বাস্থ্যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন: দেশে কোনো রাজনৈতিক সংঘাত দেখা দিলে একনাগাড়ে শুধু সংঘর্ষের খবর প্রচার হতে থাকে। দেশে যখন যে ধরনের অপরাধ বেশি সংঘটিত হয়, সেই ধরনের অপরাধের খবর বেশি প্রকাশিত হতে থাকে। পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এসব সংবাদ যে ধরনের শিরোনাম, ছবি, তথ্য এবং ভিডিও প্রচার করা হয়, তা অনেক ক্ষেত্রে স্ব-স্ব বার্তাকক্ষের সম্পাদকীয় নীতি ভঙ্গ করে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অসুস্থ, বয়স্ক নাগরিক এবং শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টি গ্রাহ্য করা হয় না।

২১

কমিশনের সুপারিশমালা

গণমাধ্যমের মালিকানা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যমের মালিকানার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং একক মালিকানা ও একাধিক গণমাধ্যমের মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের কেন্দ্রীকরণের বিষয়গুলোয় সংস্কার শুরু হয়েছে। এমনকি দর্শক বা পাঠকের কত শতাংশ একটি গণমাধ্যমের গ্রাহক/ ভোক্তা, এর ভিত্তিতেও সেই গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের নতুন প্রকল্পের অনুমোদন বা আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। একক মালিকানার পরিবর্তে মালিকানা বিস্তৃত (diffusion of ownership) করার প্রয়োজনীয়তার কথা আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন কমিশন তার প্রতিবেদনে বলেছিল। ইন্দোনেশিয়ায় গণমাধ্যম চালু করার অধিকার দেশটির যে কোনো নাগরিকের রয়েছে; কিন্তু সেই গণমাধ্যমকে করপোরেশন হিসাবে কাজ করতে হয়, যার অর্থ হচ্ছে তা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হবে, যাতে সাধারণ মানুষও শেয়ার ধারণ করতে পারবে। একইসঙ্গে দেশটির মিডিয়া অ্যাক্টে সাংবাদিক-কর্মচারীদের শেয়ার দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বেও অধিকাংশ বড় গণমাধ্যম কোম্পানি শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির কারণে কোম্পানির উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপকদের শেয়ারহোল্ডারদের কাছে অন্তত জবাবদিহি করতে হয়।

তথ্যের সঙ্গে মানুষের বিশ্বাস বা আস্থার বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা জনগণের আমানতের সঙ্গে তুলনীয়। অথচ ব্যাংকের আমানতকে জনগণের আমানত বিবেচনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তি বাধ্যতামূলক করা হলেও আমাদের দেশে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তেমনটি করা হয়নি। ব্যাংকিং খাতে কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্যোক্তা পরিচালক পারিবারিকভাবে ১০ শতাংশের বেশি শেয়ারধারণ করতে পারে না এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে একই সময়ে পরিবারের তিনজনের বেশি পরিচালক থাকতে পারেন না। কিন্তু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রে তাই পরিবর্তন প্রয়োজন।

২১.১ কমিশন প্রথম পর্যায়ে মাঝারি ও বৃহৎ মিডিয়া কোম্পানিগুলোকে সর্বসাধারণের জন্য শেয়ার ছাড়া ও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সমীচীন মনে করছে। উদ্যোক্তা পরিচালক ও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শেয়ার ধারণের সীমা ২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত করা ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে শেয়ারবন্টন বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। কর্মীদের শেয়ার ধারণের সর্বোচ্চ সীমা পাঁচ শতাংশেই সীমিত রাখতে হবে, যাতে উদ্যোক্তারা কর্মীদের সঙ্গে মিলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারেন।

২. ছোট আকারের মিডিয়া কোম্পানিতে কর্মীদের শেয়ার দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

৩. একই কোম্পানি/গোষ্ঠী/ব্যক্তি/পরিবার/উদ্যোক্তা যাতে একই সঙ্গে একাধিক মাধ্যমের মালিক হতে না পারেন, সেজন্য বিশ্বের বহুদেশে ক্রস-ওনারশিপ (টেলিভিশনের মালিক সংবাদপত্রের মালিক হতে পারেন না, বা সংবাদপত্রের মালিক টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক হতে পারেন না) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রেও এটি আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটেনেও কাছাকাছি ধরনের এক আইনে টেলিভিশনের মালিক কোনো স্থানীয় পত্রিকায় ২০ শতাংশের বেশি শেয়ার ধারণ করতে পারেন না। ভারতে এ ধরনের একটি বিল পার্লামেন্টে বিতর্কের অপেক্ষায় আছে। আমাদের দেশেও বেসরকারি খাতে টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন দেওয়ার সময় এই মর্মে সিদ্ধান্ত ও প্রজ্ঞাপন হয়েছিল বলে তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু

সাইয়িদ গণমাধ্যম কমিশনের কাছে পেশ করা লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছেন। তবে সেই প্রজ্ঞাপন মন্ত্রণালয়ে খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্পষ্টতই সরকারগুলো ওই নীতি অনুসরণ করেনি।

৪. বৈশ্বিক উত্তম চর্চা হচ্ছে গণমাধ্যমের কেন্দ্রীকরণ যেন কোনোভাবেই ঘটতে না পারে, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ। কমিশন মনে করে, আমাদেরও অচিরেই অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। ক্রস-ওনারশিপ নিষিদ্ধ করে অর্ডিন্যান্স জারি করা যায় এবং যেসব ক্ষেত্রে এটি বিদ্যমান, সেগুলোয় পরিবর্তন আনার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়ে তাদের ব্যবসা পুনর্গঠনের লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া প্রয়োজন। এগুলো নানা পদ্ধতিতে হতে পারে। যেসব কোম্পানি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পরিবার একই সঙ্গে টেলিভিশন ও পত্রিকার মালিক তারা যে কোনো একটি গণমাধ্যম রেখে অন্যগুলোর মালিকানা বিক্রির মাধ্যমে হস্তান্তর করে দিতে পারে। অথবা দুইটি মিডিয়ার (টেলিভিশন ও পত্রিকাকে) সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একত্রিত করে আরও শক্তিশালী ও বড় আকারের একটি মিডিয়া (টেলিভিশন অথবা দৈনিক পত্রিকা) পরিচালনা করতে পারে।

৫. গণমাধ্যমে সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিনষ্ট করে–এমন ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। একক মালিকানায় একই ভাষায় একাধিক দৈনিক পত্রিকা বা একাধিক টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট করে। সেই সাথে গণমাধ্যমের যে প্রভাবক ক্ষমতা, তা নিজ স্বার্থে কেন্দ্রীভূত করে। সে কারণে এই ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। বিদ্যমান এ ব্যবস্থার দ্রুততম সমাধান করতে হবে। একই সাবান একাধিক মোড়কে বাজারজাত করা যেমন বাজারের প্রতিযোগিতাকে নষ্ট করে, একই মালিকানায় একই ভাষায় একাধিক দৈনিক পত্রিকাও গণমাধ্যমের প্রতিযোগিতাকে নষ্ট করে এবং পাঠক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টেলিভিশনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 'এক উদ্যোক্তার একটি গণমাধ্যম (ওয়ান হাউজ, ওয়ান মিডিয়া)' নীতি কার্যকর করাই গণমাধ্যমে কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধের সেরা উপায়।

৬. গণমাধ্যমের মালিকানায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাতে মানুষ জেনেশুনে তার পছন্দ (ইনফর্মড চয়েজ) বেছে নিতে পারে। তাছাড়া এতে গণমাধ্যমে কালোটাকার অনুপ্রবেশ নিরুৎসাহিত হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবছর তার আর্থিক হিসাব উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে তার আয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়।

৭. সাংবাদিকদের ইউনিয়ন, সংঘ বা সমিতিগুলো তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাধীন। তবে সাংবাদিকদের ইউনিয়ন ছাড়াও নানা কারণ ও উদ্দেশ্যে সাংবাদিকদের অসংখ্য সংগঠন গড়ে উঠেছে। একই জেলা বা উপজেলায় একাধিক প্রেস ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একইভাবে বিভাগ ও এলাকাভিত্তিক সাংবাদিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু সংগঠন রাজনীতিকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সুবিধা লাভের জন্য ক্ষমতা তোষণে লিপ্ত বলেও অভিযোগ রয়েছে। এ পটভূমিতে সৃষ্ট পরিস্থিতি সাংবাদিকতা পেশার জন্য শুধু অপ্রীতিকরই নয়, বরং স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য বড় অন্তরায়। তাই ইউনিয়ন ছাড়া অন্যান্য সংগঠনকে সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার অধিকার সরকার বা অন্য সব প্রতিষ্ঠানের রয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় কোনো সুযোগ-সুবিধা এসব সংঘ-সমিতির প্রাপ্য নয়। সম্পাদকীয় প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে কমিশন আশা প্রকাশ করে।

৮. গণমাধ্যমের কলাম লেখক, প্রদায়ক, শিল্পী ও অতিথি উপস্থাপক/আলোচকদের সম্মানির ওপর যে অগ্রিম কর নেওয়া হয়, তা সৃজনশীলতার ওপর করারোপের সমতুল্য। এই অগ্রিম কর রহিত করা উচিত।

২১.২ বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন

(প্রেস কাউন্সিল ও প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের পরিবর্তে)

সব ধরনের গণমাধ্যমকে একই তদারকি বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ উঠে এসেছে অধিকাংশ মতবিনিময় সভায়। সংবাদপত্র ও বার্তা সংস্থার জন্য বর্তমানে সচল বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এবংসম্প্রচারমাধ্যম

ও অনলাইনের জন্য বিগত সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের সমন্বয়ে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা যেতে পারে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। গণমাধ্যমের স্বনিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তার অভিজ্ঞতার আলোকেই এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার।

এটি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেজন্য প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে। সরকারি অর্থের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থই হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে সরকার কর্তৃক প্রভাবিত হওয়া। সেজন্যে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তাদের আয় থেকে নির্ধারিত হারে চাঁদা নির্ধারণের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের সংস্থান করা যেতে পারে। ভারতের প্রেসকাউন্সিল প্রতিটি সংবাদপত্রের ওপর আনুপাতিক হারে লেভি আদায় করে থাকে। তারা সরকারের অনুদানও গ্রহণ করে। ইন্দোনেশিয়ায়ও মিডিয়া কাউন্সিল সরকারের সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তা নিঃশর্ত হতে হয়। বাংলাদেশেও প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশনে সরকারি সহায়তা নেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত, তবে তা হতে হবে নিঃশর্ত অনুদান।

গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন যেসব দায়িত্ব পালন করবে তার মধ্য আছেঃ

ক. প্রকাশক ও সম্পাদকের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নির্ধারণ যাতে ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত এবং ঋণখেলাপিরা গণমাধ্যমে মালিক/সম্পাদক না হতে পারে।

খ. সাংবাদিকতার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ

গ. সারাদেশে কর্মরত সাংবাদিকরা গণমাধ্যম কমিশনে নিবন্ধিত হবেন এবং কমিশন তাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করবে।

ঘ. সাংবাদিকদের জন্য একটি আচরণবিধি (কোড অব কন্ডাক্ট) প্রণয়ন করবে ও তার প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

ঙ. সম্প্রচার মাধ্যম (টিভি ও রেডিও) এবং অনলাইন পোর্টালের লাইসেন্স প্রদানের সুপারিশ ও তার শর্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

চ. ভুল বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর অভিযোগের প্রতিকার। এটি সম্ভব হলে সংবাদমাধ্যমের প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হবে এবং গণমাধ্যম মানুষের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে।

(প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত করা হলো।)

২১.৩ সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইন

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন বিশ্বের উত্তম চর্চার কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোকে সাংবাদিকতা সুরক্ষা আইনের একটি খসড়া অধ্যাদেশ আকারে এই রিপোর্ট সংযুক্ত করেছে এবং দ্রুতই এটি জারি করার ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব করছে। এছাড়াও গত ১৫ বছরে বিভিন্ন আইনের অপপ্রয়োগের ঘটনাগুলো সম্পর্কে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ সমীচীন বলে মনে করছেঃ

ক. দণ্ডবিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, সাইবার নিরাপত্তা আইন এবং আদালত অবমাননা আইনসহ প্রযোজ্য বিভিন্ন আইনের অধীনে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলো চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনার পর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কৌঁসুলি কর্তৃক মামলা প্রত্যাহার অথবা পুলিশ কর্তৃক চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

খ. পর্যালোচনা সাপেক্ষে মিথ্যা মামলার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ও ন্যায়সংগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ. ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানকে যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ঙ. সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও জীবনে বেআইনি অনুপ্রবেশ, নজরদারি ও আড়িপাতার ঘটনাগুলো তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২১.৪ সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য আইন সংস্কার

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের সংশোধন প্রয়োজন যাতে, বাকস্বাধীনতা ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধের বিষয়টি শুধু যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য হবে।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে সংবিধানে আলাদা ও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। যেমন: সুইজারল্যান্ডের সংবিধানে সাংবাদিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ ও সূত্রের গোপনীয়তা রক্ষা এবং সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন না করার অধিকার নিশ্চিত করেছে। সুইডেনের সংবিধানেও ফ্রিডম অব প্রেসের অনুরূপ গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। আমাদের সংবিধানেও সুইজারল্যান্ডের সংবিধানের মতো সাংবাদিকতার স্বাধীনতার গ্যারান্টির প্রশ্নটি সুনির্দিষ্টভাবে ও বিশদে লিপিবদ্ধ করা সমীচীন।

২১.৪.১ ফৌজদারি মানহানি

ফৌজদারি মানহানির সব আইন, যেমন: ১৮৬০ সালের বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯, ৫০০, ৫০১ এবং ৫০২ ধারা এবং ২০২৩ সালের সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৯ ধারা বাতিল করা উচিত। সেই সঙ্গে সাংবাদিকদের মানহানি সংক্রান্ত অপরাধের বিষয়টি নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রস্তাবিত গণমাধ্যম কমিশনের ওপর প্রদান করার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।

ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের ৯৯ক এবং ৯৯খ ধারায় সরকারকে সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত করার যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদের (আইসিসিপিআর) পরিপন্থি। অতএব তা বাতিল করা উচিত।

২১.৪.২ সাইবার নিরাপত্তা আইন

প্রস্তাবিত সাইবার নিরাপত্তা আইনের যেসব বিধান নিয়ে সাংবাদিক, অধিকারকর্মী ও আইন বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদের উদ্বেগ রয়েছে, তা নিরসন করতে হবে।

২১.৪.৩ অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩

৫ ধারা সংশোধন করে কেবল জাতীয় নিরাপত্তার ওপর জোর দেওয়া উচিত এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য জনস্বার্থের প্রশ্নে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা সংযোজন করা উচিত।

২১.৪.৪ আদালত অবমাননা আইন

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (ICCPR) এর ১৪ অনুচ্ছেদের অধীনে ন্যায়বিচারের অধিকার এবং নির্দোষিতার স্বীকৃতি রক্ষার জন্য ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

খ. ২০১৩ সালের আদালত অবমাননা আইন (যা ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন বাতিল করেছিল এবং 'আদালতের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা' অপরাধ পুনরায় প্রবর্তন করেছিল) বাতিল সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে বিচারাধীন থাকা ২০২৩ সালের ১২৩৪নং দেওয়ানি আপিলের দ্রুত শুনানির জন্য সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

২১.৪.৫ বিদ্বেষমূলক বক্তব্য সংক্রান্ত আইন

দণ্ডবিধির ২৯৫ক এবং ২৯৮ ধারা এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৮ ধারা বাতিল করা উচিত।

২১.৪.৬ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯

তথ্য অধিকার আইনের ৭নং ধারা সংশোধন করে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতি রেখে ICCPR-এর ১৪, ১৯ এবং ২০নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী করা উচিত, যাতে তথ্যাদি প্রকাশনার ফলে বিচারকার্য, জাতীয় নিরাপত্তা বা কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়। কিন্তু জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক হলে এ বাধাগুলো অতিক্রম করার জন্য একটি 'ব্যতিক্রম (Exception)'-এর বিধান থাকা উচিত হবে।

তথ্য অধিকার আইন সংশোধন করে এমন একটি বিধানের সংযোজন করতে হবে, যাতে যখন জনস্বার্থে তথ্য প্রকাশ আবশ্যক হয়, বেসরকারি কোম্পানি এবং সংস্থা/এনজিওগুলোর কাছেও তথ্য অধিকারের আবেদন করা যায়।

তথ্য অধিকার আইনের ৬নং ধারা সংশোধন করে একটি নতুন বিধান সংযুক্ত করতে হবে। এই বিধান অনুযায়ী, তথ্য কমিশন প্রতিটি সরকারি কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রকাশনার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রতিটি কর্তৃপক্ষ তাদের তথ্য প্রকাশনায় কতটা সফল হয়েছে, সে বিষয়ে লিখিত মতামত প্রদান করবে। এছাড়াও তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইনের অধীনে করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত সব তথ্যের একটি উন্মুক্ত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার (Central Database) তৈরি করবে, যাতে ভবিষ্যতে জনগণ আলাদাভাবে আবেদন না করেই এই তথ্য পেতে পারে।

২১.৪.৭ তথ্য-উপাত্ত ব্লক বা অপসারণ করা

বিটিআরএ-এর ৬৬ক ধারা এবং ৯৭ক ধারা (যা অজ্ঞাতনামা নিরাপত্তা সংস্থা এবং বিটিআরসি-কে নির্দেশ করে), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৪৬ ধারা এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৮ ধারা সংশোধন করা উচিত, যাতে আধেয় অপসারণের সিদ্ধান্ত উপযুক্ত আদালতের অনুমোদন ছাড়া নিষিদ্ধ হয়।

২১.৪.৮ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪

এসব বিশেষণ বর্জন এবং 'দেশের ঐতিহাসিক মর্যাদাকে বিকৃত' করে এমন বিষয়বস্তু এবং 'আইন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়'-এর মতো বিধিনিষেধের সীমা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন (ICCPR) অনুযায়ী কেবল অনুমোদিত কারণেই সম্প্রচার সীমাবদ্ধ করা যাবে, তা নিশ্চিত করার জন্য এই বিধিনিষেধগুলো পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

২১.৪.৯ অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭

গণমাধ্যমের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করার জন্য, এই নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করা উচিত এবং সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবিত স্থায়ী গণমাধ্যম কমিশনের ওপর এর তত্ত্বাবধান ও স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা প্রয়োজন।

২১.৫ বেসরকারি টেলিভিশনবিষয়ক সুপারিশসমূহ

২১.৫.১ বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর লাইসেন্সের আবেদন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র এবং লাইসেন্সধারীদের অঙ্গীকারনামা পর্যালোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এসব লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। এমনকি লাইসেন্স প্রাপকের কোনো পূর্বযোগ্যতা সুনির্দিষ্ট করা ছিল না। প্রধানত রাজনৈতিক বিবেচনা এবং কিছুটা ব্যবসায়িক পরিচিতির ভিত্তিতেই এসব লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। সরকারের 'বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল স্থাপন ও পরিচালন নীতিমালা'য় ২.৬তে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ বছরের জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং পরবর্তী সময়ে তাদের সুষ্ঠু কার্যক্রম পর্যালোচনা করে নবায়ন করার কথা বলা আছে। এ পটভূমিতে গত দেড় দশকে প্রদত্ত সব লাইসেন্স পর্যালোচনার দাবি রাখে।

যেহেতু সম্প্রচার নীতিমালায় সম্প্রচার কমিশন গঠনের কথা বলা আছে এবং সম্প্রচার লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করার দায়িত্ব সম্প্রচার কমিশনের, এবং যেহেতু গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গণমাধ্যমের সব বিষয়,

অর্থাৎ সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অনলাইনের জন্য বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিল ও প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সমন্বয়ে গণমাধ্যম কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছে, সেহেতু বেসরকারি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্সসমূহ পর্যালোচনার দায়িত্ব গণমাধ্যম কমিশনই পালন করবে।

২. গ্রহণযোগ্য ও যৌক্তিক টেলিভিশনের রেটিং পয়েন্ট টিআরপি নির্ণয় ব্যবস্থা দ্রুতসময়ের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান টিআরপি ব্যবস্থায় যে অনিয়ম হয়েছে, এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। মিথ্যা টিআরপি প্রচারের কারণে যেসব মিডিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা ক্ষতিপূরণ চাইলে তাদের দাবি বিবেচনা করতে হবে।

৩. টিআরপি তদারকি কার্যক্রমে অ্যাটকো, দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন ও বিজ্ঞাপন এজেন্সি থেকে একজন করে তিনজন প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। টিআরপি নির্ধারণ প্রক্রিয়া বেসরকারিভাবেও কোনো প্রতিষ্ঠান করতে চাইলে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। তাদের টিআরপি ব্যবস্থা যথাযথ হচ্ছে কি না, সেটা তদারকি করবে গণমাধ্যম কমিশন।

৪. সরকারি কোনো ঘোষণা ও বিজ্ঞাপন টেলিভিশনে প্রচারের ক্ষেত্রে ফি প্রদান করতে হবে।

৫. সরকার কেবল অপারেটরদের এক বছরের সময় বেঁধে দিয়ে ডিজিটালাইজেশনের নির্দেশ দেবে, যাতে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো রাজস্ব পেতে পারে।

৬. কেবল অপারেটরগুলো ডিজিটালাইজেশন হওয়ার আগ পর্যন্ত কেবল গ্রাহকের কাছ থেকে যে অর্থ আদায় করে, এর ২৫ শতাংশ মাসিক ভিত্তিতে দেশে চালু চ্যানেলগুলোকে সমহারে বণ্টন করবে।

৭. আপ-লিংক এবং ডাউন-লিংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কেবল লিমিটেড (BSCL) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা তুলে দিতে হবে৷ কারণ এই BSCL-এর মাধ্যমে কোনো চ্যানেল বহির্বিশ্বে সম্প্রচার করতে পারছে না।

২১.৬ এফএম রেডিওর সুপারিশ

১. রেডিওর শ্রোতা কমে যাওয়া এবং বিজ্ঞাপন থেকে তার আয় নাটকীয়ভাবে কমে যাওয়ায় এফএম রেডিও সম্প্রচার অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রেডিওর গুরুত্ব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। এফএম রেডিওর লাইসেন্সিংয়ে কিছু অযৌক্তিক বিধিনিষেধ রয়েছে, সেগুলো তুলে দেওয়া উচিত। যেমন, লাইসেন্সের বিপরীতে সরকার যে জামানত রাখে, তা ফেরত দেওয়া এবং জামানত রাখার বিধান রহিত করা উচিত।

২. এফএম রেডিওতে বার্ষিক নবায়ন পদ্ধতি তুলে দেওয়া উচিত।

৩. এফএম রেডিওতে বাংলাদেশ বেতারের তদারকির ব্যবস্থার অবসান হওয়া উচিত। তবে সম্প্রচারের মান এবং নীতিমালা বা কোড অব এথিক্স তদারকির কাজ গণমাধ্যম কমিশন করতে পারে।

৪. সরকারি ঘোষণা এফএম রেডিওতে প্রচার করতে হলে তাদের নির্ধারিত ফি দেওয়া উচিত।

৫. সরকারি বিজ্ঞাপন এফএম রেডিওতেও বরাদ্দ করার ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

২১.৭ অনলাইন পোর্টালের সুপারিশ

অনলাইন পোর্টাল একদিকে যেমন ব্যক্তি উদ্যোগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংবাদভিত্তিক পোর্টাল চালুর পথে উৎসাহিত করছে, তেমনই এর নিয়ন্ত্রণহীন ও বিশৃঙ্খল বিকাশ বা প্রসার ঘটছে। এই লাগামছাড়া বিস্তৃতি অনেকক্ষেত্রেই হলুদ সাংবাদিকতা, অনৈতিক ব্ল্যাকমেইলিং, নাগরিক হয়রানি এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ন করছে, তেমনইভাবে সৎ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য অস্বাভাবিক প্রতিকূলতা তৈরি করছে। বিগত সরকারের

অনলাইন নীতিমালা এক্ষেত্রে কার্যকর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। তাই এই নীতিমালা পর্যালোচনা করে তা বাস্তবানুগ এবং কার্যোপযোগী করা প্রয়োজন। নিবন্ধনহীন পোর্টালগুলো বন্ধের জন্য হাইকোর্টের একটি নির্দেশনা আছে। কিন্তু তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। এ কারণে অনলাইন পোর্টাল কখন গণমাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত হবে, তা নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি থাকা দরকার। গণমাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা একটি দৈনিক পত্রিকা বা সম্প্রচারমাধ্যমের সমপর্যায়ের হওয়া এবং তার অনুরূপ বিনিয়োগ সামর্থ্য নির্দিষ্ট করা না হলে এই বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকবে। বিগত সরকারের অনলাইন নীতিমালায় এই শর্তাবলি ঠিক করার দায়িত্ব প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের ওপর অর্পিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রচার কমিশন গঠন না করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় তাদের মর্জি অনুযায়ী নিবন্ধন দিয়েছে, যাতে রাজনৈতিক বিবেচনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

১. অনলাইন পোর্টাল নিবন্ধনের নীতিমালা হালনাগাদ করা এবং এর আলোকে নিবন্ধন প্রদানের দায়িত্ব ও ক্ষমতা যেহেতু বিগত সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশনের ওপর ন্যস্ত ছিল, সেহেতু তা গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন প্রস্তাবিত স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশনের ওপর অর্পণ করা সমীচীন।

২. গত দশকে যেসব অনলাইনে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে, তা যেহেতু কোনো স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট নীতির অধীনে হয়নি, বরং সরকারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে, সেহেতু সেগুলো পর্যালোচনা প্রয়োজন। এ পর্যালোচনার দায়িত্ব স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা সমীচীন।

৩. অনলাইন পোর্টাল নিবন্ধনের জন্য একাধিক নিরাপত্তা সংস্থার যে তদন্ত ব্যবস্থা রয়েছে, তার অবসান প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ডিক্লারেশনের জন্য বিদ্যমান পুলিশের তদন্তব্যবস্থাই যথেষ্ট গণ্য করা যায়।

৪. অনলাইন পোর্টালগুলো নিবন্ধন পাওয়ার পর তার বার্ষিক নবায়ন পদ্ধতি বাতিল করা হোক।

৫. অনলাইন নীতিমালায় আইপিটিভি এবং অনলাইন পোর্টালে সংবাদ বুলেটিন সম্প্রচার করা যাবে না–এমন নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা উচিত।

৬. অনলাইন পোর্টালে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতার আলোকে সরকারি বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. অনলাইন পোর্টালের জন্য ট্রেড লাইসেন্সের ফি সাধারণ ট্রেড লাইসেন্সের ফির কয়েক গুণ। এটি সংবাদমাধ্যমকে নিরুৎসাহিত করার নীতি। এর অবসান হওয়া উচিত।

২১.৮ বিটিভি, বেতার ও বাসস সম্পর্কে সুপারিশ

বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গত সাড়ে তিন দশক ধরে যে জাতীয় ঐকমত্য রয়েছে, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সম্প্রচারমাধ্যম হিসাবে টেলিভিশন এবং বেতার এক ছাদের নিচে একটি সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের দুটি শাখা হিসাবে কাজ করলে উভয় প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দক্ষতা ও সৃজনশীলতার সর্বোত্তম ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিবিসি এবং ডয়েচে ভেলে। এটি সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখে সংবাদ ও সাময়িক প্রসঙ্গের অনুষ্ঠানমালার ক্ষেত্রে। ভিডিও ফরম্যাটে ধারণকৃত প্রতিবেদন/অনুষ্ঠানের অডিও ফরম্যাটকে আলাদা করা খুব কঠিন কিছু নয়। আবার বেতারের অনেক অনুষ্ঠানই এখন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রচারের জন্য ভিডিও স্ট্রিমিং করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের ঢাকা ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো তা নিয়মিতভাবে করছে। এ বাস্তবতায় বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের মধ্যে সহযোগিতার (কোলাবরেশন) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এখন সময়ের দাবি। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিটিভি এবং বেতার উভয়ের বার্তাকক্ষ মোটেও পেশাদার সাংবাদিকতার সঙ্গে পরিচিত নয়, বরং পুরোটাই সরকারি হ্যান্ডআউট, রাষ্ট্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের খবর এবং উন্নয়ন বার্তা প্রচারে অভ্যস্ত। প্রধানত সরকারি তথ্য (সম্প্রচার) কর্মকর্তারা বার্তা বিভাগের নেতৃত্ব দেন এবং রিপোর্টার হিসাবে যাদের নিয়োগ দেওয়া হয়, তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ একেবারেই থাকে না।

বিপরীতে রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থায় বিভিন্ন ক্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি পেশাদার বার্তাকক্ষ রয়েছে। তবে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও দলীয়করণের কারণে সংস্থাটি আজ পর্যন্ত একটি আদর্শ বার্তা সংস্থায় পরিণত হতে পারেনি। প্রথম প্রেস কমিশনের রিপোর্টে সরকারের মালিকানায় কোনো বার্তা সংস্থা থাকা উচিত নয় বলে মতামত দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের বহু দেশেই কোনো রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা নেই। প্রথম প্রেস কমিশনের ওই রিপোর্টের ৪০ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন আনা যায়নি, বরং তা শুধু যে দল ক্ষমতায় আসে, সেই দলের অনুগত সাংবাদিকদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বৈশ্বিক পরিসরেও এখন বার্তা সংস্থাগুলো আর প্রথাগত বার্তা সংস্থা নেই। তারা ভিডিও সাংবাদিকতা এবং যুদ্ধবিগ্রহ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো পরিস্থিতির মানবিক বিষয়গুলোয় বেশি মনোযোগী হয়েছে। বাসসেও ভিডিও সাংবাদিকতার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১. এই বাস্তবতায় কমিশন মনে করে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে টিকিয়ে রাখার চেয়ে বাসসকে বিটিভি ও বেতারের নতুন সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের বার্তা বিভাগ হিসাবে একীভূত করাই হবে রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার। এই কেন্দ্রীয় বার্তা কক্ষের তৈরি খবর বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত হবে। বিটিভি, বেতার ও বাসসের সমন্বয়ে সৃষ্ঠ নতুন প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা বা জাতীয় সম্প্রচার সংস্থা নামকরণ করা যেতে পারে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের তিনটি বিভাগ থাকবে–টেলিভিশন, বেতার ও বার্তা বিভাগ। নতুন সম্প্রচার সংস্থায় বার্তা বিভাগ তার বর্তমান গ্রাহকদের প্রদত্ত সেবা অব্যাহত রাখবে। প্রতিটি বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন করে পরিচালক থাকবেন এবং নতুন একীভূত সম্প্রচার সংস্থার প্রধান হবেন একজন মহাপরিচালক।

২. সরকার বর্তমানে যেভাবে অর্থায়ন করছে, ঠিক সেভাবেই এই নতুন প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন করবে। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা নিজস্ব আয়ের পথও বের করবে। সরকার টেলিভিশন সেটের বার্ষিক লাইসেন্স ফি পুনঃপ্রবর্তনের কথা বিবেচনা করতে পারে।

৩. এটি একটি স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। পর্ষদের চেয়ারম্যান সার্বক্ষণিক এবং তার বেতন-ভাতা পর্ষদ ঠিক করবে। সদস্যগণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য সম্মানি পাবেন। এই পরিচালনা পর্ষদ জাতীয় সংসদের কাছে জবাবদিহি করবে।

৪. বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের গঠন: পরিচালনা পর্ষদ হবে ৯ সদস্যের। তাদের মধ্যে থাকবেন:

- সম্প্রচারমাধ্যমে পরিচালনা/নেতৃত্ব দেওয়া দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন;
- সাংবাদিকতায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন।
- শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিজগতে শীর্ষস্থানীয় একজন।
- শিক্ষাবিদ একজন।
- নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি একজন।
- একজন অর্থনীতিবিদ।
- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব/অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।
- বাংলাদেশ সম্প্রচার সংস্থার মহাপরিচালক যিনি এই পর্ষদের সদস্য সচিব হিসেবে যুক্ত থাকবেন। সরকার মহাপরিচালক নিয়োগ দেবেন; কিন্তু তিনি পরিচালনা পর্ষদের কাছে জবাবদিহি করবেন।
- সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে একজন নারী ও একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হবেন।
- এ সদস্যরাই তাদের মধ্যে থেকে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপারসন /সভাপতি নির্বাচন করবেন।

- মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং সংস্থার মহাপরিচালক চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হবেন।
- এই পরিচালনা পর্ষদই সম্পাদকীয় নীতিমালা ঠিক করবে। পর্ষদই আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হবে।
- পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা তিন বছরের জন্য মনোনীত হবেন। তবে একজন দুইবারের বেশি তার পদে থাকতে পারবেন না।

৫. পরিচালনা পর্ষদে মনোনয়নের জন্য একটি তিন সদস্যের বাছাই কমিটি হবে। একটি জাতীয় পত্রিকার সম্পাদক, বেসরকারি টেলিভিশনের প্রধান নির্বাহী এবং একজন শিক্ষাবিদ এই বাছাই কমিটির সদস্য হবেন। এ কমিটি পরিচালনা পর্ষদের ৬ জন সদস্যের বিপরীতে ১৮ জন সদস্যের নাম প্রস্তাব করবে। ওই প্রস্তাবনা থেকে সরকার পরিচালনা পর্ষদের জন্য ৬ জন সদস্য মনোনীত করবে।

৬. পরিচালনা পর্ষদ নতুন সংস্থার নিয়োগবিধি এবং নীতিমালা প্রণয়ন করবে।

৭. বর্তমান জনবলের মধ্যে রেডিও ও বিটিভিতে কেউ যদি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে না থাকতে চান, তাহলে তাদের অন্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে আত্তীকরণ করা হবে। যারা একীভূত সম্প্রচার সংস্থায় চাকরিতে থাকবেন, তাদের সরকারি চাকরির সব সুবিধাদি অপরিবর্তিত থাকবে। কেউ স্বেচ্ছায় চাকরির অবসায়ন চাইলে তিনি নিয়মানুযায়ী সমস্ত পাওনা পাবেন।

৮. নতুন একীভূত সম্প্রচার সংস্থা গঠনের সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের আশু করণীয়:

    ক. নতুন একীভূত সম্প্রচার সংস্থার জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি;

    খ. সম্প্রচার সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ গঠনের জন্য বাছাই কমিটি গঠন;

    গ. বাছাই কমিটির সুপারিশের আলোকে নতুন একীভূত সংস্থার স্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ গঠন;

    ঘ. বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অধীনে চাকরি অব্যাহত রাখা বা সরকারের অন্য কোনো দপ্তরে আত্তীকরণের সুযোগ দেওয়া;

    ঙ. একীভূত নতুন সম্প্রচার সংস্থার অবকাঠামোর আধুনিকায়নে এককালীন বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

২১.৯ বাসস সম্পর্কে বিকল্প প্রস্তাব

কমিশন অবশ্য বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিষয়ে বিকল্প যে প্রস্তাব পেয়েছে, সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেছে। ওই প্রস্তাবেও বাসস সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে নিজস্ব আয়ে পরিচালিত হবে। কমিশন সদস্য সৈয়দ আবদাল আহমেদ ভারতের প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) মডেল অনুকরণে বাসসকে পুনর্গঠনের এই প্রস্তাবটি আলাদাভাবে সুপারিশমালায় অর্ন্তভুক্ত করার কথা বলেছেন।

১. সংবাদমাধ্যম মালিক (নোয়াব ও অ্যাটকো) ও সম্পাদকদের প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি (সর্বোচ্চ দুইজন), প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর প্রতিনিধি ও একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হবে, যার মধ্য থেকে ট্রাস্টিরাই একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। ট্রাস্টি এবং চেয়ারম্যানের মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এবং কেউই পরপর দ্বিতীয় মেয়াদের যোগ্য হবেন না। এক মেয়াদে বিরতির পর পুনর্নির্বাচনের যোগ্য হবেন। বাসসের বর্তমান সম্পদের পুরোটাই অথবা অংশবিশেষ সরকার ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করবে। এই ট্রাস্ট তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কাছে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবে।

২. ট্রাস্ট সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবে এবং সেই শর্ত পূরণ সাপেক্ষে পদগুলো পূরণ করবে। সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের কাছে জবাবদিহি করবেন।

৩. ট্রাস্ট দ্রুততম সময়ে নিয়োগবিধি তৈরি করবে এবং তার ভিত্তিতে বর্তমান জনবলের নিয়োগ যাচাই করবে। যারা যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে পারবেন না, তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ দিয়ে আবারও যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে। দ্বিতীয়বারও কেউ যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে সরকার তাকে অন্য কোনো চাকরিতে আত্তীকরণ করবে। আর যারা বিকল্প চাকরিতে আগ্রহী নয়, তাদের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সব পাওনা পরিশোধের পর চাকরির অবসায়ন ঘটবে।

২১.১০ সংবাদপত্রশিল্পের জন্য সুপারিশ

সংবাদপত্রশিল্পের সংকট যে বাড়ছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এর অনেকটাই সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কারণে। এই প্রতিযোগিতার পরিবেশ নষ্টের মূল কারণ অসংখ্য সুযোগসন্ধানী, অনিয়মিত ও নামমাত্র প্রকাশনা। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ দৈনিক পত্রিকাগুলোর ঘোষিত সংখ্যা বিশ্বাস করতে হলে ঢাকা শহরের প্রতিটি দুধের শিশুকেও প্রতিদিন একটি করে দৈনিক পত্রিকা কিনতে হবে। দৈনিক এক কোটি ৫৩ লাখের বেশি কপি বাংলা পত্রিকা ঢাকায় বিতরণ হওয়ার এক অবাস্তব হিসাবের ভিত্তিতে সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়। ওই একই হিসাবে ঢাকায় দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা বিক্রি হয় ৬ লাখ ৮০ হাজার। ফলে প্রকৃত সম্ভাবনাময় পত্রিকাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর অবসান হওয়া দরকার।

১. সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা নিরীক্ষার সংস্কার করা জরুরি। বর্তমান ব্যবস্থায় দুর্নীতি হচ্ছে। মিডিয়া লিস্টভুক্ত হওয়ার জন্য যে শর্ত আছে, তাতে ন্যূনতম প্রচারসংখ্যা নির্ধারণ করা আছে। যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ক্ষেত্রে এটি ৬০০০, অন্যান্য বিভাগীয় শহর থেকে ৪০০০ এবং অন্যান্য শহর থেকে ৩০০০। এটি প্রচারসংখ্যা না হয়ে বিক্রীত কপির সংখ্যা হওয়া উচিত, যা পরিশোধিত মূল্যের বিল যাচাইসাপেক্ষ হবে। ঢাকার বাইরে অর্থাৎ বিভাগীয় শহরে তিন হাজার ও জেলা শহরে একহাজার বিক্রীত কপি থাকলে তারা মিডিয়া তালিকাভুক্ত হবে।

২. ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো মিডিয়া তালিকাভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা একই নির্ধারণ করা আছে। কিন্তু বাস্তবে ইংরেজি পত্রিকার পাঠকসংখ্যা বাংলার তুলনায় খুবই সীমিত। কিন্তু দেশে তরুণদের মধ্যে ইংরেজির প্রসার এবং বিদেশিদের জন্য ইংরেজি পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। পাশাপাশি ইংরেজি পত্রিকায় দক্ষ জনশক্তির অভাবে উৎপাদন ব্যয় বেশি। তাই ইংরেজি পত্রিকার ক্ষেত্রে বিক্রীত পত্রিকার সংখ্যা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগীয় শহরগুলোয় দুই হাজার কপি নির্ধারণ করা যুক্তিযুক্ত হবে। অন্যান্য শহরেও এটি আনুপাতিক হারে কমানো যেতে পারে।

৩. পত্রিকা বিক্রির হিসাবে স্বচ্ছতার জন্য পত্রিকার বিক্রির সংখ্যা প্রত্যয়নের ক্ষেত্রে পত্রিকা বিক্রির বিল আদায়ের রসিদ প্রদান আবশ্যক। এছাড়াও পত্রিকার রাজস্বের ওপর আয়কর রিটার্নের কপি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৪. অডিট ব্যুরো অব সার্কুলেশনের মাধ্যমে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা যাচাইয়ের জন্য প্রেস ও অফিস পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা চালু আছে, ওই ব্যবস্থায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। সেজন্য এই পরিদর্শনে নাগরিক সমাজের অন্তত তিনজন প্রতিনিধিকে যুক্ত করতে হবে। এ তিনজন মনোনীত হবেন গণমাধ্যম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আইনপেশায় অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞাপন এজেন্সি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে। এসব প্রতিনিধির কেউ দুই বা তিন বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এবং তাদের সম্মানি সরকার নির্ধারণ করবে।

৫. গত ১০ বছর পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার বাড়েনি। হার বা রেট বৃদ্ধি করতে হবে এবং বাজারের মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিজ্ঞাপনের হার বার্ষিক ভিত্তিতে বাড়ানো উচিত। বিজ্ঞাপনের মূল্যহার নির্ধারণে যে আলাদা শ্রেণিকরণ আছে, তা পর্যালোচনা প্রয়োজন এবং আনুপাতিক হারে তার সামঞ্জস্যকরণ সমীচীন।

৬. সরকারি বিজ্ঞাপনের রেট বেসরকারি বিজ্ঞাপনের রেটের তুলনায় নগণ্য। এ বৈষম্য কমাতে সরকারি বিজ্ঞাপনের মূল্যহার বর্তমান বাজারভিত্তিক করা প্রয়োজন।

৭. আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ের পত্রিকাগুলোয় পর্যাপ্ত বিজ্ঞাপন প্রয়োজন। স্থানীয় সম্প্রদায়/কমিউনিটির জনগণের জন্য প্রযোজ্য এমন তথ্যসংবলিত বিজ্ঞাপন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আঞ্চলিক/স্থানীয় পত্রিকায় দিতে হবে।

৮. সংবাদপত্রে অগ্রিম আয়করের নামে একধরনের অঘোষিত কর আরোপ করা হয়েছে। কেননা অগ্রিম আয়কর প্রতিবছরের প্রদেয় করের সঙ্গে সমন্বয় করা হয় না। সংবাদপত্রশিল্পে আরোপিত সব ধরনের অগ্রিম কর বাতিল করা সমীচীন।

৯. সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত করপোরেট ট্যাক্সের উচ্চহার (২৭.৫ শতাংশ) প্রকৃতপক্ষে এই শিল্পকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। শিল্প খাতের মধ্যে এই করপোরেট করহার সর্বোচ্চ। তৈরি পোশাকশিল্পে এই হার ১৫ শতাংশ। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিরীক্ষাকৃত হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটি করপূর্ব সামান্য মুনাফা করলেও কর পরিশোধের পর তা বড় ধরনের লোকসান করছে। করপোরেট ট্যাক্সের উচ্চহার এবং অগ্রিম কর আদায়ের ধারা অব্যাহত থাকলে অনেক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যাবে। এটি শক্তিশালী গণমাধ্যম গড়ে তোলার পথে বড় ধরনের প্রতিবন্ধক এবং তা অচিরেই অপসারণ করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে মালিকানা ও অন্যান্য শর্ত পূরণ সাপেক্ষ হবে।

১০. সংবাদপত্রশিল্পের জন্য নিউজপ্রিন্ট আমদানিতে শুল্কারোপ বন্ধের কথা বিবেচনা করা উচিত।

১১. সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কাছে পত্রিকাগুলোর প্রকাশিত বিজ্ঞাপন বাবদ পাওনা দ্রুত পরিশোধ করা প্রয়োজন।

১২. ইংরেজি সংবাদপত্রের জন্য সরকারি বিজ্ঞাপন হার নির্ধারণে বাংলা পত্রিকার সঙ্গে প্রচারসংখ্যা তুলনীয় নয়। তাই ইংরেজি পত্রিকার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিজ্ঞাপনের মূল্যহার যৌক্তিকীকরণ প্রয়োজন।

১৩. গণমাধ্যমের জন্য সহজ শর্তে, ন্যূনতম সুদে ঋণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪. জনস্বার্থে অলাভজনক (Non-Profit) গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য সব ধরনের কর ছাড় দিয়ে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা করবে, তা বাধ্যতামূলকভাবে পুনর্বিনিয়োগ করবে।

২১.১১ বিজ্ঞাপনের মান ও বিজ্ঞাপন বণ্টনে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা ও প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অন্যান্য অনলাইন মাধ্যমের আবির্ভাব ও জনপ্রিয়তার কারণে বিজ্ঞাপনদাতারা যখন ক্রমেই কথিত নিউ মিডিয়ামুখী হচ্ছে, বাংলাদেশে তখনো প্রথাগত গণমাধ্যম বা লিগ্যাসি মিডিয়ার প্রসারণ চলমান। ফলে বিজ্ঞাপন পাওয়ার প্রতিযোগিতা এক অসুস্থ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দাম কমানোর প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞাপনদাতারা লাভবান হচ্ছেন। আবার এই সংকটে বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর মধ্যেও প্রতিযোগিতায় যোগসাজশের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা থাকছে না। কমিশন অংশীজনদের মতামতের আলোকে মনে করে:

ক. অচিরেই বিজ্ঞাপনের মান ও প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করার জন্য একটি তদারকি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন মান কর্তৃপক্ষ (অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি) প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

খ. এই প্রতিষ্ঠান হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ সংস্থা।

গ. এই প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও বিভিন্ন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন নীতিমালা তৈরি করবে, যা বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সিসমূহ এবং বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমগুলোর জন্য অবশ্যপালনীয় হবে।

ঘ. পিআর এজেন্সি ও মিডিয়া বায়িংয়ের মতো বিষয়গুলোয়ও স্বচ্ছ নীতিমালা ও আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তা প্রতিপালন নিশ্চিত করবে এ কর্তৃপক্ষ।

ঙ. টেলিভিশনের রেটিং-ব্যবস্থা টিআরপি নির্ধারণ এবং সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা যাচাইয়ের পরিদর্শনব্যবস্থায় বিজ্ঞাপন এজেন্সিগুলোর সংগঠন, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। কমিশন এ সম্পর্কে আলাদা সুপারিশ করেছে।

চ. বিজ্ঞাপনশিল্পে কোনো ধরনের যোগসাজশ এবং সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিপন্থি কৌশল চর্চা হচ্ছে কি না, তা নিয়েও তদন্ত অনুষ্ঠান সমীচীন হবে। প্রতিযোগিতা কমিশন এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে পারে।

২১.১২ সাংবাদিকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও শ্রম আইন সম্পর্কিত সুপারিশ

গণমাধ্যমের সংখ্যাধিক্য ও দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকারত্বের পটভূমিতে সাংবাদিকতা পেশায় বেতন-ভাতা ক্রমেই কমছে বা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে, যেখানে প্রাপ্য বিভিন্ন ভাতা বাদ পড়ছে এবং চাকরির স্থায়িত্ব অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অথচ জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ছাড়া সাংবাদিকতায় আপসকামিতা ও দুর্নীতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়, যা বস্তুনিষ্ঠ ও স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থি। এ ধরনের অনিশ্চয়তা রাজনৈতিক ও স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি তোষণবাদী হতে উৎসাহিত বা বাধ্য করে। এ পরিস্থিতির অবসানে সব সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল, বেতার ও অনলাইনমাধ্যমের সাংবাদিক ও অন্য সংবাদকর্মীদের জন্য যেসব পদক্ষেপ আবশ্যক:

১. কোনো গণমাধ্যম নিয়োগপত্র ও ছবিসহ পরিচয়পত্র ছাড়া এবং বিনা বেতনে কোনো সাংবাদিককে অস্থায়ী, স্থায়ী কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করতে পারবে না।

২. সাংবাদিকদের শিক্ষানবিশ চাকরির মেয়াদ এক বছরের অধিক হবে না। এক্ষেত্রে তাকে সম্মানজনক শিক্ষানবিশ ভাতা প্রধান করতে হবে।

৩. সারা দেশের সাংবাদিকদের স্থায়ী চাকরির শুরুতে একটি অভিন্ন ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করা প্রয়োজন, যা হবে সরকারি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার (নবম গ্রেড) মূল বেতনের সমান। ঢাকায় জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বেশি হওয়ার দরুন ঢাকায় নিয়োজিত সাংবাদিকরা মূল বেতনের সঙ্গে 'ঢাকা ভাতা' (অ্যালাউন্স) প্রাপ্য হবেন। তিন বছর সংবাদদাতা (রিটেইনার) হিসেবে কাজ করার পর ঢাকার বাইরের সাংবাদিকরা নিজস্ব প্রতিবেদক (স্টাফ করেসপনডেন্ট) হিসেবে পদোন্নতি লাভ করবেন। ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা ও মর্যাদার এই বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্টেও বলা আছে।

৪. মূল বেতনের বাইরে সাংবাদিকরা বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসব ভাতা, ঝুঁকি ভাতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ফোন বিল, ইন্টারনেট বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অবসর ভাতা কিংবা গ্র্যাচুইটি প্রাপ্য হবেন।

৫. প্রতিবছরের শুরুতে পূর্ব বছরের গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাংবাদিকদের বেতন বৃদ্ধি হবে। অন্যান্য ভাতার ক্ষেত্রেও অন্তত দুই বছর পরপর মূল্যস্ফীতি সামঞ্জস্য করে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

৬. ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের জন্য নিয়োগবিধি থাকবে। ক্যাম্পাসের জীবনযাপনের ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম বেতন-ভাতা অবশ্যই প্রদান করতে হবে।

৭. কোনো গণমাধ্যমে সাংবাদিককে সার্কুলেশন তদারকি এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করা যাবে না।

৮. কর্মক্ষেত্রে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশনস অব সার্ভিসেস অ্যাক্ট) ১৯৭৩ এবং শ্রম আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান আলোকচিত্রী/ভিডিও সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করবে।

১০. গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সব সাংবাদিকের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তাসামগ্রী ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করবে। পেশাগত কারণে যেকোনো মামলা-মোকদ্দমা নিরসনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আইনি সহায়তা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. গণমাধ্যমের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা (সাংবাদিক নন) বর্তমানে যে হারে বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হন, তা সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতিক হারে (ratio অনুসারে) বৃদ্ধি পাবে।

২১.১৩ পিআইবি ও জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সুপারিশ

১. যেহেতু আধেয় (কন্টেন্ট) তৈরির ক্ষেত্রে সব ধরনের গণমাধ্যম এখন মাল্টিমিডিয়ানির্ভর হয়ে পড়ছে, সেহেতু গণমাধ্যমের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে একীভূত করা সমীচীন মনে করেছে সংস্কার কমিশন। একীভূত করা হলে তা একটি শক্তিশালী জাতীয় গণমাধ্যম প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ইনস্টিটিউটে রূপান্তরিত হবে।

২. প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (জাগই)-কে একটি একক পরিচালনা পর্ষদের অধীনে পরিচালনা করা গেলে কার্যকর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে এই একীভূত প্রতিষ্ঠান কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. এই একীভূত প্রতিষ্ঠানটির জন্য স্বায়ত্তশাসিত ও বিধিবদ্ধ স্বাধীন অবকাঠামোর ব্যবস্থা (নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে) করতে হবে।

৪. বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান দুইটির অবকাঠামো, জনবল এবং সম্পদ নতুন প্রতিষ্ঠানের অধীনে চলে যাবে।

৬. নতুন প্রতিষ্ঠানটি গণমাধ্যমশিল্পে কী ধরনের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, তা জরিপের মাধ্যমে নিরূপণ করে প্রশিক্ষণসূচিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে।

৭. গণমাধ্যমের স্বার্থে সারা বছর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা হবে প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রধান কাজ।

৮. বিদ্যমান লাইব্রেরিকে আধুনিকায়ন করে সেটিকে গণমাধ্যমশিল্পের জন্য ব্যবহারযোগ্য রেফারেন্স কেন্দ্রে পরিণত করা হবে প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কাজ।

২১.১৪ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট সম্পর্কে সুপারিশ

সাংবাদিকতার সঙ্গে এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যত কোনো সম্পর্ক নেই। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নির্মাণের বিষয়ে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও চলচ্চিত্রের জন্য তার প্রাসঙ্গিকতা বেশি। চলচ্চিত্র কার্যত কেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে না হয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, কমিশন এর কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি। তাই কমিশন মনে করে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় কি না, তা সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে।

২১.১৫ ভুয়া/অপতথ্য মোকাবিলায় সুপারিশ

১. প্রতিটি বার্তা কক্ষে অপ/ভুয়া তথ্য যাচাইয়ের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা/পদ্ধতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষিত সাংবাদিকরাই এ কাজটি করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। সংবাদমাধ্যমের আর্থিক সংকটের কারণে সত্যতা যাচাইয়ের কার্যক্রমে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের সংকট মোকাবিলায় সংবাদশিল্পে বৃহত্তর ও সম্মিলিত উদ্যোগের ব্যবস্থা করার কথাও ভাবা যেতে পারে। অবশ্যই এই উদ্যোগের স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

২. বৃহৎ প্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানিগুলো, যেমন গুগল, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ, সমন্বয় ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া। ফলে ওইসব প্ল্যাটফর্মে অপ/ভুয়া তথ্য চিহ্নিত হওয়ামাত্র তাদের সজাগ করা এবং তথ্য যাচাই ও অনুসন্ধানে সহায়তা দিয়ে দ্রুত সেগুলো

অপসারণ ও প্রচারিত কুতথ্য/ অপতথ্য/গুজব, বিভ্রান্তি নিরসন সম্ভব হবে। ভুয়া তথ্য, অপ বা কুতথ্য প্রচারের জন্য এসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বড় অঙ্কের জরিমানার বিধান এবং নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়ন ও সামর্থ্য বৃদ্ধির নজির এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

৩. ফ্যাক্ট চেকিংয়ের জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, তাদের সহায়তা নেওয়া এবং তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়। তবে সম্প্রতি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান বা উদ্যোগ সক্রিয় হয়েছে, যাদের সম্পর্কে সাবধানতা প্রয়োজন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়া তথ্য প্রচারের জন্য নিষিদ্ধ ব্যক্তিও বাংলাদেশে ফ্যাক্ট চেকিংয়ে নিয়োজিত হওয়ার নজির রয়েছে। এ কারণে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

৪. ভুয়া/অপ তথ্য মোকাবিলায় জনগণকে সচেতন করা এবং বিভিন্ন কৌশল শেখানোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে তারা প্রতিটি তথ্য যাচাইয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন ও গুরুত্ব আরোপ করে।

২১.১৬ গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে সুপারিশ

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষার্থীদের (সমমানের মাদ্রাসাসহ) গণমাধ্যম সাক্ষরতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং সেশনের আয়োজন করা যেতে পারে। গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ের গবেষক ও চিন্তকদের এসব কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান/এনজিও এবং একাডেমিয়ার মিলিত উদ্যোগে এ কার্যক্রম নেওয়া যেতে পারে।

২. শিক্ষার্থীরা ছাড়াও অন্যান্য শ্রেণি, পেশা, লিঙ্গ, বয়স এবং ভৌগোলিক অবস্থানে থাকা মানুষের গণমাধ্যম সাক্ষরতা বাড়ানোর জন্য বিনামূল্যে অনলাইনে স্বল্পমেয়াদি কোর্সের আয়োজন করা যেতে পারে। এ নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচার ও ক্যাম্পেইন চালাতে হবে। এ কাজে মোবাইল ফোনে বার্তা প্রেরণ থেকে শুরু করে সব ধরনের মাধ্যমই ব্যবহার করতে হবে। এতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী (যেমন, পিছিয়ে থাকা নারী, গ্রামের অধিবাসী, সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী) এ ব্যাপারে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাবেন।

৩. উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত যোগাযোগ কমকর্তাদের প্রশিক্ষিত করতে হবে, যাতে তারা গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করতে পারেন।

৪. স্থানীয় পর্যায়ের (পাড়া, মহল্লা, এলাকা) সামাজিক সংগঠনগুলোকে (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ক্লাব) সক্রিয় করতে হবে। এদের মাধ্যমে এলাকাবাসীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিটি এলাকার বিভিন্ন বয়সি মানুষের জন্য গণমাধ্যম সাক্ষরতাবিষয়ক আলোচনা এবং শিক্ষাবিনোদন (এডুটেইনমেন্ট) মডেলে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা কারিকুলামে গণমাধ্যম সাক্ষরতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৬. গণমাধ্যম সাক্ষরতার পদ্ধতি, ফলপ্রসূকরণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি নিয়ে আরও গবেষণালব্ধ-জ্ঞান প্রয়োজন।

৭. এ বিষয়ে গবেষণা আরও বাড়াতে গবেষণাকর্মে প্রণোদনাদানের জন্য সরকার উদ্যোগ নিতে পারে।

২১.১৭ গণমাধ্যমে জেন্ডার ও সমতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে সুপারিশ

সমাজে একটি জেন্ডার-সাম্যমূলক পরিবেশ তৈরির অংশ হিসেবে গণমাধ্যমে জেন্ডার-সাম্যের বিষয়টিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া দরকার। তাই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোয় মনোযোগ দেওয়া যেতে পারে:

ক. গণমাধ্যমের সব পর্যায়ে সব জেন্ডারের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগ, পদায়ন ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য দূর করা;

খ. প্রতিটি গণমাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীল আচরণবিধি প্রস্তুত করতে হবে এবং আচরণবিধি কার্যকরভাবে পালনের জন্য তথ্যদান, আলোচনা, প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা রাখা; সব জেন্ডারের সাবলীল অংশগ্রহণের জন্য অবকাঠামো (যেমন: ভিন্ন টয়লেট, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র) ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;

গ. নারীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে জেন্ডার নির্বিশেষে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্কতার ব্যবস্থা; নিরাপদে যাতায়াতের জন্য পরিবহনব্যবস্থা রাখা;

ঘ. হাইকোর্ট প্রণীত যৌন নিপীড়ন রোধ নির্দেশ (২০০৯) অনুযায়ী প্রতিটি গণমাধ্যম কার্যালয়ে একটি অভিযোগ প্রতিকার সেল তৈরি করা;

ঙ. সাংবাদিকতায় নানা ধরনের চাপ মোকাবিলায় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেওয়া;

চ. নারী যেন যথাযথভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি পায় এবং ছুটি শেষে কাজে ফিরে কোনো বৈষম্যের মুখোমুখি না হয়, তা নিশ্চিত করা;

ছ. নারীকে কীভাবে উপস্থাপনা করা হবে, তার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং নিয়মাবলি রচনা করা; নারীর প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব তৈরি করে, কিংবা সব ক্ষেত্রে তার সাবলীল পদচারণায় বাধা সৃষ্টি করে–এমন গৎবাঁধা ধারণা প্রকাশ ও প্রচার না করার বিষয়ে নীতিমালা প্রস্তুত করা;

জ. সমাজে নারীর বহুমুখী ভূমিকা ও অংশগ্রহণ তুলে ধরা; কোনো একটি সংবাদ/ফিচারের ক্ষেত্রে নারীর কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে কি না, তা খেয়াল রাখা;

ঝ. ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা প্রস্তুত করা, যাতে শব্দ বা বর্ণনার মাধ্যমে নারীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবমাননা না হয়।

২১.১৮ আদিবাসী ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি সম্পর্কিত সুপারিশ

গণমাধ্যমে এক্ষেত্রে যা করা যেতে পারে:

১. গণমাধ্যম নীতিমালায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্তি;

২. গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম সম্প্রচার সময়সীমা নির্ধারণ;

৩. আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রকাশ/প্রচাররত গণমাধ্যমে আদিবাসী ভাষায় সংবাদ ও অনুষ্ঠান পরিবেশনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;

৪. আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও অর্থায়নে যেসব মাধ্যম গড়ে উঠেছে, তাদের নিবন্ধন সহজতর করা; এছাড়া আদিবাসীদের নিজস্ব গণমাধ্যম যেন আরও গড়ে উঠতে পারে, তার প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া;

৫. মূলধারার গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উপস্থাপন যথাযথ ও উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য গণমাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর যথাযথ উপস্থাপনের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা;

৬. সাংবাদিকতা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে 'আদিবাসী বিষয়' (Indegenous Studies) অন্তর্ভুক্ত করা;

৭. আদিবাসী সাংবাদিক/সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের জন্য ফেলোশিপ দেওয়া ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা;

২১.১৯ প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী বিষয়ে সুপারিশ

গণমাধ্যমকে সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে শুধু প্রতিবেদন প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মক্ষেত্রে, কনটেন্ট তৈরিতে এবং নীতিমালায় সক্রিয়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। যেভাবে তা করা যেতে পারে:

- চাকরির বিজ্ঞপ্তিগুলো স্ক্রিন রিডার-সহায়ক ও সহজ ভাষায় লেখা; সাক্ষাৎকারের সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা (যেমন: ইশারা ভাষার দোভাষী, নমনীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি) নিশ্চিত করা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবাদিক, সম্পাদক, প্রযোজক ও প্রযুক্তিগত পদে নিয়োগ দেওয়া; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মেন্টরশিপ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রবেশগম্য অফিস (র‍্যাম্প, লিফট, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব বাথরুম) নিশ্চিত করা;
- সহায়ক প্রযুক্তির (স্ক্রিন রিডার, স্পিচ-টু-টেক্সট সফটওয়্যার) ব্যবস্থা করা।
- ফ্লেক্সিবল ওয়ার্কিং আওয়ারস এবং রিমোট ওয়ার্ক সুবিধা দেওয়া।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শুধু করুণা বা অনুপ্রেরণার বস্তু হিসেবে না দেখিয়ে তাদের সক্ষমতা ও অবদানের গল্প তুলে ধরা; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবাদিক, আলোচক ও প্যানেলিস্ট হিসেবে নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করা।
- টেলিভিশন সংবাদে ক্লোজড ক্যাপশন ও ইশারা ভাষার দোভাষী যুক্ত করা; রেডিও প্রোগ্রামের জন্য লিখিত ট্রান্সক্রিপ্ট বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য অডিও বিবরণী দেওয়া;
- অনলাইন সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সহজ ভাষা, অল্ট টেক্সট, ইমেজ ডিসক্রিপশন ও ব্রেইল-সহায়ক ফরম্যাট ব্যবহার করা।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে রিপোর্টিংয়ের সময় সম্মানজনক ভাষা ব্যবহারের নির্দেশিকা থাকা।
- ওয়েবসাইটগুলো যেন ওয়েব কনটেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন (WCAG 2.1) অনুসারে ডিজাইন করা হয়; স্ক্রিন-রিডার সক্ষম নিউজ অ্যাপ তৈরি করা; অডিও, ব্রেইল ও বড় ফন্টে সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

২১.২০ সংবাদে উপস্থাপনের ধরন ও পাঠক-দর্শকদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুপারিশ

গণমাধ্যমের প্রকাশিত যেকোনো ধরনের আধেয় (কন্টেন্ট) পাঠকের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, এর ওপর প্রতিটি গণমাধ্যমের নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিমালা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশা, বয়স, ধর্ম ও গোত্রের মানুষের ওপর তার প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

২১.২১ শ্রোতা-দর্শক ও পাঠকের গণমাধ্যম সম্পর্কে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রতিবছর জরিপ পরিচালনা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫

(খসড়া)

৩ মার্চ ২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক
১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা
৪। বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা
৫। কমিশন কার্যালয়
৬। কমিশন গঠন
৭। বাছাই কমিটি
৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, যোগ্যতা, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি
৯। চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা
১০। কমিশনের সদস্যগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি

তৃতীয় অধ্যায়: কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি
১১। কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি
১২। গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণনীতি (Principle of Self-Regulation in Media) সংক্রান্ত বিশেষ বিধান
১৩। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ
১৪। কমিশনের সভা
১৫। কমিটি গঠন
১৬। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও সংগঠনসমূহের নিবন্ধন

চতুর্থ অধ্যায়: কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি
১৭। কমিশনের তহবিল
১৮। বাজেট
১৯। চুক্তি করার ক্ষমতা
২০। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা
২১। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা

পঞ্চম অধ্যায়: কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী
২২। কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ষষ্ঠ অধ্যায়: বিবিধ
২৩। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন
২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ
২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত

অধ্যাদেশ নং--

বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯-এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে এবং অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হইয়াছে; এবং

যেহেতু বিদ্যমান Press Council Act, 1974 (ACT NO. XXV OF 1974)-এর সীমাবদ্ধতাও সক্ষমতার অভাবের কারণে উক্ত আইনের কার্যকারিতা লোপ পাইয়াছে এবং গণমাধ্যমের রূপান্তর ও অভাবনীয় বিকাশের কারণে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, সুরক্ষা, মান ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা তৈরি হইয়াছে; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন, যথা:–

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–(১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থ কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে–

'কমিশন' অর্থ বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন;

(১) 'গণমাধ্যম' অর্থ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ড হইতে পরিচালিত বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্যাটেলাইটভিত্তিক বা ইন্টারনেটভিত্তিক কোন রেডিও, টেলিভিশন বা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র, ধ্বনি, লিখা, গ্রাফিক্স বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত সংবলিত কোন সংবাদ বা বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান বা আধেয় (Content) প্রচার, প্রকাশও সম্প্রচারকারী বাংলাদেশে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোন সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থা বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত বাংলাদেশি দর্শক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী কোন সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনরত কোন সদস্য;

(৪) 'সদস্য' অর্থ কমিশনের কোন সদস্য এবং চেয়ারম্যানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) স্ব-নিয়ন্ত্রণ (Self-Regulation) অর্থ এমন প্রক্রিয়া যাহা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সমুন্নত ও অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করে;

(৬)'বাছাই কমিটি' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(৭) 'বিধি' অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি।

৩। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।- বিদ্যমান অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ **গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা**

৪। বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠা।– (১) এই অধ্যাদেশ বলবৎ হইবার পর, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং উহার বিধান অনুসারে বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা থাকিবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামেই মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, যাহা কমিশনের সচিবের হেফাজতে থাকিবে।

৫। কমিশন কার্যালয়।– কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে এবং কমিশন প্রয়োজনে দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কমিশন গঠন।– বাংলাদেশ গণমাধ্যম কমিশন নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে, যথা:–

(১) একজন চেয়ারম্যান ও ৮ (আট) জন সদস্যসহ মোট ৯ (নয়) জন সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের চেয়ারম্যান ও একজন মহিলাসহ তিনজন সদস্য সার্বক্ষণিক হইবেন এবং অন্যান্য সদস্যগণ অবৈতনিক হইবেন।

(৩) কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে কমপক্ষে ৪ (চার) জন মহিলা এবং উপজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা নৃ-গোষ্ঠীর সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কমপক্ষে ১ (এক) জন সদস্য হইতে হইবে।

(৪) চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৭। বাছাই কমিটি।–. (১) চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণিত ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা:–

(ক) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক মনোনীত যে কোন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অথবা আইন বিভাগের একজন অধ্যাপক;

(গ) সম্পাদকের যোগ্যতাসম্পন্ন সাংবাদিকতা পেশায় ধারাবাহিকভাবে অন্যূন ২০ (বিশ) বছর নিয়োজিত আছেন এইরূপ একজন প্রতিনিধি।

(২) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় উপ-ধারা (১) এর অধীন বাছাই কমিটি গঠনে এবং উক্ত বাছাই কমিটির কার্য-সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) অন্যূন ২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে বাছাই কমিটির কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) বাছাই কমিটি, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের নিমিত্ত রাষ্ট্রপতির নিকট, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে, প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে ৩ (তিন) জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিবে।

(৫) বাছাই কমিটিতে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৬) বাছাই কমিটি উহার সভার কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৮। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ, যোগ্যতা, মেয়াদ, পদত্যাগ, ইত্যাদি।– (১) রাষ্ট্রপতি, বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ করিবেন।

(২) গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা, আইন, বিচারকার্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, তথ্য, সমাজকর্ম বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অন্যূন ২০ (বিশ) বছরের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিয়োগলাভের তারিখ হইতে ৪ (চার) বছরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান বা যে কোন সদস্য রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৫) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কমিশনের কোন সদস্যকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইবে।

৯। চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগের অযোগ্যতা।- কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি–

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন; বা

(খ) আর্থিক দুর্নীতিবা নৈতিকস্খলনজনিত কোন অপরাধে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন; বা

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন; বা

(ঘ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন; বা

(ঙ) ধারা ৮(৩)-এ উল্লিখিত বাস্তবজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন না হন; বা

(চ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ববহির্ভূত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন:

তবে শর্ত থাকে যে, অবৈতনিক সদস্যদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

১০। কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।– (১) চেয়ারম্যান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) সার্বক্ষণিক সদস্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারকের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) অবৈতনিক সদস্যগণ কমিশনের সভায় যোগদানসহ অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানী ও ভাতা পাইবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি

১১। কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি।– (১) কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে–

(ক) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার স্বাধীনতা ও মান নিশ্চিত করা;

(খ) বাংলাদেশে কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাধীনতা, সাংবাদিকতার মান ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা;

(গ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় উত্তম চর্চা, শুদ্ধাচার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা এবং স্ব-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।

(২) উপধারা-(১) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ নিশ্চিতকল্পে কমিশন–

(ক) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, কর্মচারী, শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য আচরণবিধি প্রণয়নে সহায়তা করা;

(খ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সংবাদকর্মীদের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা;

(গ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সংশ্লিষ্টদের গবেষণা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;

(ঘ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উক্ত বিষয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া অনুসন্ধান করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় লিঙ্গভিত্তিক সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করা;

(চ) সংবাদবা তথ্য প্রচার, প্রকাশ ও মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক রীতিনীতি, নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা;

(ছ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকদের নিবন্ধন পদ্ধতি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়ন;

(জ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়ন;

(ঝ) দেশীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করা;

(ঞ) দেশের নাগরিকদের মধ্যে গণমাধ্যম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১২। গণমাধ্যমের স্ব-নিয়ন্ত্রণনীতি (Principle of Self-Regulation in Media) সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।– (১) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক এবং তাদের সংগঠনসমূহের–

(ক) স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা, নৈতিকতা সংক্রান্ত মানদণ্ড প্রণয়ন, অনুসরণ ও পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা;

(খ) নীতিমালা, বিধিমালা ও গাইডলাইন প্রণয়নে সহায়তা করা;

(গ) আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও মানদণ্ড অনুসরণ করিয়া গণতন্ত্রের বিকাশ, বহুত্ববাদ ও বৈচিত্র্য সমুন্নত রাখা;

(ঘ) সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা ও লিঙ্গ সমতা বজায় রাখার মাধ্যমে সংবাদ ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ বজায় রাখা; এবং

(ঙ) সঠিকতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে নির্ধারণ করা।

(২) স্ব-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও সংগঠনগুলোর জন্য এক বা একাধিক অনুসরণীয় Code of Ethical Guideline প্রণয়ন করিবে এবং প্রয়োজনে অংশীজনদের পরামর্শ ও পর্যালোচনার আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিশ্চিত করিবে, যথা:–

(ক) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থায় প্রচারিত, প্রকাশিত ও সম্প্রচারিত তথ্য, উপাত্ত সংবলিত কোন সংবাদ, বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠান বা আধেয় (Content)-এর অন্যায্য (Unjust) এবং অনুচিত বিষয়সমূহ পরিবীক্ষণ;

(খ) অবৈধভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা (Privacy) ক্ষুণ্ন করে বা অনুপযোগী কোন তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ বা প্রচার করে এমন বিষয় পরিহার;

(গ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও সংগঠনসমূহ সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব (Charter of Duty), তথ্য উন্মুক্তকরণ নীতিমালা (Disclosure Policy), সম্পাদকীয় নীতিমালা (Editorial Policy) অনুসরণ নিশ্চিত করা;

(ঘ) প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা ও সংগঠনসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবে।

১৩। আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ।– (১) কোন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক বা অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, শ্রমিক বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি এককভাবে বা যৌথভাবে আচরণবিধি লঙ্ঘন করিলে প্রয়োজনীয় শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া প্রমাণসাপেক্ষে কমিশন নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:–

(ক) প্রথমবার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লিখিতভাবে সতর্ক ও তিরস্কার করা;

(খ) পুনঃলঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত জরিমানা আরোপ করা।

(২) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে Code of Civil procedure, 1908 (Act V of 1908)-এর অধীন একটি দেওয়ানি আদালত যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে গণমাধ্যম কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, চেয়ারম্যান বা সদস্যগণও সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) কোন ব্যক্তিকে কমিশনে হাজির করিবার জন্য সমন জারি করা এবং শপথপূর্বক মৌখিক বা লিখিত প্রমাণ, দলিল বা অন্য কোন কিছু হাজির করিতে বাধ্য করা;

(খ) তথ্য যাচাই ও পরিদর্শন করা;

(গ) হলফনামাসহ প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) কোন অফিসের কোন তথ্য আনয়ন করা; এবং

(ঙ) কোন সাক্ষী বা দলিল তলব করিয়া সমন জারি করা; ইত্যাদি।

১৪। কমিশনের সভা।– (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কমিশন উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একজন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের উপস্থিতিতে কমিশনের সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

(৫) প্রতি দুই মাসে কমিশনের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

১৫। কমিটি গঠন।– এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং কমিশনের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশন, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১৬। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, সংগঠনসমূহ ও সাংবাদিকের নিবন্ধন।– (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সকল প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম, সংবাদ সংস্থা, সংগঠনসমূহ ও সকল সাংবাদিককে কমিশনের নিকট নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) নিবন্ধন সংক্রান্ত নিয়মাবলি, শর্তাবলি ও ফি কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কমিশনের আর্থিক বিষয়াদি

১৭। কমিশনের তহবিল।- (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গণমাধ্যম কমিশন তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) কমিশনের তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসন, এই ধারা এবং বিধিমালা সাপেক্ষে, কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(৩) কমিশনের তহবিল হইতে চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের এবং সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলি অনুসারে প্রদেয় অর্থ প্রদান করা হইবে এবং কমিশনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়নির্বাহ করা হইবে।

(৪) কমিশনের তহবিলে নিম্নরূপ অর্থ জমা হইবে, যথা:–

(ক) সকল নিবন্ধিত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার বাৎসরিক টার্নওভারের শতকরা **১** (এক) শতাংশ হারে প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) নিবন্ধন বাবদ প্রাপ্ত ফি;

(গ) জরিমানালব্ধ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বাৎসরিক অনুদান;

(ঙ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

১৮। বাজেট।– কমিশন প্রতিবৎসর পরবর্তী অর্থ-বৎসর শুরু হওয়ার অন্তত এক মাস পূর্বে বার্ষিক বাজেট বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং উহা প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে।

১৯। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা।– (১) সরকার প্রতি অর্থ-বৎসরে কমিশনের ব্যয়ের জন্য, উহার চাহিদা বিবেচনায়, উহার অনুকূলে নির্দিষ্টকৃত অর্থ বরাদ্দ করিবে এবং অনুমোদিত ও নির্ধারিত খাতে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হইতে ব্যয় করিবার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা কমিশনের জন্য আবশ্যক হইবে না।

(২) এই ধারার বিধান দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মহাহিসাব নিরীক্ষকের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইবে না।

২০। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।– (১) কমিশন যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতি বৎসর কমিশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কমিশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহাহিসাব নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কমিশনের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বাব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ বা যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২১। চুক্তি করার ক্ষমতা।- কমিশন গণমাধ্যমসংশ্লিষ্ট সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশি বা বিদেশি যেকোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী

২২। কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী।– (১) সাচিবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনের একজন সচিব থাকিবেন।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

২৩। কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন।- কমিশন প্রতিবৎসর ৩১ মার্চের মধ্যে উহার পূর্ববর্তী বৎসরে সম্পাদিত কার্যাবলি সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবে;

২৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।– (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর কমিশন এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Press Council Act, 1974 (ACT NO. XXV OF 1974), অতঃপর উক্ত অপঃ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে।

(২) উক্তরূপ বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত অপঃ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Press Council কর্তৃক কৃত কোন কাজ বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা জারীকৃত কোন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন বা প্রবিধান এই অধ্যাদেশের অধীন কৃত, গৃহীত, জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত অপঃ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Press Council এর-

(ক) স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ, সকল হিসাব বহি, রেকর্ড এবং অন্যান্য দলিল কমিশনের নিকট হস্তান্তরিত এবং উহার ওপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি কমিশনের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তদকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা কমিশনের বিরুদ্ধে বাকমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে; এবং

(ঘ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন কমিশন কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

(খসড়া)

১৩ মার্চ ২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

দ্বিতীয় অধ্যায়: সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষার অধিকার

৩। সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি হইতে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার অধিকার

৪। ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা ও তথ্যসূত্র প্রকাশ না করিবার অধিকার

৫। স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অধিকার

৬। সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীর নিজ প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

৭। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের সুরক্ষার অধিকার

তৃতীয় অধ্যায়: অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি

৮। অভিযোগ দায়ের

চতুর্থ অধ্যায়: অপরাধ, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি

৯। অপরাধ ও শাস্তি

১০। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর

পঞ্চম অধ্যায়: বিচার, তদন্ত, ইত্যাদি

১১। অপরাধের বিচার

১২। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

১৩। আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা

১৪। তদন্ত

১৫। মিথ্যা অভিযোগ করিবার শাস্তি

১৬। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

ষষ্ঠ অধ্যায়:

১৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ

১৮। অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ

অধ্যাদেশ নং---, ২০২৫

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা প্রদান এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২ এ জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ, অনুচ্ছেদ ৩৯ এ চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং অনুচ্ছেদ ৪০ এ পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা ও অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে; এবং

পেশাগত কর্মে নিয়োজিত সাংবাদিক/সংবাদকর্মী প্রায়শঃই সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার হন বা উহার আশংকা থাকে; এবং

সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর পর্যাপ্ত আইনগত সুরক্ষা প্রদান এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন। যথা:–

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই অধ্যাদেশ সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(১) 'অপরাধ' অর্থ এই অধ্যাদেশ এবং Penal Code 1860 (Act No. XLV 1860) এর অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ;

(২) 'অভিযোগকারী' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার কোন সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী;

(৩) 'আইন' অর্থ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৭ নং আইন);

(৪) 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা' অর্থ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারি কোন সংস্থা এবং সশস্ত্র বাহিনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' অর্থ আইনের ধারা ২ (১) এ উল্লেখিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

(৬) 'কমিশন' অর্থ জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ৪ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন;

(৭) 'গণমাধ্যম' অর্থ প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ সংস্থা এবং বাংলাদেশের ভূখণ্ড হইতে পরিচালিত বাংলা, ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্যাটেলাইট ভিত্তিক বা ইন্টারনেট ভিত্তিক কোন রেডিও, টেলিভিশন বা অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের মাধ্যমে সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থির ও চলমান চিত্র,

ধ্বনি, লিখা, গ্রাফিক্স বা মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে উপস্থাপিত তথ্য, উপাত্ত সংবলিত কোন সংবাদ বা বিজ্ঞাপন বা অনুষ্ঠান বা আধেয় (Content) প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী বাংলাদেশে নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত কোন সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থা বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত বাংলাদেশী দর্শক ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রচার, প্রকাশ ও সম্প্রচারকারী কোন সংবাদমাধ্যম বা সংবাদ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৮) 'সাংবাদিক/সংবাদকর্মী' অর্থ কোন ব্যক্তি যিনি–

(ক) সার্বক্ষণিক সাংবাদিক; এবং

(খ) গণমাধ্যমের কাজে নিয়োজিত আছেন এমন কোন সম্পাদক, সম্পাদকীয় লেখক, নিউজ এডিটর, উপ-সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, ভিডিও এডিটর, ফিচার লেখক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা; এবং

(গ) খণ্ডকালীন সাংবাদিক, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং বিদেশি গণমাধ্যমের প্রদায়ক হিসেবে কর্মরত সাংবাদিক; এবং

(ঘ) গণমাধ্যমের কাজে নিয়োজিত আছেন এমন কোন কপি টেস্টার, কার্টুনিস্ট, সংবাদ চিত্রগ্রাহক, গ্রাফিক ডিজাইনার এবং নিবন্ধিত গণমাধ্যমের সংবাদকর্মে নিয়োজিত কর্মী;

(৯) 'জনস্বার্থ' অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৩) এ উল্লেখিত জনস্বার্থ;

(১০) 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য' অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৪) এ উল্লেখিত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য;

(১১) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(১২) 'বিধি' অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৩) 'ব্যক্তি' অর্থে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কোম্পানি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, অংশীদারী কারবার, ফার্ম, সমিতি, সংঘ বা অন্য কোন কৃত্রিম আইনগত সত্তা বা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক, বিনিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রহিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) 'সরকারী কর্মচারী' অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে **১৫২** অনুচ্ছেদে উল্লেখিত কোন সরকারী কর্মচারী;

(১৫) 'সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি' অর্থ কোন ব্যক্তি, সংস্থা, কোম্পানির এমন কর্মকাণ্ড যাহা পেশাগত কাজে নিয়োজিত একজন সংবাদকর্মী/ সাংবাদিকের জীবন ও সম্পদকে ঝুঁকিপূর্ণ করিয়া তুলে এবং সকল প্রকার অপরাধমূলক ভয়-ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন, হয়রানি, হেনস্থা, সার্বক্ষণিক নজরদারি, শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, কাজে বাধা প্রদান, বল প্রয়োগ, চাপ প্রয়োগ, যৌন হয়রানি, অবৈধ আটক, গুম, অপহরণও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৬) 'সংস্থা' অর্থ আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৮) এ উল্লেখিত সংস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংবাদিকতার অধিকার সুরক্ষার অধিকার

৩। সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি হইতে জীবন ও সম্পদ সুরক্ষার অধিকার।- (১) প্রত্যেক সাংবাদিক/সংবাদকর্মীকে সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি হইতে সুরক্ষা প্রদানের দায়িত্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকারের থাকিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

(২) কোন ব্যক্তি এমন কোন কর্মকাণ্ড করিবেন না বা নিয়োজিত হইবেন না যাহা দ্বারা সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত বা পেশাগত জীবন বা সম্পদের কোনরূপ ক্ষতি হয়।

(৩) সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর পেশাগত নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথ উদ্যোগ/ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যেন নিবর্তনমূলক কোন আইন বা বিধি দ্বারা সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত বা পেশাগত জীবন বা সম্পদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় বা তাহাদের আইন বহির্ভূতভাবে গ্রেফতার বা আটক না করা হয়।

(৪) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ বা প্রচারের কারণে পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন কোন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথ উদ্যোগ বা পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৫) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য সংগ্রহ বা প্রকাশ বা প্রচারের কারণে পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন কোন ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সরকারী কর্মচারী বা সংস্থা কর্তৃক সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৬) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন তথ্য সংগ্রহ কালে বা প্রকাশ বা প্রচারের কারণে দেশের কোন বিরোধপূর্ণ এলাকায় পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৪। ব্যক্তিগত তথ্যাদির গোপনীয়তা ও তথ্যসূত্র প্রকাশ না করিবার অধিকার।- (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত সকল সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং গৃহ, পরিবার ও যোগাযোগের সকল মাধ্যম সুরক্ষিত রাখিবার অধিকার থাকিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না বা বল প্রয়োগ করিয়া অবৈধভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ, তল্লাশী বা সম্পদ জব্দ করা যাইবে না এবং আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে তাহার ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, স্বাধীনতা, সুনাম, সম্মান বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

(৩) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মীকে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভয়-ভীতির মাধ্যমে বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপ প্রয়োগ করিয়া তথ্যসূত্র প্রকাশে বাধ্য করিতে পারিবে না।

৫। স্বাধীনভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের অধিকার।- (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যেন কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান বা সরকারী কর্মচারী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক ভয়-ভীতি বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপ মুক্ত অবস্থায় ও স্বাধীনভাবে এবং অনুকুল পরিবেশে দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হন সে বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোন সাংবাদিক/সংবাদকমী যেন সহিংসতা, হুমকি, হয়রানি এবং বিশেষত যৌন হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৬। সাংবাদিক বা সংবাদকর্মীর নিজ প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।- (১) লিখিত কোন চুক্তি বা চাকুরির শর্তাবলিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী নিজ প্রতিষ্ঠানে যেন ভয়-ভীতি বা জোরপূর্বক শারীরিক বা মানসিক চাপ মুক্ত অবস্থায় ও স্বাধীনভাবে এবং অনুকুল পরিবেশে দায়িত্ব পালন করিতে সক্ষম হন সে বিষয়টি উক্ত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক, বিনিয়োগকারী বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রহিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তি নিশ্চিত করিবেন এবং উক্ত বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটিলে সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী লিখিতভাবে কমিশন বরাবর অভিযোগ করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এর অধীন কোন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন অভিযোগটির সত্যতা যাচাই এবং তদন্ত করিয়া উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় শুনানি গ্রহণ পূর্বক বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অভিযোগটি যদি ফৌজদারি অপরাধমূলক হয় তাহা হইলে কমিশন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯০ ধারা অনুযায়ী অভিযোগটি আমলে গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট এখতিয়ার সম্পন্ন প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবে।

৭। সরল বিশ্বাসে কৃতকর্মের সুরক্ষার অধিকার।- পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী যদি সরল বিশ্বাসে কোন গণমাধ্যমে তথ্য, উপাত্ত, লিখিত বা অডিও বা ভিডিও প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং উক্ত প্রকাশের দ্বারা কোন ব্যক্তি বা

প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, ভিন্ন উদ্দেশ্য প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদি

৮। অভিযোগ দায়ের।- (১) পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী সহিংসতার শিকার হইলে তিনি এখতিয়ারাধীন কোন প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে লিখিতভাবে বা অনলাইনের মাধ্যমে বা তাহার কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) এ দায়েরকৃত অভিযোগ প্রাপ্তির পর প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত উক্ত অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের নিকট প্রেরণ করিয়া মামলা দায়েরের নির্দেশ দিবেন এবং ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের আদেশ জারি করিবেন।

(৩) যুক্তিসংগত কারণে উপধারা (২) এ উল্লেখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন এবং আদালত সহিংসতার শিকার সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর শুনানি গ্রহণ করিয়া তদন্তের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

অপরাধ, শাস্তি, ক্ষতিপূরণ, ইত্যাদি

৯। অপরাধ ও শাস্তি।- কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান পেশাগত কর্মে নিয়োজিত কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানি করিলে, উহা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রা ভেদে অন্যূন ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থ দণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১০। অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর।- বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত আদালত তদকর্তৃক ধারা ৯ এর অধীন আরোপিত অর্থদণ্ডকে পেশাগত দায়িত্বে নিয়োজিত সাংবাদিক/সংবাদকর্মীর জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিচার, তদন্ত, ইত্যাদি

১১। অপরাধের বিচার।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ এবং অপরাধের বিচার বা কার্যধারার নিষ্পত্তি প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকিবে না।

১২। ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার, নিষ্পত্তি ও আপীলসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধের বিচার বা কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে।

১৩। আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা এবং আপোষযোগ্যতা।- এই অধ্যাদেশের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য এবং আপোষযোগ্য হইবে।

১৪। তদন্ত।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন দায়েরকৃত অভিযোগ ও মামলা সহকারী পুলিশ সুপারের নিম্নে নহে এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত করা হইবে।

(২) তদন্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির সকল বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৫। মিথ্যা অভিযোগ করিবার শাস্তি।- যদি কোন সাংবাদিক/সংবাদকর্মী অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন অভিযোগ করিবার আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও আবেদন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- এই অধ্যাদেশের অধীন সহিংসতা, হুমকি ও হয়রানির অভিযোগ যদি কোন কোম্পানির বিরুদ্ধে হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির বিনিয়োগকারী বা প্রত্যেক পরিচালক বা ব্যবস্থাপক বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট অভিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত সহিংসতা তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত সহিংসতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[ব্যাখ্যা।- এই ধারায়––

(ক) 'কোম্পানি' বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'পরিচালক' বলিতে উহার কোন বিনিয়োগকারী বা অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিবিধ

১৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ।- এই অধ্যাদেশের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

১৮। অধ্যাদেশের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব।- সরকার এই অধ্যাদেশ যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনে, সময় সময়, আদেশ বা নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

১৯। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পর সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যাদেশের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট ও সংযুক্তি

১. মিডিয়া রিফর্ম কমিশন গঠনের গেজেট

২. মিডিয়া রিফর্ম কমিশন সদস্য কামরুন নেসা হাসানের অন্তর্ভুক্তি গেজেট

৩. https://rsf.org/en/rsf-s-2021-press-freedom-predators-gallery-old-tyrants-two-women-and-european

৪. https://file-rajshahi.portal.gov.bd/uploads/d27e6a32-7dfc-48f1-9b01449228948a00//623/1f7/d78/6231f7d78080d133927337.pdf

৫. https://moi.gov.bd/sites/default/files/files/moi.portal.gov.bd/files/a22f434a_b3f5_4931_be15_7a56494fb8df/National_Broadcasting_Policy.pdf

৬. সংবাদপত্র মালিকদের মধ্যে কমিশন পরিচালিত জরিপের প্রশ্নপত্র

৭. https://dfp.portal.gov.bd/site/notices/b0a990eb-091f-454c-a778-a1cbb5c3ad56/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AD%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8

৮. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-437.html?lang=bn

৯. https://bscl.gov.bd/site/page/4b941407-3b03-443d-81fa-cec333ed071a/-

১০. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-949.html

১১. https://bscl.gov.bd/site/page/0bfe013e-b653-4bf9-a9fc-6ccb76f26833/-

১২. https://toffeelive.com/en

১৩. https://pressinform.portal.gov.bd/sites/default/files/files/pressinform.portal.gov.bd/page/077eb6d2_9c46_44c7_88fc_1abff6cb17b9/2025-03-02-06-10-81da5b24474ae3f08a3f933a670619cb.pdf

১৪. https://ppinewsagency.com/

১৫. https://ena-news.com/

১৬. https://unb.com.bd/

১৭. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-950.html

১৮. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1261.html

১৯. প্রথম প্রেস কমিশন রিপোর্ট

২০. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11.html?lang=bn

২১ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1457.html

২২. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-75.html

২৩. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-132/section-6995.html

২৪. https://presscouncil.gov.bd/sites/default/files/files/presscouncil.portal.gov.bd/law/52bb87a5_3b99_418f_99ae_fd3d3616fbd9/Press%20Council%20Act%201974%20gazzatte%20copy.pdf

২৫. গণমাধ্যম কমিশন প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ও প্রস্তাবিত কমিশনের আইনি খসড়া

২৩. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1108/section-42467.html

২৭ https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

২৮. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1457/section-52851.html

২৯. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-11/section-3116.html?lang=bn

৩০. https://moi.gov.bd/sites/default/files/files/moi.portal.gov.bd/files/67d98ea7_9dca_4565_be79_86b7a3b52cf4/RTI.pdf

৩১. https://moi.gov.bd/sites/default/files/files/moi.portal.gov.bd/files/a22f434a_b3f5_4931_be15_7a56494fb8df/National_Broadcasting_Policy.pdf

৩২. https://www.dpp.gov.bd/upload_file/gazettes/22061_65078.pdf

৩৩. কমিশন প্রস্তাবিত সাংবাদিকতা সুরক্ষা অধ্যাদেশের খসড়া

৩৪. দ্য প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন) অ্যাক্ট ১৯৭৩

৩৫. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-437.html

৩৬. গণমাধ্যম বিষয়ে জাতীয় জনমত জরিপ ২০২৫

৩৭. https://betar.portal.gov.bd/sites/default/files/files/betar.portal.gov.bd/
law/70933be9_530e_4610_a719_aacbae6acea1/Rules&Regulation.pdf

৩৮. বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসন নীতিমালা প্রণয়ন কমিশনের প্রতিবেদন

৩৯. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-879.html

৪০. https://btv.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btv.por-
tal.gov.bd/policies/e17a1296_6b99_4cb9_8d9e_1c-
87c68176f2/%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%20
%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%
A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6-
%A7%E0%A6%BF%20%E0%A6%A8%E0%A6%B-
F%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%A8%20
%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%B-
F%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE.pdf

৪১. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-878.html

৪২. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-879/section-26701.html

৪৩. https://www.app.com.pk/

৪৪. file:///C:/Users/HP/Downloads/Docu-
ments/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6% 82%E0%A6%B2%E0%A6
%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B8%E0%A
6%82%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%20%E0%A6%B8%E0%
A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%20%E0
%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A
6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6,%20%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%
A7%AD%E0%A7%AF.pdf

৪৫. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1278.html

৪৬. https://www.ptinews.com/

৪৭. https://rsf.org/en

৪৮. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401083

৪৯. https://www.presscouncil.nic.in/

৫০. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/2011241422_2016-09_BUKU_Indonesian_Press_Law_&_Regulations_of_the_Press_Council.pdf

৫১. https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2016/05/Rebuilding-Public-Trust-English-final-version-advance-copy-1-May-20162.pdf

৫২. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1118/section-42694.html

৫৩. প্রস্তাবিত মিডিয়া কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি আইনের খসড়া প্রতিবেদনের শেষে সংযুক্ত করা হলো।

৫৪. https://natlex.ilo.org/dzn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=50620

৫৫. https://mole.gov.bd/sites/default/files/files/mole.portal.gov.bd/elibrary/150c852f_80cb_4d5a_a49a_d093598ad04b/Labour%20Law%202006.pdf

৫৬. বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সরকারি অনাপত্তিপত্র

৫৭. বেসরকারি মালিকানায় টেলিভিশন স্থাপন ও পরিচালনা নীতি ১৯৯৮

৫৮. টেলিভিশনের আবেদনপত্র ও অঙ্গীকারনামা

৫৯. বেসরকারি রেডিও স্থাপন ও পরিচালন সংক্রান্ত তথ্যাদি

৬০. কমিশনের কাছে পাঠানো বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার সুপারিশ

৬১. একনজরে বিটিভির বাজেট

৬২. The Tribunal সংবাদপত্রের প্রতিবেদন

৬৩. মিডিয়া তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রের পরিসংখ্যান

৬৪. ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স সমবায় সমিতির পরিসংখ্যান

৬৫. ঢাকা সংবাদপত্র হকার্স কল্যাণ বহুমুখী সমিতির পরিসংখ্যান

৬৬. বাসস-এর আয়ব্যয়ের হিসাব

৬৭. ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন মনিটরিং টিমের ২৫তম সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

৬৮. The Press Counsil Act 1974

৬৯. বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩ (২০২২ সাল সংশোধিত)

৭০. ব্লাস্ট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গণমাধ্যম সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া সুপারিশমালা

৭১. ইউনেস্কো সুপারিশমালা

৭২. রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান নীতিমালা এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন চলচ্চিত্র সেন্সর-বিধি

৭৩. বিভিন্ন জাতীয় দিবসে সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশের জন্য ২০০৮-০৯অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রচার ও বিজ্ঞাপনের খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী

৭৪. সংবাদপত্র ও সাময়িকীর মিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং নিরীক্ষা নীতিমালা ২০২২

৭৫. এমআরডিআই থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ

৭৬. একনজরে বিটিভির বাজেট